ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

জগুমামা রহস্য সমগ্র

জগুমামা রহস্য সমগ্র ১

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

জগুমামা রহস্য সমগ্র ১

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১ **দ্বিতীয় মুদ্রণ** ফেব্রুয়ারি ২০১২
তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪ **চতুর্থ মুদ্রণ** মার্চ ২০১৬
পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৭ **ষষ্ঠ মুদ্রণ** অক্টোবর ২০১৮

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সুদীপ্ত দত্ত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

JAGUMAMA RAHASYA SAMAGRA 1

by Tridib Kumar Chattopadhyay

Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009

Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799

E-mail patrabharati@gmail.com

visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

ISBN 978-81-8374-091-3

যাঁর ঝরনার মতো কলম ও

'কাকাবাবু' আমাকে নিরন্তর

সৃষ্টির স্বপ্ন দেখায়

সেই 'মনের মানুষ'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

ভয়ের আড়ালে ভয়

ভৌতিক অলৌকিক

রহস্যেঘেরা রাক্ষসখালি

অসি বাজে ঝনঝন

আরবি পুঁথির রহস্য

হেরে যাবেন জগুমামা?

আজও রোমাঞ্চকর

রহস্য রাতের পদ্মায়

রক্তরহস্য

লেখকের সম্পাদিত বই

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৫

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬

কিশোর ভারতী সেরা সমগ্র

কিশোর ভারতী উপন্যাসসমগ্র

জঙ্গল অমনিবাস

সেরা জোকস ৪০১

সেরা পঁচিশ হাসির গল্প

সেরা পঁচিশ গোয়েন্দা গল্প

সেরা পঁচিশ হাসির গল্প

অপরূপ রূপকথা

ভয়ের গল্প ৫১

হাসির গল্প ৫১

তাকাই যখন পিছন ফিরে

জগুমামার ২৫ বছর হল। রজতজয়ন্তী বর্ষ। প্রথম অ্যাডভেঞ্চার বেরিয়েছিল ১৯৮৫ সালে, শারদীয়া কিশোর ভারতীতে।

তবে পঁচিশ বছরে জগুমামার বয়েস কিন্তু অতটা বাড়েনি। বাড়লে এখনও টগবগে তরুণের মতো উনি ছুটতে পারতেন না।

ভাগ্নে টুকলু প্রায়ই চেপে ধরত, 'ছোটমামা, গল্প বলো।' যে সে গল্প নয়, গা-ছমছমে রহস্য-অভিযান। তার কিছুদিন আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েছি। ফেলুদার 'বাদশাহী আংটি', 'সোনার কেল্লা', 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' গোগ্রাসে পড়ছি আর কাকাবাবুর 'ভয়ংকর সুন্দর' পড়ে অভিভূত হয়ে গেছি। একদিন টুকলুকে বানিয়ে-বানিয়ে 'হাত'-এর একটা গল্প বললাম। এগারো-বারো বছরের টুকলু চোখ বড়-বড় করে শুনল।

তখনই মনে হল, টুকলু আর বিজ্ঞানী মামা জগবন্ধু মুখার্জিকে নিয়ে লিখলে কেমন হয়? বিজ্ঞানী মানেই আপনভোলা হবেন কেন? বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে কি রহস্যভেদ করা সম্ভব নয়?

সেই শুরু।

এই পঁচিশ বছরে প্রায় ২১-২২টা 'জগুমামা-কাহিনি' লিখেছি। ক্রমেই পাঠক-পাঠিকা বন্ধুরা জগুমামার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছেন। দিল্লি-নিবাসী এক তরুণী ই-মেলে লিখেছে, 'জগুমামার লেখকের লেখা উত্তর পেয়ে আমি অভিভূত! কবে বেরোবে জগুমাম-সমগ্র? একসঙ্গে পেতে চাই।'

এমন একজন নয়, অনেকজন। জগুমামা-কাহিনির একত্রিত সংগ্রহ তারা নিজের কাছে রাখতে চায়।

বাধ্য হয়ে নিজের প্রাচীন সব লেখা পড়তে শুরু করলাম। পাঠকের চোখে। ফলে প্রচুর কাটা-ছেঁড়া করতে হল। অদলবদল হল ভাষাও।

তারপর এল জগুমামা রহস্য-সমগ্র, প্রথম খণ্ড।

বইটি প্রকাশে আমি প্রথমেই ঋণস্বীকার করছি সোমা সেনের কাছে। কাটাছেঁড়ার পরে সে অতি যত্নে নতুন করে লিখে দিয়েছে কম্পোজ-যোগ্য করার জন্যে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে মেরামত করেছেন চুমকি চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার সাহস আমার নেই। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অনুজপ্রতিম শিল্পী সুদীপ্ত দত্ত, মানস, অনিমেষ, শুভাশিস এবং বরুণকেও।

সবার পরিশ্রম সার্থক হবে, যদি জগুমামার এই সংগ্রহ সববয়েসি জগুমামা-প্রেমীকে খুশি করে।

২৫ ডিসেম্বর ২০১০

কলকাতা ৭০০ ০০৯

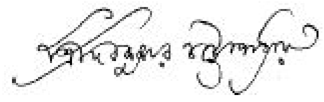

সূচিপত্র

হাত

ছায়ামূর্তি

আলোয় সেদিন অন্ধকার

মুখোশের আড়ালে

রুকটুকার পাড়ে

বড় পায়ের খোঁজে

নীল কাঁকড়ার রহস্য

জগুমামার বিপক্ষে 'জগুমামা'

হাত

১

লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। আধঘন্টা হল, ঘুম ভেঙে গেছে। পিকলুটা, রোজকার মতো আগেই উঠে পড়েছে। 'এই দাদা ওঠ না, আর কত ঘুমোবি' বলে বারকতক ঠেলাও মেরেছে। আমি কোনও সাড়াশব্দ করিনি দেখে নিরাশ হয়ে চলে গেছে বারান্দায়।

ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে আপনমনে গান গাইছে আর পা দিয়ে তাল ঠুকছে। লেপের ফাঁক দিয়ে ওর গান শুনছি, তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে...

ডিসেম্বরের গোড়াতেই এবার ঠান্ডা পড়েছে জব্বর। তার উপর গত দুদিন আবার টিপটিপ বৃষ্টি পড়েছে। তাতে ঠান্ডার কনকনানি বেড়ে গেছে অনেকখানি। আজকে আকাশ নীল। ভোরের কমলা আলো খেলা করছে ঘরে।

এক সপ্তাহ হল অ্যানুয়াল শেষ হয়েছে। সামনে বেশ ক'টাদিন টানা ছুটি। এই ছুটিটার জন্যে সারাটা বছর হাপিত্যেস করে বসে থাকি। লেখাপড়া নিয়ে বাবা-মা-র টিকটিক নেই, স্কুলের হোমটাস্ক আর উইকলি

টেস্টের চোখ রাঙানি নেই—যাকে বলে নির্ভেজাল অবসর। বেড়াও, খেলো, ঘুমোও, আড্ডা দাও, কেউ কিছু বলবে না।

প্রত্যেকবারই এই ছুটিটা হুশ-হুশ করে ফুরিয়ে যায়। কত কিছু ভেবে রাখি—'এই করব—সেই করব, এখানে যাব—সেখানে যাব,' শেষ পর্যন্ত কোনওটাই আর হয়ে ওঠে না,

দাদা, দাদা! শিগগির ওঠ। জগুমামা এসেছে,—পিকলুর ডাকে সুখচিন্তা কেটে গেল।

লেপ তুলে উঠে বসলাম।

জগুমামা কেন? গত পরশুই তো ভারত সরকারের সিলকরা খামে মামার চিঠি এসেছিল। শিলং থেকে। মামা লিখেছিলেন,—

এখানে কনকনে ঠান্ডা। রাত্তিরে ফায়ার প্লেসের সামনে বসে চিঠি লিখছি। বিকেল চারটের পর হাড়কাপানো ঠান্ডায় বাইরে থাকা যায় না। কলকাতার সবচেয়ে প্রবল শীত এর কাছে শিশু। কিন্তু উপায় কী, গবেষণার কাজ। কাজটা এমন জটিল যে শীত ছাড়া করাও যাবে না।

চিঠিতে এরপর 'তোরা কেমন আছিস...পারলে সামনের মাসে একবার যাবার চেষ্টা করব...' এইসব।

আর বলিস না দিদি। ট্রেন ছ'ঘণ্টা লেট। ভোগান্তির এক শেষ।—বাঁ-হাতে ঢাউস স্ট্রোলিব্যাগ ঠেলতে-ঠেলতে ঢুকে পড়লেন জগুমামা।

—ট্রেনে এলি? কেন, প্লেন?

ধ্যুৎ! টিকিট পেলে তো! জগুমামা বিরক্তির সুরে বললেন, দেশটার যা অবস্থা হয়েছে! সর্বত্র শুধু জাল আর জোচ্চুরি। টানা তিন-চারদিন এয়ারে কোনও টিকিট নেই। গতকাল কী একটা সম্মেলন ছিল গৌহাটিতে, ভিআইপি-রা সব ফিরছেন। সব ফুল।

দু-চারদিন অপেক্ষা করে না হয় প্লেনেই আসতে।—আমি বললাম।

সে উপায় নেই রে!—ঘরের সোফায় এলিয়ে পড়ে জগুমামা বললেন, একটা টেলিগ্রাম! সেই টেলিগ্রাম পাওয়ার পরে আমার পক্ষে একমুহূর্তও দেরি করা সম্ভব নয়। সব কাগজপত্র যেমনকার তেমনি ফেলে চলে এসেছি, আজকেই রওনা হতে হবে রাঁচিতে।

কী বলছিস রে জগু? এইমাত্র এলি, আবার আজকেই চলে যাবি?—চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে মা বললেন।

—হ্যাঁরে দিদি যেতেই হবে। বলছি সব, চান করে নিই।

হ্যাঁ, ওকে একটু ফ্রেশ হতে দাও।—বাবা বললেন।

জগুমামা চা শেষ করে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে গেলেন। আমরা কৌতূহলে ফুটছি। মামা এলেন, আবার আজই চলে যাবেন? কী ঘটল?

এই ফাঁকে জগুমামার পরিচয় দিয়ে রাখি, যে কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম শুনে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন ড: জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সেটা জগুমামার নামের পাশে দু-লাইন ধরে শোভা পাওয়া দেশি-বিদেশি ডিগ্রিগুলোর জন্যে নয়। বিজ্ঞানের যে-কোনও শাখাতে তাঁর অনায়াস পান্ডিত্য সবার কাছেই বিস্ময়কর।

এ বছরের গোড়ার দিকে জগুমামার সর্বশেষ আবিষ্কার 'কয়লার মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা'-র কথা ফলাও করে বেরিয়েছিল কাগজে। তারপর সারা দেশ জুড়ে সে কী হইচই। মামা তখন কলকাতায়, আমাদের বাড়ি। দিনের পর দিন সাংবাদিক, দর্শনার্থী আর বিজ্ঞানীদের শুধু আসা-যাওয়া। আমাদের বাড়িটা রাতারাতি যেন তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল।

মামার জন্যে তাই আমাদের গর্বের অন্ত নেই। তাঁর আপনজন বলতে তো আমরাই। দিদি, জামাইবাবু আর দুই ভাগ্নে। বিয়ে থা করেননি। সারাবছর দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন রিসার্চ আর সেমিনারে, ফাঁক পেলে আমাদের বাড়ি।

মামা হাত-মুখ, চান-টান সেরে বেরিয়ে এসেছেন। একটা সিগারেট ধরালেন। আমরা মামার দিকে তাকিয়ে বসে আছি।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মামা বুকপকেট থেকে বের করলেন, একটা লাল কাগজ। এগিয়ে দিয়ে বললেন,—নে পড়।

—টেলিগ্রাম। শুধু লেখা—

দুবে সিরিয়াস, কাম অ্যাট ওয়ান্স। রাঁচি পি এইচ কিউ।

—বুঝলি কিছু?

—না।

—আমার বিজ্ঞানী বন্ধু প্রাণশেখর দুবের কথা মনে আছে তোদের? সেই যে গতবছর এখানে এসে তোদের সঙ্গে খুব মজা করেছিল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। দুবে আঙ্কেল। দারুণ মানুষ। টেলিগ্রামে কি তারই কথা আছে?

গম্ভীরভাবে মামা মাথা উপর নীচ করলেন। তারপর বললেন,—প্রাণশেখর মাসদুয়েক ধরে রাঁচির কাছাকাছি জংলি এলাকার গাছপালা আর মাটি-পাথরের উপর এক বিশেষ ধরনের পরীক্ষা চালাচ্ছিল। দিন

পনেরো আগে ওর শেষ চিঠি পাই। শিলঙে। তাতে ও লিখেছিল, রিসার্চ খুব ভালো এগোচ্ছে।...তারপরেই এই টেলিগ্রাম।

—কিছু আঁচ করতে পেরেছ। মামা?

—না রে। মনটা তাই খুব অস্থির। কী হল দুবের? সত্যিকারের একজন বিজ্ঞানী মানুষ, জামাইবাবু, রাঁচি-হাতিয়া এক্সপ্রেসের টাইমটা জানেন?

মনে হয় রাত ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ।—বাবা বললেন, তুমি আজই যাবে বলছো, কিন্তু রিজার্ভেশন?

তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।—জগুমামা বললেন, টেলিফোনটা ঠিক আছে তো?

বাবা টেলিফোন কানে দিলেন,—হ্যাঁ, আপাতত সচল।

সাইড ব্যাগ খুলে ছোট একটা ডায়েরি বের করলেন মামা, তারপর বাবাকে জিগ্যেস করলেন, ক'টা টিকিট দিতে বলি বলুন তো?

—মানে?

—মানে টুকলুর তো পরীক্ষা শেষ, ও যদি আমার সঙ্গে যায়, আপনাদের আপত্তি আছে? আর ও তো এখন গ্রোয়িং ইয়ং ম্যান! কীরে টুকলু? তোর নিশ্চয়ই আপত্তি নেই।

আপত্তি! আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। মামার সঙ্গে জীবনে প্রথম বাইরে যাব!

বাবা একটু ভাবলেন, তারপর বললেন,—যাক না। তুমি যখন রয়েছ...দেখি ওর মা আবার কী বলে?

ঠিক জানতাম, পিকলু বাগড়া দেবে। কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই বিচ্ছুটা ছুটে গেছে রান্নঘরে মায়ের কাছে। বায়না জুড়েছে,—আমিও যাব, আমিও যাব।

এই রে, হনুমানটার জন্যে সবটাই না ভেস্তে যায়। মা হাত মুছতে-মুছতে ঘরে ঢুকলেন,—কী ব্যাপার? কে কোথায় যাচ্ছে?

বাবা সব বললেন, মা আমার দিকে তাকালেন। আমি তখন ধ্যানী বুদ্ধ।

তারপর বললেন,—দেখিস জগু টুকলুকে নিয়ে খুব সাবধান। দেখতে বড়সড় হলেও ও একেবারেই ছেলেমানুষ।

বোঝো ব্যাপারটা। মায়ের কাছে কে ছেলেমানুষ নয়?

২

টুকুল, আর দেরি করিস না। টিফিন ক্যারিয়ার খুলে ফ্যাল।—হাতের বইটা বন্ধ করলেন জগুমামা।

মহা বেরসিক লোক তো! মিনিট দশেকও হয়নি, কার শেডের তল্লাট ছেড়ে সবে স্পিড নিয়েছে হাতিয়া এক্সপ্রেস। বাইরে অন্ধকারের বুকে আলোর ঝলকানি। হুহু করে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে ভেতরে। জানলার ধারে বসে খুব উপভোগ করছিলাম। মনের মধ্যে বেশ একটা ছমছমে উত্তেজনা।

—হাঁ হাঁ, খোঁখাবাবু, চটপট খানা খাকে শো যাও, অব জানলাটা ভি বন্ধ কর দেও। বড়ি ঠান্ডি হাওয়া আতি হ্যায়।

খোকাবাবু! রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বক্তা ওধারের আপার বার্থে অধিষ্ঠিত। গোলগাল চেহারার মধ্যবয়েসি লোক। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। গামছা দিয়ে বার্থের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন।

যাচ্ছেন কোথায়? জগুমামা জিগ্যেস করলেন।

—রাঁচি। হামার ওখানেই লকড়ির বেওসা। জঙ্গলমে ঠিকাদারি। ওল্ড হাজারিবাগ রোডের যো কুন লকড়ির দুকানে কৃষ্ণকান্ত পাশোয়ান বোলনেসে চিনে নেবে। আপ—

—আমরা কলকাতার লোক। রাঁচি বেড়াতে যাচ্ছি। আমার নাম জগবন্ধু মুখার্জি। এ আমার ভাগ্নে, অর্ণব। ক্লাস টেনে পড়ছে।

—বা: বা: বহোত আচ্ছা। ইতো ছোটো লড়কা দশমমে পড়তেছে?

ছোটা লড়কা! আবার আপাদমস্তক জ্বলে গেল।

ছয়জনের এই ক্যুপের একদিকের লোয়ার ও মিডল বার্থে আমি ও জগুমামা। অন্যদিকের পাশোয়ানজির নীচের দুটি বার্থে এক দম্পতি, বয়েস তিরিশের আশেপাশে।

ভদ্রলোক বললেন,—ভাই, তুমি কোন স্কুলে পড়ছ?

—সেন্ট লরেন্স।

—বা:। জানো, আমিও সেন্ট লরেন্স থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছি। বছর পনেরো আগে।

—ও আপনি কলকাতার লোক?

—না। একসময় ছিলাম। স্কুল-কলেজ সবই কলকাতায়। শ্বশুরবাড়িও কলকাতায়। সেখান থেকে ফিরছি।

এখন রাঁচিতে সেটলড?—জগুমামা বললেন,

তা বলতে পারেন। বছরদুয়েক হল বিজনেসের খাতিরে রাঁচিতেই থাকতে হচ্ছে।—ভদ্রলোক স্টিলফ্রেমের চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে লাগলেন। বেশ হাই পাওয়ারের চশমা। তারপর বললেন, আমার সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লায়েন্সের বিজনেস। আপনি কী করেন, বিজনেস না চাকরি?

অম্লানবদনে মামা বললেন,—সরকারি চাকরি। মিস্টার দারুকা, আপনার পুরো নামটা বলবেন?

পুরো নাম? চমকে উঠেছি। মামা ভদ্রলোকের পদবি জানলেন কোত্থেকে?

ভদ্রলোকও বেশ ঘাবড়ে গেছেন, তো-তো করে বললেন,—ইয়ে মানে...প্রবীর দারুকা। কিন্তু...মানে...

জগুমামা হেসে উঠলেন। বললেন,—এত চমকাবার কী আছে? আপনার ব্রিফকেস থেকে যে কার্ডটা ঝুলছে, তাতে তো ছাপা রয়েছে পি দারুকা।

তাই তো! খেয়াল করিনি। সত্যি, মামা জিনিয়াস।

মামা বললেন,—শার্লক হোমস পড়েছেন? একবার এক ভদ্রলোক হোমসের কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছেন। ভদ্রলোককে হোমস কস্মিনকালেও দ্যাখেননি। কিন্তু ভদ্রলোক এসে ঢুকতে হোমস পটাপট বলতে শুরু করলেন ভদ্রলোকের ঠিকানা-ঠিকুজি...তাঁর স্বভাব...এই সব। ভদ্রলোক থ! পরে হোমস বুঝিয়ে বললেন, ভদ্রলোক সম্পর্কে যা যা তিনি বলেছেন, তার সব ক্লু বা চিহ্ন ভদ্রলোকের সঙ্গেই ছিল। আসলে সজাগ ইন্দ্রিয় আর বিশ্লেষণী ক্ষমতা থাকলে অনেককিছুই বলে দেওয়া যায়। বড় বড় জ্যোতিষীদের এই গুণটা থাকে।

প্রবীরবাবুর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠেছে। স্যুটের পকেট থেকে সেই বড় রুমালটা বের করে মুখ মুছলেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী আলতো টোকা দিলেন। শুয়ে পড়ার সিগন্যাল। প্রবীরবাবু দাঁড়িয়ে হোল্ডঅল খুলতে শুরু করলেন।

এই ক্যুপের ছয় নম্বর যাত্রী এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। ভদ্রলোক সেই কখন থেকে ড্যাবড্যাব করে জগুমামার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের মধ্যে, মুখে গোঁফদাড়ির জঙ্গল, পোশাক ধুতি এবং কোট।

হঠাৎ উনি নীচের দিকে ঝুঁকে বলে উঠলেন,—কিছু মনে করবেন না, আপনিই কি বিজ্ঞানী জগবন্ধু মুখার্জি?

অ্যাঁ! হ্যাঁ। হ্যাঁ!—মামা একটু অপ্রস্তুত, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

চিনবেন কি করে স্যার?—ভদ্রলোক দু-হাত জোড় করে মাথা দোলাতে থাকেন, নমস্কার, নমস্কার। আমি আপনাকে ফোটোতে দেখেছি, সামনা-সামনি দেখার সৌভাগ্য হল এই প্রথম। আমি স্যার নেহাত সাধারণ লোক। রেডিমেড জামা-কাপড়ের একটা দোকান আছে রাঁচিতে। অধমের নাম স্যার অনন্ত কুমার সরখেল।

বা:-বা:!—জগুমামা বললেন, আপনি তাহলে রাঁচিরই লোক?

হ্যাঁ স্যার।—ভদ্রলোক গদগদ হয়ে বললেন, মা-ভাইয়েরা অবিশ্যি কলকাতায়। আমি একাই থাকি।

ক্যুপের বাকি সকলেই এখনও জেগে, ভদ্রমহিলা ছাড়া। আমি নিশ্চিত, আজ সারা রাতটা হয়তো জেগেই কাটাতে হবে। কারণটা আর কিছুই নয়, ভদ্রমহিলার নাকের গর্জন! এত অল্পবয়সি কোনও মহিলার এমন নাকডাকা আগে কখনও শুনিনি।

স্যার, আপনি কি কোনও নতুন আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন?—অনন্তবাবু বললেন।

না-না। সরকারি কাজ।—তাড়াতাড়ি দায়সারা উত্তর দিয়ে জগুমামা বললেন, কি হে টুকলুবাবু রাত কত হয়েছে দেখেছ? এখুনি খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে।

লুচি, আলুর দম, সুজির পায়েসে টিফিন ক্যারিয়ারটা বোঝাই, মায়ের কোনও মাপ নেই। যা ঠেসে দিয়েছে, আমরা দুজন কেন, চারটে তাগড়া জোয়ানও খালাস করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

মামা ডাকলেন তিনজনকে,—আসুন, একটু হাত লাগান, হেল্প করুন।

প্রবীরবাবু মুখ বিকৃত করে পেটে হাত দিলেন। ঠিক বোঝা গেল না, গণ্ডগোল না ভরতি। কৃষ্ণকান্ত আর অনন্তবাবুও হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, তাঁদের খাওয়া হয়ে গেছে। পেট বিলকুল টাইট।

মামাও নাছোড়বান্দা। মিনিটদেড়েক টানাহ্যাঁচড়ার পর দুজনেই দুদিক থেকে নেমে এলেন।

শুনেছিলাম রাঁচির জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। তার প্রমাণ যে একেবারে শুরুতেই পাব, ভাবিনি। লজ্জা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে পাশোয়ান আর সরখেল যেরকম হুমড়ি খেয়ে পড়লেন প্লেটের ওপর এবং তৎপরতার সঙ্গে সবকিছু উড়িয়ে দিলেন, রীতিমতো তাজ্জব হলাম। কৃষ্ণকান্ত না হয় বিহারী, কিন্তু অনন্ত সরখেল? কে বলে বাঙালি পেট রোগা।

ঘণ্টাখানেক লেট করে যখন রাঁচি স্টেশনে ঢুকল, ঘড়িতে তখন ন'টা বেজে গেছে। এর মধ্যে অবশ্য আমাদের দাঁত-মাজা, বাথরুম, চা-পর্ব সব শেষ। চারিদিকে ঝকঝকে রোদ্দুর।

প্ল্যাটফরমে পা দিতেই স্যুট-টাই পরা এক ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

—হ্যাল্লো, ডক্টর মুখার্জি!

—আপনি? কবে এলেন?

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে বললেন,—গাড়ি বাইরে। আসুন। এই ইয়ং চ্যাপকে তো ঠিক—

—আমার ভাগ্নে। অর্ণব ভট্টাচার্য। ক্লাস টেনে পড়ছে।

ও তাই, ভেরি গুড। হ্যাল্লো অর্ণব।—ভদ্রলোক হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমি সত্যসাধন পট্টনায়েক। তোমার মামার বন্ধু।

এই সময় কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে কোত্থেকে এসে হাজির হলেন অনন্ত সরখেল।

—স্যার, একটা কথা বলব? একদিন যদি স্যার সময় করে অধমের দোকানে পায়ের ধুলো দেন—

—আহা, এমন করে বলার কি আছে? সময় পেলে নিশ্চয়ই যাব। আপনার দোকানটা কোথায়?

—একদম মেন রোডের উপরই। হুড্রু-জোনা যাওয়ার ট্যাক্সি-অটোগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, ওর কাছেই। 'হ্যাপি ড্রেসেস'। আচ্ছা স্যার নমস্কার।

৩

ঘুম ভাঙতে দেখলাম, পাঁচটা বেজে গেছে। শীতের ছোট বেলা। সূর্য ডুবে গেছে। বাইরের আকাশে রঙের শেষ হোলি খেলা চলেছে। ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার, বাড়ছে ঠান্ডা।

জগুমামা ওদিকের সোফায় হেলান দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

দুপুরের খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছিল। হোটেল 'সম্রাট' যথেষ্ট আরামপ্রদ। থাকা খাওয়া সব ব্যবস্থাই ভালো।

স্টেশন থেকে হোটেলে আসার সময় মামার সঙ্গে বিশেষ কথা হয়নি পট্টনায়েকের। মামা দু-একবার প্রাণশেখর দুবে প্রসঙ্গে জিগ্যেস করেছিলেন। পট্টনায়েক শুধু 'সন্ধেবেলায় যাচ্ছি' বলে চুপ করে গেছেন।

মাথায় জল ও পেটে ভাত পড়তেই আমার দুটো চোখ জড়িয়ে এসেছিল। নরম বিছানায় কম্বল টেনে নেওয়ার আগের মুহূর্তে দেখেছিলাম, মামা আজকের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস খুলে ধরেছেন।

এরমধ্যে মি: পট্টনায়েকের পরিচয় পেয়ে গেছি। সিবিআই-এর দিল্লি হেডকোয়ার্টাসের সিনিয়র অফিসার। জগুমামার সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়। অনেক জটিল রহস্য উদঘাটনে পট্টনায়ককে হেল্প করেছেন মামা।

টুং-টুং-টুং। কলিংবেল।

দরজা খুলতেই হোটেলের বেয়ারা সেলাম ঠুকল,—সাব, চায়ে না কফি? স্ন্যাকস কুছ চাহিয়ে?

কফি। সাথমে পকোড়া।—বলে দিলাম।

দরজা বন্ধ করে সবে বিছানায় এসে বসেছি, আবার টুং-টুং-টুং।

কী হল? বলে তো দিলাম সবই।

বিরক্তির সঙ্গে দরজা খুলেই, আরে!

—আসুন, আসুন।

পট্টনায়েক ও সঙ্গের ভদ্রলোক সামনের সোফায় বসলেন। ভদ্রলোকের হাতে একটা ব্রিফকেস।

পট্টনায়েক বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন আনন্দ পাণ্ডে, রাঁচির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন পট্টনায়েক। এগিয়ে দিলেন মামার দিকে।

তিনজনের হাতেই জ্বলন্ত সিগারেট। বেশ কয়েকবার জোরে জোরে টান দিলেন পট্টনায়েক। তারপর স্থিরচোখে মামার দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন,—পান্ডে, অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কী! টেপরেকর্ডার চালু করুন।

কী ব্যাপার পট্টনায়েক সাহেব?—জগুমামা বললেন, আপনি দেখছি আমাকেও রহস্যে রাখছেন। আরে, মুখেই বলুন না?

—শুনুন টেপটা। কিছুই বোঝাবার দরকার হবে না।

পাণ্ডে ব্রিফকেস থেকে যন্ত্রটা বের করে ফেলেছেন, মিনিটখানেক খুটখাট করলেন। তারপর বললেন,—স্টার্ট করছি।

তাকালাম পট্টনায়েকের দিকে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একমনে সিগারেট টেনে চলেছেন।

টেপ বেজে উঠল। ফ্যাস-ফেসে গলা। থেমে-থেমে ইংরেজিতে বলছে, প্রচণ্ড বৃষ্টি। এবড়ো-খেবড়ো জংলি পথ, অন্ধকার রাত। আমার জিপ ছুটে চলেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সামনের পথ দু-দুটো হেডলাইটের জোরালো আলোতেও ঝাপসা। উইন্ডস্ক্রিনের ওয়াইপার দুটো বৃষ্টির তোড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিল না।

রাঁচি ফিরছি, হুড্রু থেকে।...'

এক মিনিট! একমিনিট!—আচম্বিতে জগুমামা চেঁচিয়ে উঠলেন, এ—

এটা কার গলা? ক-কে? কে বলছে?

—ডক্টর দুবে।

—দুবে! মানে প্রাণশেখর দুবে? কোথায় সে?

—প্লিজ একটু শুনুন।

—আরে! আ-আমি...পট্টনায়েক...একটু...

—বুঝতে পারবেন। পান্ডেজি স্টার্ট করুন।

টেপ চলতে শুরু করল, 'জিপ এগিয়ে চলেছে...কখন যে রাঁচি পৌঁছব জানি না...আমারই জন্যে এত রাত হয়ে গেল।'

হঠাৎ—থপ থপ থপ!

জিপের হুডের ওপর কী একটা পড়ল। গাছের ভাঙা ডালটাল? না:, শব্দ হচ্ছে যে—থপ...থপ...থপ।

চমকে তাকালাম হুডের দিকে। জিনিসটা এগোচ্ছে চাল বেয়ে—খস খস খস...

তবে কি কোনও ছোটখাটো প্রাণী? গাছ থেকে গাড়ির চালে লাফিয়ে পড়েছে?

পরক্ষণেই উধমের ভয়ার্ত আর্তনাদ,—সা-আ-ব! উ ক্যা...ক্যা হ্যায়?

উইন্ডস্ক্রিনের দিকে তাকিয়েই শিউরে উঠেছি। কী দেখছি, দু:স্বপ্ন?

হাত! একখানা কাটা হাত। রক্তমাংসের, জীবন্ত। তাঁর পাঁচটা আঙুল মাকড়সার মতো কিলবিল করছে উইন্ডস্ক্রিনের ওপর। এ কী অসম্ভব! শুধু একখানা হাত! জ্যান্ত!

ভূত? অশরীরী? বিশ্বাস করি না—তা হলে? বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে...

হাতটা হঠাৎ সক্রিয় হল। ঘোলাটে চোখে শুধু দেখলাম...এগোচ্ছে সে উইন্ডস্ক্রিনের গা বেয়ে...থপ...থপ...তারপর...বিশ্বাস করুন, স্পষ্ট দেখলাম শক্ত মুঠোয় সে চেপে ধরেছে ওয়াইপার দুটোকে।...

মুহূর্তে সামনে পুরো ঝাপসা....গাড়ি ছিটকে গিয়ে কোথাও ধাক্কা মারল। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা।...সব অন্ধকার।...'

হ্যাঁ, ডক্টর মুখার্জি। এতক্ষণ শুনলেন ডক্টর দুবের শেষ জবানবন্দি।—সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে পট্টনায়েক বললেন।

—মানে? দুবে—দুবে...কী বলছেন আপনি?

টুং-টুং-টুং। আবার বেল। জগুমামা বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত! সোফায় এলিয়ে পড়েছেন। উঠে দরজা খুলে দিলাম। হোটেলের বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে।

কফিতে চুমুক দিয়ে পট্টনায়েক ধীরকণ্ঠে বললেন,—এই জবানবন্দি দেওয়ার ঘন্টাখানেক পরেই রাঁচি সেন্ট্রাল হসপিটালের আইসিইউতে প্রাণশেখর দুবে মারা যান।

আমার মনে হয়েছে স্যর, এই অবিশ্বাস্য জবানবন্দি দেওয়ার জন্যেই দুবেজির জীবনীশক্তি যেন তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।—পাণ্ডে বললেন, দুর্ঘটনার সময় বোধহয় রাত ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা। অন্যদিন কাজ সেরে আটটার আগেই রাঁচি ফিরে আসতেন। পরদিন ভোরে গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খাওয়া দুমড়ানো জিপটাকে দেখে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ছুটে যায়। ড্রাইভার স্পট ডেড। বুকে স্টিয়ারিং ঢুকে গেছে। দুবের অসাড় শরীর ছিটকে বাইরে কাদামাটিতে পড়ে ছিল। দুবেকে যখন হসপিটালে ভরতি করা হয়, ততক্ষণে দুর্ঘটনার পরে দশঘন্টা কেটে গেছে। দুবে জীবিত, তবে কোমায়। অচেতন। সকাল দশটা নাগাদ দুবের হঠাৎ জ্ঞান ফিরে এল। চোখ তাকিয়ে কাউকে খুঁজছিলেন। আমার তখন বাইরে। ডাক্তারদের নিষেধ সত্বেও ভেতরে আমরা ঢুকে পড়ি টেপ নিয়ে। এই জবানবন্দি দেওয়ার পর দুবে আবার কোমায় চলে যান। সে জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। মৃত্যুর কারণ ব্রেন হেমারেজ।

—পুরোটাই একটা মিস্ট্রি! তাই না ডক্টর মুখার্জি?

কোনও জবাব নেই। জগুমামা চোখ বুঁজে এলিয়ে আছেন। বিজ্ঞানী বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু মামাকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। জগুমামা ধীরে-ধীরে চোখ খুললেন। আস্তে-আস্তে বললেন,—যতদূর জানি, দুবে খুব স্ট্রেট ফরোয়ার্ড র‍্যাশনাল মানুষ ছিল। কিন্তু সে দেখেছে...একটা হাত? শুধু একখানা জীবন্ত কাটা হাত? সেই হাত চলাফেরা করে! হাউ ইস ইট পসিবল?

পুলিশের চাকরি করছি ত্রিশ বছর। এমন অদ্ভুতুড়ে ঘটনা শুনিনি।—পাণ্ডে বিড়বিড় করলেন।

—পাণ্ডেজি একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না, অদ্ভুতুড়ে, অলৌকিক কথাগুলো ফালতু। বিজ্ঞান যত এগোচ্ছে, সব অলৌকিক লৌকিক হয়ে যাচ্ছে, ব্যাখ্যা মিলছে।

সা-ব্বা-স।—জগুমামা যেন সংবিত ফিরে পেলেন, ঠিক বলেছিস টুকলু। এই রহস্যেরও ব্যাখ্যা রয়েছে। মিস্টার পট্টনায়েক, বিষয়টা গোপন আছে তো?

—হ্যাঁ, 'দৈনিক বিহার'-এর রিপোর্টাররা অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে ছেপেছে 'জিপ দুর্ঘটনায় এক বিজ্ঞানীর মৃত্যু'। ব্যস, ওইটুকুই।

—যাক জানাজানি হলে সমস্যা তৈরি হত। আপনারা কি দুর্ঘটনার জায়গা গেছিলেন?

হ্যাঁ,—পাণ্ডে বললেন, বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি, দুবের নিজস্ব জিনিসের টুকরো-টাকরা ছাড়া সেগুলো সব আমার হেফাজতে আছে।

একদৃষ্টিতে পাণ্ডের দিকে তাকিয়েছিলেন মামা। অনেকটা সামলে উঠেছেন। বললেন,—কাল সকালে আমরা যাব দুর্ঘটনা আর দুবে যেখানে রিসার্চ করছিল, দুই জায়গাতেই। ঠিক আছে?

৪

বিশাল বিশাল শালগাছেরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝেমধ্যে দু-একটা শিমূল-মহুয়াও চোখে পড়ে। নিবিড় বন। মাঝের সরু অসমতল রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের জিপ।

ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। মিষ্টি রোদ্দুরে মাখা মনোরম সকাল। ঝাঁকড়া গাছগুলো বিচিত্র নকশা তৈরি করেছে বনপথে। আমরা চলেছি হুড্রু জলপ্রপাতের দিকে।

পাণ্ডে বলছিলেন, রাঁচি থেকে হুড্রুর দূরত্ব তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ কিলোমিটার। দুর্ঘটনাস্থল তার বেশ খানিকটা আগেই।

জিপ নিস্তব্ধ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। জিপ চালাচ্ছেন পাণ্ডে, পাশে পট্টনায়েক ও মামা। পিছনে আমি। চোখ-মন দিয়ে শুষে নিচ্ছি সবুজ প্রকৃতিকে।

মামা হঠাৎ বললেন,—পাণ্ডেজি। দুবে যখন রিসার্চ করছিল, তখন সন্দেহজনক কিছু ঘটেছিল? কোনওদিন কোনও হুমকি-টুমকির কথা বলেছিল?

একেবারেই না!—ওদিন থেকে ছুটে আসা গাড়িকে পাশ কাটিয়ে পান্ডে বললেন, বরং আমরা মাঝেমধ্যে ওনার খোঁজখবর নিয়েছি। পট্টনায়েক স্যর বলে দিয়েছিলেন। সব সময়ে বলতেন, সব ঠিক হ্যায়! গ্রামের লোকজন খুব ভালো।

জিপ থেমে গেছে। আমরা নেমে পড়লাম।

প্রথমেই চোখে পড়ল রাস্তার ধারের বিশাল শালগাছটা। সারা গায়ে দগদগে ক্ষত। চাকলা-বাকলা উঠে গেছে। শিকড় একদিকে একটু উপড়ে উঠেছে।

পান্ডে এগিয়ে গেলেন। একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক এইখানেই পড়ে ছিল দুবের শরীর। আগের রাতের বৃষ্টিতে এই জায়গাটা তখন জল থৈ-থৈ। ছোটখাটো আগাছার ঝোপ। মাটি বেশ নরম, ঢালু, অনেকটা কড়াইয়ের মতো। বৃষ্টি হলে এখানেই প্রথমে জল জমবে, সন্দেহ নেই।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল কাঠির মতন চকচকে কী একটা পড়ে আছে ঝোপের একটু দূরে। কুড়িয়ে নিতে নীচু হয়ে দেখি—ধ্যুৎ! চশমার একটা ভাঙা ডাঁটি।

ফেলে দিতে যাচ্ছি, জগুমামা হাত বাড়ালেন,—আমায় দে।

কী জানি, ওই ভাঙা ডাঁটি কোন কাজে লাগবে। মামা পকেট ঢোকালেন।

ঝোপের সামনে মামা নীচু হয়ে বসে আছেন, আমি ঘুরে-ঘুরে দেখছি, পাণ্ডে আর পট্টনায়েক স্বামীজির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। নিস্তব্ধ বনভূমি। শুধু মাঝে-মাঝে 'ট্যাক্সি অটোর সাঁ-সাঁ শব্দ। ট্যুরিস্টরা হুড্রু যাচ্ছে ফিরছে।

হঠাৎ বন কেঁপে উঠল প্রচণ্ড হুঙ্কারে,—চো-ও-প। মুঝে উল্লু বানানা চাহতে হো?

চারজনেই ঘুরে তাকিয়েছি। মামার ভ্রুদুটো সেকেন্ড ব্র্যাকেট। নির্জন জঙ্গলে কে চিৎকার করছে? আরেকটু ভিতরে এগিয়ে গেলাম।

তর্জন-গর্জন থেমে নেই। অপর পক্ষের কোনও জবাব শুনতে পাচ্ছি না। প্রথম পক্ষ বলে চলেছে, কাল ভি তুম একহি বাত বোলা থা, 'ডর লাগতা হ্যায়'! কেয়া, কেয়া চাহিয়ে তুমে?

বনের মাঝখানে বেশ কিছুটা ফাঁকা গোল জায়গা। কিন্তু এ কাকে দেখছি?

কৃষ্ণকান্ত পাশোয়ান!

মামার মুখের দিকে তাকালাম। ভাবলেশহীন। গাছের আড়ালে আমরা চারজন নি:শব্দে দাঁড়িয়ে।

অন্যপক্ষের নীচুগলা এবার শুনতে পাচ্ছি, দেখতেও পাচ্ছি। শতচ্ছিন্ন নেংটি পরা এক কালো মানুষ। মাথা নীচু করে সে বলছে,—মাফ কর দিজিয়ে হুজোর। মেরা কেয়া কসুর? উলোগ সব বোল রহে—

ফির ওহি বাত?—সঙ্গে-সঙ্গে দাবড়ে উঠলেন কৃষ্ণকান্ত, উ লোগকা বাত শুনকর ম্যায় কেয়া করু? তুম সর্দার হো! তুমকোই সব ইন্তেজাম করনা পড়ে গা। শুন কাল্লু, কালসে সব ঠিকঠাক নেহি চলে তো হামকো আলগ বিচার শোচনা পড়েগা।

উনি যে আমাদের দেখতে পেয়েছেন, বুঝিনি। তার পরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণকান্ত।

মামা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন,—কী খবর কৃষ্ণকান্তজি? চিনতে পারছেন তো?

—জরুর। একবার মুলাকাত হোলে উ আদমিকে ভোলে না কৃষ্ণকান্ত।

তারপরেই বললেন,—আরে পাণ্ডে সাব! নমস্তে জি। কেয়াবাত! মুখার্জিবাবু, ডিপটি কমিশনার সাব আভি আপনাদের গাইডের নোকরি লিয়েছেন! বেড়ান আচ্ছা সে বেড়ান। কোই ডর নেহি।

আমরা চুপ।

কয়েক সেকেন্ডের নৈ:শব্দ। পট্টনায়েক বললেন,এদিকের কাজ তো শেষ ডক্টর মুখার্জি। এবার তা হলে ড: দুবের গবেষণার জায়গায় চলুন।

লাফিয়ে লাফিয়ে আমরা নেমে চলেছি পাহাড়ি ধাপ ভেঙে। আঁকা বাঁকা শুঁড়ি পথ। ছোটখাটো ঝোপঝাড়।

বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছে। জলপ্রপাত চোখে দেখিনি কোনওদিন, বিদেশি সিনেমায় দু-একবার দেখেছি। মনে তাই নানারকম প্রশ্ন ভিড় করে আসছে। কিন্তু মামার মুখের যা পরিস্থিতি, তাতে তাঁকে জিগ্যেস করতে সাহস হচ্ছে না।

—পাণ্ডেজি, হুড্রু কি আমাদের কোনও পরিচিত নদীর জলপ্রপাত?

নিশ্চয়ই।—পাণ্ডে বললেন, সুবর্ণরেখার নাম শুনেছ তো? এক কালে যার বালিতে নাকি সোনার গুঁড়ো পাওয়া যেত। তারই জলপ্রপাত হুড্রু।

—আচ্ছা, রাঁচির কাছে তো আরও জলপ্রপাত আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, দশম ফলস আর জোনা ফলস যার অন্য নাম গৌতম ধারা। ওখানে ভগবান বুদ্ধের একটা মূর্তিও রয়েছে। তবে এই তিনটি জলপ্রপাতের মধ্যে জলের তোড় সবচেয়ে বেশি হুড্রুতে। শুকিয়ে আসছে ক্রমশ। তবে এখনও যেটুকু আছে কম নয়।

প্রায় খাদের শেষে চলে এসেছি। জলের 'গুড়গুড়' গর্জন ভেসে আসছে।

মামা, পট্টনায়েক অনেকটা এগিয়ে গেছেন। আঁকাবাঁকা পথে ওদের আর দেখা যাচ্ছে না।

একটা বাঁক ঘুরতেই—আ:! কী অপরূপ!

অনেক উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে দুরন্ত বেগে ঝাঁপ দিচ্ছে সুবর্ণরেখা...সগর্জনে আছড়ে পড়ছে নীচের পাথরের উপর...

এবার কোনদিকে?—মামার গলার স্বরে বাস্তবে ফিরে এলাম।

আসুন।—পট্টনায়েক আঙুল তুললেন ঘন বনের দিকে, আমাদের ওখানে যেতে হবে।

পাথুরে বোল্ডারগুলো বেশ পিছল। ক'দিন আগের বৃষ্টিতে শ্যাওলা গজিয়ে গেছে। পাথর টপকাতে-টপকাতে সাবধানে এগোচ্ছি।

—সাব, কিধর যাবেন?

কচি গলার শব্দে থমকে দাঁড়িয়েছি। ওদিকের বিরাট পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা বাচ্চা ছেলে, বয়স বড়জোর নয় কি দশ। পরনে শুধু মাত্র একটা নেংটি, গায়ের রং কুচকুচে কালো হাতে একটা কঞ্চি, টুলটুলে মুখখানায় আগাগোড়া সরলতা।

বড়-বড় চোখে মেলে সে আবার বলে ওঠে, আপলোগ কি সানটিসবাবুর ওখানে যাবেন?

সানটিসবাবু! ছেলেটা কি ডক্টর দুবের কথা বলছে? জগুমামার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—তুই বাবুকে চিনতিস! কী নাম বল তো বাবুর?

ফিক করে হাসল ছেলেটা বলল,—পুরা নাম তো জানে না। হামি সিরেফ দুবেচাচা বলতাম। উনি হামাকে পেয়ার ভি করতেন। বলতেন বুধন তুকে হামি শহর লিয়ে যাব, পড়ালিখা শিখাইব।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ বাবু। লেকিন কী যে হল চাচার, ছে-সাতদিন আসছেন না। আপলোগ কুছু জানেন বাবু?

মামা এগিয়ে গিয়ে বুধনের পিঠে হাত রাখলেন। স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন,—আমরা দুবের দোস্ত, আমিও সানটিস। আমাদের একটু নিয়ে চল না তোর দুবে চাচার জায়গায়।

—চলুন।

খুব ঘন জঙ্গল। এত নিবিড়ভাবে শাল-শিমুল-সেগুনরা দাঁড়িয়ে আছে, সূর্যালোক ঢুকতে পারছে না।

বুধনকে মামার বেশ ভালো লেগে গেছে। আসলে ওর মুখখানায় এমন এক পবিত্রতা মাখানো, দেখলে, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

বুধনের কাঁধ ধরে এগোতে এগোতে মামা জিগ্যেস করলেন,—হ্যাঁ রে বুধন, তোরা থাকিস কোথায়?

হুই ঝোরার উধারে হামাদের ছোটি গাঁও আছে।—বুধন পিছন দিকে দেখাল, উখানে হামাদের ঝোপড়ি আছে। সেখানে হামি, হামার ছোটা দো ভাই-বহিন, মা বাপ থাকি। বাপ হামার লকড়ি কাটে জঙ্গলে, ঠিকাদারের কাছে। আভি সব বন্ধ। দো দিনসে হামাদের গাঁওয়ের কেউ কামে যাচ্ছে না। এদিকে বাপ আটা লিবে, রুপেয়া নাহি। ভাই বহিন ইত্তো ছোট, ভুখসে খালি কাঁদছে। বড়া নাবুঝ।

—কাজে যাচ্ছে না! কেন রে?

—জঙ্গলে ভূতপেরত ঘুসেছে। হামার এক গাঁওবালা চাচা দোদিন আগে আপনা আঁখসে দেখেছে। ইতো ডর লেগেছে, উসদিনসে, বুখারে বেহোঁশ। উলটপালট বকছে, কী যে দিখেছে, উ ভি মালুম হল না। ওঝাবুড্ডাকে খবর করা হয়েছে। মন্তর দিয়ে ভূত তাড়াইবে, তবে আদমিরা কামে যাবে।

আমরা ঢুকে পড়েছি বনের অনেকটা ভিতরে। পট্টনায়েক বললেন,—এইটাই তোর দুবেচাচার জায়গা, না রে বুধন?

—হ্যাঁ। ইখানেই লম্বা লম্বা লকড়ি গিথে নাপজোক করতেন দুবেচাচা।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি, বনের এই জায়গাটা বেশ ফাঁকা। গাছগুলো ছোট ছোট, অনেক ছাড়া ছাড়া।

জগুমামা স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্য করে দেখলাম, তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি বনের সর্বত্র ঘুরছে। কীসের ইঙ্গিত খুঁজছেন উনি?

হঠাৎ জগুমামা এগিয়ে গেলেন সামনের শালগাছটার দিকে। আমার চোখে পড়ল, গাছটার ঠিক সামনে চওড়া গভীর গর্ত।

—বুধন, তোর দুবেচাচা গর্ত খুঁড়েছেন?

উঁ—হু! ইতো চওড়া নয়। উনি গর্ত খুদতেন সরু কঞ্চি ঘুসাইবার জন্যে। কতবার হামিই খুদে দিয়েছি।

মামা ভ্রু কুঁচকে বললেন,—মানে? এই ক'দিনে আর কাউকে দেখেছিস এখানে?

—হাঁ বাবু। তিন-চার রোজ পহেলে সবেরে একজন বাবু ইসেছিল। কোট টাই পরা। আমি গিয়ে পুছতে ধমকি দিলেন, যা ভাগ।

—দুবে চাচা এখানে আসার আগে কাউকে এখানে দেখেছিস কোনওদিন?

বুধন একটু ভাবল। তারপর ঠোঁট উলটে বলল,—না ওইসা কিসিকো দেখিনি। তখন হামি হররোজ আসতাম না। মাঝেমধ্যে দুফরবেলায় পাতা কুড়াতে আসতাম। হাঁ-হাঁ...

হঠাৎ বুধনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—ইয়াদ পড়েছে। ছে-সাত মাহিনা পহেলে একদিন দুফরে ইখানে হামি কাগজের টুকরা, পেলাস্টিক ইসব দেখে ছিলাম। কোই-না-কোই আদমি জরুর এসেছিল। জুতোর ছাপ ভি ছিল! হোবে, ফিস্টি করতে ইসেছিল।

জগুমামা স্থিরচোখে বুধনের দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন,—শোন বুধন, আমরা এখন চললাম, পরে আবার আসব। তুই শুধু খেয়াল রাখবি, কেউ এখানে আসে কিনা।

বলতে-বলতে মামা পকেট থেকে দশটাকার একটা নোট বের করে ওর হাতে জোর করে গুজে দিলেন, —নে রে, ধর এটা।...আরে বোকা ছেলে, আমিও তোর চাচা। ধর-ধর, চাচার কাছে লজ্জা কীসের? ভাইবোনকে মিঠাই কিনে দিস। কেমন?

ফিরতি পথে একটু এগিয়ে এসেছি, হঠাৎ পিছন থেকে বুধনের গলা,—চাচা-চাচা! থোড়া ঠারিয়ে।

বুধন হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—দুবেচাচার এই রুমালটা হামার কাছে ছিল। হাপনি দিয়ে দেবেন।

রুমালটা বেশ বড়। একদিকে আবার দুবের নামের আদ্যক্ষর এমব্রয়ডারি করা। পি ডি।

মামা বললেন,—দুবে তোকে দিয়েছিল। তোর কাছেই থাক।

—না বাবু। চাচা দেয়নি। এটা হামি চাচার জায়গায় কুড়িয়ে পেয়েছি। উনার পকেটসে শায়দ গিরে পড়েছিল।

পট্টনায়েক চালকের আসনে বসেছেন। জিপ স্টার্ট দিয়ে বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, এনিথিং পজিটিভ?

জগুমামা মৃদুস্বরে বললেন,—মনে হচ্ছে একটা আলো দেখতে পাচ্ছি।

দুপাশের নিবিড় জঙ্গল ছাড়িয়ে আমার মন তখন উধাও হয়ে গেছে অন্যখানে। বুধনের কাছে। ওরা কী গরিব, অশিক্ষিত! কিন্তু কী পবিত্র! চিরকালই কি ওরা পড়ে থাকবে এমন অন্ধকারে?

৫

বেলা দুটো বেজে গেছে। মামা বললেন, লাঞ্চ ঘরেই পাঠিয়ে দিতে।

গিজারের উষ্ণ জলে স্নান করতেই পেটে হাজারটা ইঁদুর ডন মারতে শুরু করেছে। ওদেরই বা দোষ কি, সকালে টোস্ট-ওমলেটের পর থেকে পেটে কিছু পড়েনি।

খেতে বসে মামাকে জিগ্যেস করলাম,—কী আলো দেখতে পেলে মামা?

হুঁ।—ছোট্ট উত্তর। আমার কথাগুলো কানে ঢুকেছে বলে মনেই হল না। যান্ত্রিকভাবে খেয়ে চলেছেন। চোখ দেখেই বোঝা যায় মন রয়েছে অন্য কোনওখানে।

ফের বললাম,—কৃষ্ণকান্ত লোকটা বেশ সন্দেহজনক, তাই না?

—হুঁ।

ধ্যুস! এমনভাবে কথা এগোয়। রাগ হল খুব। তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে শরীর টান করে ফেললাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, হুঁশ নেই। চোখ খুলতে বাইরে রঙিন বিকেল। কিন্তু মামা কই? আমি একা।

দুড়দাড় করে ছুটলাম নীচে।

ম্যানেজার বললেন, তিনটে নাগাদ মামা বেরিয়ে গেছেন। তাঁকে বলে গেছেন, আমি যেন চিন্তা না করি।

যাক, স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল।

কফির সঙ্গে-সঙ্গে তারিয়ে তারিয়ে 'গোবি পাকোড়া' খাচ্ছি, দরজা খুলে ঢুকলেন জগুমামা।

মামার মুড এখন অন্যরকম। মামার মধ্যে যে থমথমে ভাব ছিল, নেই। বন্ধুর মৃত্যুশোক তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছেন।

—কী রে ভাগ্নে একা-একা খুব কফি খাচ্ছিস? বলতে-বলতে সোজা টান হয়ে পড়লেন বিছানায়।

আমার খুবই রাগ হয়েছে। কোনও কথার জবাব দেব না! এখন অবার রাগ ভাঙাবার কায়দা! গম্ভীরভাবে আমি কফি খেতে লাগলাম।

—আরে, অদ্ভুত! তুই কি বোকা নাকি? রেগে আছিস কেন? বুঝে দ্যাখ টুকলু, কোনও কিছু সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে বলা কি উচিত? তুই-ই বল। চল ওঠ। দুজনে একটু রাঁচি শহর চক্কর মেরে আসি।

—কোথায় যাবে?

—অনন্ত সরখেলের দোকানে। ট্রেনে বারবার বলে ছিল, একবার অন্তত যেতে। গেলে খুব খুশি হবে।

—তুমি দুপুরে একা গেছিলে কোথায়?

—পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। আগেই যাওয়ার কথা ছিল। ওখানে দুবের পার্সোনাল জিনিসপত্র, গবেষণার নোটবুক আর দুর্ঘটনার পর তার শরীর থেকে যা যা পাওয়া গেছে সেসব একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে এলাম।

—কোনও ক্লু পেলে?

—একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েছি। পরে বলব।

অনন্তবাবু পাশের রেডিয়ো-টিভির দোকানে বসেছিলেন। স্টিরিয়োতে বাজছিল গুলাম আলির বিখ্যাত গজল, 'ক্যায়া করু সজনী, আয়ে না বালম...'

আমারই প্রথম চোখে পড়েছে অনন্ত সরখেলকে। চক্ষু বুঁজে ঢুলে বসে প্রবলবেগে মাথা দোলাচ্ছিল আর 'বা:-বা: 'তোফা ইত্যাদি শব্দ ছাড়ছিলেন। ভয় হচ্ছিল ভদ্রলোক আচমকা ব্যালান্স হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে না পড়েন।

কাছে গিয়ে 'অনন্তবাবু' বলে ডাকতে গভীর বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে বাঁ-চোখের কোণ খুললেন। তার পরেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন,—আরে ছিছি, স্যার! আমার কী সৌভাগ্য! হেঁ-হেঁ স্যার, খদ্দেরপাতি নেই তো...বড় ভালো গায় ছোকরা...সন্ধেবেলা কী করি তাই স্যার...চলুন স্যার...চলুন...।

অনর্গল বকে যাচ্ছেন অনন্তবাবু। মামা সত্যি-সত্যিই এসেছেন, ভদ্রলোক তাইতে খুশিতে দিশেহারা! ছোট্ট একচিলতে দোকান। তার মধ্যে ফ্রক, জামা, প্যান্ট ভরতি। আমাদেরকে বসিয়ে নিজে সামনে প্রায় জোড়হাতে দাঁড়িয়ে।

—কী খাবেন স্যার? নোনতা না মিষ্টি?

—কিচ্ছু না। বিকেলে খেয়ে বেরিয়েছি। শুধু এক কাপ চা।

—না না স্যার! তা কি হয়?

অনন্তবাবু ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন এবং আমি ওঁর দশ বাই দশ দোকানের মালপত্র পুরোপুরি দেখে ওঠার আগেই হাঁফাতে-হাঁফাতে ফিরলেন। পিছন পিছন একটা ছেলে, হাতে চায়ের ট্রে। অনন্ত সরখেলের হাতে বড় সাইজের একটা ঠোঙা।

এক কোণে রাখা প্লেট ধুয়ে তাতে রাখলেন ঠোঙার ভেতরের তিনটে পেল্লায় আকারের ফিশফ্রাই।

যথেষ্ট লোভনীয়। আড়চোখে জগুমামার দিকে দেখলাম, তাঁর চোখ বাইরের রাস্তায়।

—স্যার, আপনার চা যে জুড়িয়ে গেল!

চুমুক দিয়ে মামা বললেন,—আপনাদের এ জায়গাটা রাঁচির সবচেয়ে ব্যস্ত এলাকা, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। সারাদিনই ট্যাক্সি, অটো, বাসের হর্ন আর লোকের হট্টগোল।

—আপনার রেডিমেড পোশাকের ব্যাবসা ভালোই চলে?

—হ্যাঁ স্যার। একা লোক। যা হয়, দু-বেলা চলে যায়। অ্যাকচুয়ালি দোকানটা করেছিলেন আমার মা-র বাবা, দাদামশাই। বাবা-মা, ভাইবোনেরা কলকাতায় থাকলেও ছেলেবেলা থেকে আমি এখানে, দাদুর কাছে।

—ওটা কীসের দোকান?

মামার ঘাড়ের ওপর দিয়ে আমারও চোখ চলে গেছে রাস্তার ওপারে নিয়ন লাইটে সাজানো জ্বলজ্বল করছে SCITECHCO। বেশ বড় দোকান।

—ওটা স্যার প্রবীরবাবুর দোকান। বেশ নামকরা। সেই যে স্যার, কলকাতা থেকে আসার সময় ট্রেনে—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ! বা:, দোকানের দারুণ নাম দিয়েছেন প্রবীরবাবু! সায়েন্সের 'সাই' টেকনোলজির 'টেক' কোম্পানির 'কো'।

—কী বলব স্যার, বড়জোরে তিন বছরের মধ্যে দোকানটা দেখতে দেখতে চড়চড় করে উঠে গেল। এখানকার একচেটিয়া সাপ্লায়ার। স্কুল-কলেজের মাস্টার—প্রফেসররা হরদম ঢুকছেন। অবাঙালিদের ব্রেনটাই আলাদা জাতের।

—হুঁ। টুকলু যাবার সময় ওখান থেকেও আমরা একবার ঘুরে যাব। প্রবীরবাবু খুশিই হবেন।

নিশ্চয়ই।—ভদ্রলোককে আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। যেমন স্মার্ট, তেমনি হ্যান্ডসাম। হাজার হোক, কোন স্কুল থেকে পাস করেছে! তবে ওঁর স্ত্রী সেদিন ট্রেনে সারাটা রাত—উফ!

আগাগোড়া মোজেইক করা ঝকঝকে মেঝে। কাউন্টারে কাস্টমারের ভিড়। একধারে একজন সুবেশা মহিলা টাইপ করছেন। আমাদের দেখে সুরেলা গলায় বললেন,—ইয়েস, প্লিজ ?

ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন মামা। আমি ভালোভাবে দোকানটা দেখে চলেছি। কাউন্টারের চারপাশ জুড়ে নানান সরঞ্জাম ছড়ানো-ছিটোনো। ডজনখানেক টিউবলাইটের চোখ ঝলসানো আলোয় দিনের মতো পরিষ্কার। কলকাতাতেও এমন টিপটপ সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লায়েন্সের দোকান খুব বেশি দেখিনি।

আধমিনিটের মধ্যেই চেম্বার থেকে শশব্যস্তে যে সুদর্শন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, তাঁকে আমরা অবশ্যই চিনি।

প্রবীরবাবুর মুখে আন্তরিকতার হাসি,—আসুন, আসুন, ডক্টর মুখার্জি। হ্যাল্লো টুকলু, কেমন আছ?

নরম কাউচে বসে মামা বললেন,—ঘুরতে-ঘুরতে এদিকে এসেছিলাম, হঠাৎ রাস্তা থেকে আপনার শো-রুম চোখে পড়ল। তারপর এর মালিকের নাম জেনে কপাল ঠুকে ঢুকে পড়েছি। ভয় ছিল, যদি চিনতে না পারেন!

কী যে বলেন!—স্টিল ফ্রেমের চশমা খুলে টেবিলে নামিয়ে রেখে প্রবীরবাবু বললেন, আপনারা এসেছেন, সত্যি খুব খুশি হয়েছি। কী খাবেন বলুন? কফি, না কোল্ড ড্রিংকস?

—একদম না। এইমাত্র অনন্তবাবু, মানে আমাদের ট্রেনের ওই ভদ্রলোক, তার সঙ্গে দেখা। জোর করে চায়ের সঙ্গে এটা-সেটা খাইয়ে দিল। একটা কথা, আপনার দোকানের নামটা ভারী চমৎকার হয়েছে।

থ্যাঙ্কিউ স্যর।—প্রবীরবাবু খুশির গলায় বললেন, তবে নামটার জন্যে ক্রেডিট আমার বন্ধুর। ফরেনে সেটলড। বছরতিনেক আগে দোকানটা যখন তৈরি হচ্ছে, সেই সময়েই দেশে এসেছিল। নামটা তারই দেওয়া...আপনাদের কিছু খেতেই হবে। প্রথমদিন আমার অফিসে এলেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এক কাপ করে কফি।

প্রবীরবাবু বেরিয়ে গেলেন।

চেম্বার এয়ার কন্ডিশনড। মৃদু 'স-স-স' শব্দ হচ্ছে। ম্যাসোনাইট বোর্ড দিয়ে ফলস ছাদ, দেওয়াল তৈরি। হালকা নীল রং। সব মিলিয়ে দারুণ ছিমছাম। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপারে প্রবীরবাবুর রিভলবিং বিশাল চেয়ার। তার ঠিক ডানদিকে ছোট্ট টুলের ওপর নতুন একটা টেলিভিশন। নামি কোম্পানির প্লাস্টিক শিট দিয়ে ঢাকা। ওদিকের দেওয়াল জুড়ে নানান ফোটো।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ফোটোগুলোর সবক'টিতেই প্রবীরবাবু উপস্থিত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বেশিরভাগই মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে।

সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন প্রবীরবাবু। পেছনে বেয়ারা। হাতের ট্রে-তে তিন কাপ ফেনায়িত কফি, সঙ্গে এক প্লেট স্ন্যাকস বিস্কুট।

চশমা পরতে-পরতে প্রবীরবাবু বললেন,—টুকলু, দুদিন তো থাকলে। রাঁচির কোথায় কোথায় ঘুরলে বলো? কাঁকের পাগলা গারদ দেখেছ?

—না মশাই। আমি নিজে একবারই মাত্র গেছিলাম। খুব শকড হয়েছিলাম। ভাগ্নেকে নিয়ে আর যাব না।

—কেন বলুন তো?

—মানুষের আসল বস্তুটিই হল তার মগজ। তার যখন বারোটা বেজে যায়, তখনই মানুষ হয় পাগল। ফলে তখন একজন মানুষের সঙ্গে একজন পশুর কোনও তফাত থাকে না।

—হুঁ। তা হলে ওকে নিয়ে কোথায় কোথায় গেলেন?

—যাইনি, কাল থেকে যাব। টেগোর হিলস, হুড্রু, জোনা, দশম ফলস। সময় পেলে ভাবছি ওকে একবার নেতার হাটও ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। ভালো লাগবে।

—হ্যাঁ, ঘুরে আসুন। ভারী সুন্দর। তারপর আপনারা ফিরছেন কবে? এবার কি শুধুই বেড়ালেন, না নতুন কিছু রিসার্চ করলেন?

জগুমামা একটু হাসলেন,—বাংলায় একটা কথা আছে 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' আমার অবস্থা তাই। ওসব ছাড়ুন। আপনার ব্যাবসাপত্র কেমন চলছে?

আপনাদের আশীর্বাদে খারাপ না স্যর।—প্রবীরবাবু বললেন, সামনের বছর ইচ্ছে আছে আর একটা ইলেকট্রনিক্স-এর দোকান দেবার। খুব ডিম্যান্ড।

—খুব ভালো। চালিয়ে যান। ইয়ংম্যানদের উন্নতি করতে দেখলেও ভালো লাগে।

রাত মন্দ হয়নি। প্রায় সাড়ে ন'টা। উঠে পড়লাম আমরা। হোটেলের দিকে হাঁটছি দুজনে।

—মনে হচ্ছে, কালকের দিনটা ফাঁকা, কোথায় যাবি, বল?

—যেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু পরশু? কী হবে?

—আরে! পরশুই তো আমাদের অপারেশন। তুই যাবি তো?

—মানে? আমি যাব না? হুঁ—! কিন্তু কোথায়?

কাটা হাতের খোঁজে রাঁচির জঙ্গলে।—নাটকীয় ভাবে মামা বললেন, 'অপারেশন হুড্রু'। একটা জায়গাতেই একটু অনিশ্চয়তা আছে। সেটা হল আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস। ওরা বলছে পরশু, কি তার পরদিন

আবার বৃষ্টি আসছে। একটা নিম্নচাপ হয়েছে বে অফ বেঙ্গলে।

—তার সঙ্গে অপারেশনের সম্পর্ক কী?

—দ্যাখ না। গেলেই বুঝবি।

৬

টপ...টপ...টপ...টপ।

এবার বৃষ্টির বড়-বড় ফোঁটা শুরু হয়েছে। গাড়ির হুডের দিকে তাকালাম। সারা শরীর কেন জানি না, শিউরে উঠল।

রহস্যের অন্তিমপর্ব শুরু হয়ে গেছে। স্টেশন ওয়াগন এগিয়ে চলেছে হুড্রুর দিকে। অপারেশন হুড্রু।

আজ বিকেলেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। শীতের বেলা তার ওপর সারাদিনই ছিল মেঘলা মেঘলা। বেলা তিনটের পর থেকে আকাশের উত্তর-পশ্চিমে কালো মেঘেরা যেভাবে জড়ো হচ্ছিল, তাতে বুঝেছিলাম আজ অন্তত আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস মিলে যাবে।

সন্ধে ছ'টায় এই ভ্যানে যখন উঠে বসি, তখন সবে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চাপা লাল আভা ফুটে বেরোচ্ছে।

হেডকোয়ার্টাসে বলা আছে রাত ন'টা নাগাদ দু-ব্যাটেলিয়ন আর্মড ফোর্স রওনা হয়ে যাবে হুড্রুর দিকে। আর জরুরি যোগাযোগের জন্যে আমাদের ভ্যানে রয়েছে ওয়ারলেস সেট।

রেনকোটে আমাদের আপাদমস্তক ঢাকা, ভ্যানের সমস্ত কাচ তোলা, চালক পাণ্ডেজির দিকেরটা সামান্য খোলা। বাতাস চলাচলের জন্যে। ওই ফাঁকটুকু দিয়েই কনকনে ঠান্ডা বিঁধছে।

ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে আমাদের ভ্যান। শেষ লোকালয় ফেলে এসেছি একটু আগে। এখন কোথাও আলোর চিহ্ন নেই, যেদিকে তাকাই, অন্ধকারের অথৈ সমুদ্র। তারই মধ্যে শুধু জোরালো দুটো হেডলাইট জ্বলছে।

ঝম...ঝম...ঝম...মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে. ভ্যানের সর্বাঙ্গে অবিশ্রান্ত বাজনা। শেষ হয়ে গেল চওড়া সড়ক। এবার সরু পথ, গভীর জঙ্গল চিরে হুড্রুর পথে।

—টুকলু, ভয় করছে নাকি রে?

—নাহ।

জানি না, সত্যি বললাম কিনা। ঠিক এইমুহূর্তে আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে শিহরণ, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, বিচিত্র সব অনুভূতি...।

—ঠিক ভয় কীসের? অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার নেশায় কত মানুষ যুগ-যুগ ধরে বেরিয়ে পড়েছেন ঘর ছেড়ে। কিংবা ভাব আমাদের দেশের সেই সব দুরন্ত ছেলেদের কথা, স্বাধীনতা আনতে যারা হাসতে-হাসতে ফাঁসিতে ঝুলেছে, নির্ভয়ে বুক পেতে দিয়েছে ইংরেজের বেয়নেটের সামনে।

—ঠিক বলেছ মামা।

পট্টনায়েক বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, আজই কিছু ঘটবে কি?

—হ্যাঁ।

—যদি কিছু না ঘটে?

—বুঝব, অপরাধীরা আগেই অ্যালার্ট হয়ে গেছে। তখন অন্যভাবে ফাঁদ পাততে হবে।

ভিতরে আবার নীরবতা।

বাইরে অন্ধকারে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে, নীলচে আলোয় ঝলসে উঠছে বাইরের উথালপাথাল শালবন।

একটানা চলেও ওয়াইপার পাল্লা দিতে পারছে না তুমুল বৃষ্টির সঙ্গে! ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে উইন্ডস্ক্রিন। হেডলাইটের জোরালো ফোকাসও ধোঁয়াটে। ভ্যানের গতি আরও কমিয়ে দিলেন পাণ্ডে।

টুকলু, রোবসনের ওই গানটা কর না।

—গান!

—হ্যাঁ, 'উই শ্যাল ওভার কাম'—এর বাংলা। এই সময়েরই তো গান ওটা।

গলাটা কি একটু কেঁপে যাচ্ছে?

'আমরা করব জয়...আমরা করব জয় নিশ্চয়—

বুকে গভীর আছে প্রত্যয়

আমরা করব জয় নিশ্চয়।

আমাদের নেই ভয়, আমাদের নেই—'

থপ...থপ...থপ...। কিছু একটা এসে পড়েছে গাড়ির চালের উপর।

শ-শ—চুপ চুপ। সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

পট্টনায়েক, রেডি।—মামার গলা কি কেঁপে গেল?

খস...খস...খস! কিছু এগোচ্ছে চাল বেয়ে...

ওই, ওই তো! চাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে উইন্ডস্ক্রিনের গায়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে দু-দুটো পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো জ্বলে উঠল।

অসহ্য আতঙ্কে প্রায় ছিটকে উঠলাম সিট থেকে। এ-এ কী দেখছি? অবিশ্বাস্য! অসম্ভব!

মানুষের একখানা হাত। কনুইয়ের অর্ধেক থেকে কাটা। কিন্তু জীবন্ত! সাপের মতো কিলবিল করে খেলা করছে আঙুলগুলো, উইন্ডস্ক্রিনের গায়ে। উ:, কী ভয়ঙ্কর!

হাতটা এগোতে শুরু করে দিয়েছে...

—স্টার্ট পট্টনায়েক, স্টপ পাণ্ডে!

সঙ্গে-সঙ্গে একটা সুইচ টেপার শব্দ পেলাম। দেখলাম, সামনের উইন্ডস্ক্রিনটা উঠে গেছে কাত হয়ে। হাতটা তখনও তার গায়ে। সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ির বনেটের ভেতর থেকে উঠে এল দ্বিতীয় উইন্ডস্ক্রিন। ওয়াইপারসুদ্ধ।

পরে জেনেছি, জগুমামার নির্দেশে রাতারাতি মিস্ত্রি দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল আমাদের গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন।

কাত হয়ে উঠে থাকা প্রথম উইন্ডস্ক্রিনে চোখ পড়তেই শিউড়ে উঠেছি। কাটা হাতটা ইতিমধ্যে বজ্রমুঠিতে চেপে ধরেছে ওয়াইপার দুটোকে, দুমড়ে-মুচড়ে শেষ করে দিচ্ছে।

গাড়ি থেমে গেছে। লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন মামা আর পট্টনায়েক। পেছনে আমি। কোথায় সে?

দু-দুটো টর্চের আলো ঘুরতে-ঘুরতে স্থির হয়ে গেল। সেই আলোয় দেখা গেল, হাতটা ধীরে-ধীরে গাড়িয়ে পড়ল ভ্যানের গা থেকে।

তারপর...তারপর ভয়বিহ্বল চোখে দেখছি, কাদাজমিতে 'সড়াৎ-সড়াৎ' করে ঘষটে-ঘষটে হাতটা এগোচ্ছে জঙ্গলের দিকে।

একমুহূর্ত ভাবলেন জগুমামা। তারপরেই চাপা গলায় বললেন,—পাণ্ডে, পাণ্ডে! আপনি ভ্যান নিয়ে হুড্রুর পাশের ওই জঙ্গলে চলে যান। যে-কোনও অবস্থার জন্যে তৈরি থাকবেন।...

বলতে-বলতে চলমান হাত-এর পিছন-পিছন ছুটলেন মামা, হাতে জ্বলন্ত টর্চ। পিছনে আমরা।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে চলেছে। খ্যাপা বাতাপ বইছে। পিছল কাদায় টলমল করতে-করতে আমরা ছুটে যাচ্ছি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। আর কতদূর?

সামনে সড়াৎ-সড়াৎ করে এগিয়ে চলেছে এক দু:স্বপ্ন জীবন্ত হাত!

জঙ্গল ঘন হচ্ছে, আরও জড়াজড়ি কালো ছায়ার মতো গাছেরা...

বিপ বিপ বিপ!

মৃদু আওয়াজ।

পলকে দু-দুটো পিস্তল উঠে এল মামাদের হাতে।

হাত এগিয়েই চলেছে, শব্দটা আরও স্পষ্ট হচ্ছে—

আরে! সাদা ছোট্ট তাঁবু!...

হাতটা এগোচ্ছে তাঁবুর দিকে...ও কী? ওটা যে সাঁৎ করে ঢুকে গেল তাঁবুর মধ্যে! শব্দটাও সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল।

হতভম্ব হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছি। ভিতরে ঢোকা হবে? মামা কান পাতলেন তাঁবুর গায়ে। না:, কোথাও শব্দ নেই। নিথর নি:শব্দ অরণ্যরাজ্য। বৃষ্টি থেমে গেছে। গাছের পাতা থেকে শুধু জল ঝরার শব্দ।

কয়েক মুহূর্ত! উদ্যত পিস্তল হাতে মামা ঢুকে পড়লেন তাঁবুর মধ্যে!

কোথায় কী? ভিতের কোনও মানুষ নেই।

ওটা কী? একটা যন্ত্র না? ঢাউস টেলিভিশনের মতো দেখতে। দু-দুটো কাচের স্ক্রিনে রঙিন আলোর আঁকিবুকি চলছে। ওই—ওই যে জমির উপর নিস্পন্দের মতো পড়ে রয়েছে সেই হাত।

মামা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলেন অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রটার কাছে। তার সারা গায়ে অজস্র 'নব' আর 'বোতাম'।

জগুমামা কয়েক সেকেন্ড দেখলেন। তারপরেই হঠাৎ কাটা হাতটাকে দুহাতে তুলে বেরিয়ে এলেন।

হাতটা নিশ্চল, কিন্তু জীবন্ত! কাঁপছে থিরথির করে। আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল।

—পট্টনায়েক, লাইটার জ্বালান।

—লাইটারের আগুনে হাতটাকে ধরতেই ইস-স। কী মাংস পোড়া গন্ধ। হাতের চামড়া কুঁচকে কালো হয়ে যাচ্ছে!

কোর্টের পকেট থেকে মামা আবার একটা ছুরি বের করেছেন। খচখচ করে কসাইয়ের মতো পোঁচ মারছেন হাতটার বুড়ো আঙুলে। রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে। মামা কী করতে চান?

আবার বিপ....বিপ। যন্ত্রটা কি সচল হয়ে উঠল?

পরক্ষণে মামার আর্তনাদ—আ:।

মামা কাত হয়ে পড়েছেন কাদা জমিতে। কী হল? মামার গালে রক্তাক্ত চার আঙুলের ছাপ। সপাটে থাপ্পড় মেরেছে হাতটা!

চেঁচিয়ে উঠলেন জগুমামা,—ধর, ধর! ধরুন!

প্রাণপণে ছুটলেন হাতটার পিছনে—ওই তো! তীব্রবেগে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কোন অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে হাতটার মধ্যে, দূরন্ত বেগে ছুটেছে। আমরা পিছিয়ে পড়ছি...

পিছনে মামার গলা,—ধরুন, ধরুন, ওটাকে!

যা-যা:! অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরমুহূর্তে আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ঢালু জলাজমিতে। বৃষ্টির জলে তৈরি হয়েছে ছোটখাটো ডোবা।

কোনওক্রমে সামলে নিয়েই মামা উঠে দাঁড়িয়েছেন,—পট্টনায়েক! চলুন, চলুন, তাঁবুর দিকে।

টালমাটাল পায়ে আবার ছুটছি। তাঁবুটা কোন দিকে?

বুম-বুম! বিস্ফোরণের কানফাটা শব্দে শিউরে দাঁড়ালাম।

একটু দূরেই তাঁবুটা সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। বিস্ফোরণের এমনই তেজ, আশপাশের গাছগুলোতেও উড়ছে আগুনের ফুলকি। উফ! আরেকটু হলে, একটুর জন্যে বেঁচে গেছি!

জগুমামা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। বিড়বিড় করছেন, ইস, হাতের কাছে এসেও ফস্কে গেল!

একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ। পাণ্ডে কি ফিরলেন?

মামা বিড়বিড় করে যাচ্ছেন,—আমি একটা...ইডিয়ট! গাধা!—যদি তখন হাতটাকে নিয়েই পালিয়ে আসতাম!

ডক্টর মুখার্জি! পট্টনায়েক স্যর! —দূর থেকে পাণ্ডের গলা ভেসে এল। পান্ডে কি কোনও বিপদে পড়েছেন?

হ্যাঁ, পাণ্ডে।—মামা উঠে দাঁড়িয়েছেন, যাচ্ছি, যাচ্ছি।

একটু এগোতেই পাণ্ডের সঙ্গে দেখা। উনিও এদিকে আসছিলেন।

পাণ্ডে উত্তেজনায় রীতিমতো হাপাচ্ছেন। থেমে থেমে বললেন,—সাংঘাতিক ব্যাপার।

—ধরতে পেরেছেন কাউকে?

—ধরব কী, বুঝে উঠতেই পারলাম না। তার আগেই সব ভোঁ-ভাঁ।

—ও মাই গড, আপনিও পারলেন না।

আরে, সবটা শুনুন আগে।—একটু দম নিয়ে পাণ্ডে বললেন, আমি আপনার কথামতো হুড্রুর কাছে পৌঁছে নীচে নামতে শুরু করলাম। একটু নামতেই দেখি একটা আলো। ভীষণ উজ্জ্বল, পশ্চিমের জঙ্গল থেকে বেরোচ্ছে। আরও কয়েক ধাপ নামতে আমি থ! দুবের এক্সপেরিমেন্টের জায়গা! ওখানেই জ্বলছে বিরাট বৈদ্যুতিক আলোটা। সে আলোয় সব দিনের মতো ফটফটে। কয়েকজন মানুষ কী সব যন্ত্র হাতে নিয়ে সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। পিস্তলটা বাগিয়ে যেই দৌড়োতে যাব, অমনি দপ করে আলোটা নিবে গেল।

—তারপর?

—আলো নেভার সঙ্গে-সঙ্গে চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল। কয়লার মতো অন্ধকার। শুধু কয়েকটা ইংরেজি শব্দ কানে ভেসে এল। অন্ধকারটা আরেকটু সইয়ে নিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তা ছাড়া উপায়ও নেই। কারণ আমার কাছে টর্চ নেই। আলো ছাড়া পিস্তল অকেজো। এরই মধ্যে শুনতে পেলাম ঘড়ঘড় একটা শব্দ।

—হেলিকপ্টার।

—হেলিকপ্টার? জঙ্গলে, কাদামাটিতে?

—হ্যাঁ। বিশেষভাবে তৈরি। সর্বত্র ওঠানামা করতে পারে। তাতে চেপেই বোধহয় শয়তানগুলো উড়ে পালিয়ে গেল। হ্যাঁ, তারপর?

—কী করব? ভেবে দেখলাম, যদি ওখানে আর ওদের লোকজন থেকেও থাকে, তাদের সঙ্গে আমি একা, কোনও এনকাউন্টারে যাওয়া ঠিক হবে না। অতএব ভ্যানে করে—

গুড়ুম! গুড়ুম! রাস্তা থেকে পরপর দুটো গুলির আওয়াজ।

ছুটে জঙ্গলের বাইরে এসে যখন দাঁড়ালাম, ইঞ্জিনের শব্দ তখন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পাণ্ডে কপালে করাঘাত করলেন,—সর্বনাশ! দুটো টায়ারই শেষ করে দিয়েছে।

স্টেপনি টায়ার একটাই থাকে। তবে কি আজ সারাটা রাত এই জঙ্গলে কাটাতে হবে?

জগুমামার উপস্থিতি বুদ্ধি যে কতটা বেশি সেটা আরেকবার প্রমাণিত হল। বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে উঠে মামা সবার আগে ছুটে গেলেন ভ্যানের দিকে,—পাণ্ডে ওয়্যারলেস সেটটা ঠিক আছে তো?

একটু পরেই আমাদের কানে এসে পৌঁছোল কয়েকটা টুকরো-টুকরো শব্দ,—ইয়েস... এখুনি...ওভার...পুরো সার্চ করবেন...ওভার...রওনা হয়ে গেছে...আধঘণ্টা? ওকে ওভার!

৭

কাল রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। হোটেলের বিছানায় যখন এসে শরীর ফেলেছিলাম, তখন রাত দুটো বেজে গেছে। চোখ বুঁজতেই 'হরর মুভি'-র মতো দৃশ্যগুলো ঘুরে বেরিয়েছে। শুয়ে শুয়েই শিউরে উঠেছি।

জঙ্গলে আমাদের বেশিক্ষণ থাকতে হয়নি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই একাধিক জিপসহ পুলিশের আর্মড ফোর্স এসে পড়েছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও অন্ধকারে ঢাকা। জগুমামা একেবারে বোবা হয়ে গেছেন। আর মুখের যা চেহারা, তার বর্ণনা দেওয়া যাবে না। আগ বাড়িয়ে জিগ্যেস করার সাহস হয়নি।

এখনও মাথার মধ্যে বারবার ফিরে আসছে কালকের ভয়ংকর রাত। এই ফুটফুটে সকালের আলোয় ওটা স্রেফ একটা দু:স্বপ্নই হতে পারত। এবং তা হলেই বোধহয় খুশি হতাম। শুধু ওই কাটা বুড়ো আঙুলটা। টেবিলের উপর ফরম্যালিন-এ ডোবানো, ওই আঙুলটা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, ঘটনাটা সত্যি।

টুং—টুং—টুং

দরজা খুলে দিলাম। পাণ্ডে আর পট্টনায়েক মামা বিছানায় উঠে বসলেন।

পাণ্ডে সোচ্ছ্বাসে বললেন,—কনগ্রাচুলেশন ডক্টর মুখার্জি। আপনার অ্যাসাম্পশন কাঁটায়-কাঁটায় মিলে গেছে।

—ধরা পড়েছে?

—হ্যাঁ কাল ভোররাতে। শুধু তাই নয়, দোকান রেড করে প্রচুর ফরেন-গুডস, গোপন বিদেশি কনট্র্যাক্ট, চিঠিপত্র এসব উদ্ধার করা গেছে। দারুকা এখন লকআপে। জিজ্ঞাসাবাদচলছে।

দারুকা! মানে?—আমি লাফিয়ে উঠেছি।

—হ্যাঁ। প্রবীর দারুকা। তোরই স্কুলের এক্স-স্টুডেন্ট। হ্যান্ডসাম ব্রাইট ইয়ংম্যান। সে-ই এই 'হাত' রহস্যের প্রধান দিশি চর। বিদেশি নাটের গুরুরা অবিশ্যি হেলিকপ্টারে পালিয়েছে।

ঝিম মেরে বসে পড়লাম। কী বলছেন মামা?

পট্টনায়েক বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, আপনি এবার কি একটু পুরো ঘটনাটা বলবেন? মানে যদি আপত্তি না থাকে।...

হুঁ। বলছি।—জগুমামা পট্টনায়েকের বাড়িয়ে ধরা প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরালেন। ঘনঘন কয়েকটা টান দিয়ে বলতে শুরু করলেন,—

আমার জীবনে অনেকরকম অভিজ্ঞতা ঘটেছে, কিন্তু এরকম অদ্ভুতুড়ে ঘটনা যে হতে পারে, কল্পনাও করিনি। দুবের জবানবন্দি শোনার পর তাই কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। তবে একটা ব্যাপারে সিওর ছিলাম, এটা 'খুন'। চোখের ভুল বা অন্য কিছু নয়। তবে দুবের শেষ জবানবন্দি পাওয়া না গেলে তার মৃত্যু চিরকাল দুর্ঘটনাই থেকে যেত, কাজ গুছিয়ে নিত অপরাধীরা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, দুবেকে যে বা যারা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল, তাদের উদ্দেশ্য কী? দুবে কি তাদের স্বার্থসিদ্ধির পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল? এই প্রশ্নগুলোর জবাব পেলাম দুবের গবেষণার জায়গায় গিয়ে। ভূতত্ত্ববিদ না হয়েও আমার চোখে পড়ল অদ্ভুত একটা অসামঞ্জস্য। ঘন শালবনের মাঝে ঠিক ওই

জায়গাতেই শালগাছগুলো অস্বাভাবিক রকমের বেঁটে, ফাঁকা ফাঁকা। মাঝে মঝে আবার এমন কিছু গাছ জন্মেছে, যেগুলোর এই ছোটনাগপুর ফরেস্ট রেঞ্জে থাকার কথাই নয়। অর্থাৎ—

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ ঠিক ওই জায়গাটাতে মাটির সঙ্গে এমন কোনও খনিজ পর্দাথ মিশেছে যা শালগাছকে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে দিচ্ছে না। দুবে এই খনিজের আভাস পেয়ে সরকারি সহায়তায় গবেষণা করছিল। নি:সন্দেহে ওখানে দুর্লভ এবং দামি কোনও খনিজের আকর রয়েছে। তার লোভে এসেছিল অপরাধীরা। বুধনের কাছে শুনেছেন, মাস ছয়েক আগে ওই জায়গায় মানুষের আনাগোনার চিহ্ন সে দেখেছিল। ওরা সেই অপরাধীচক্র। কিন্তু পরে যখন তারা দেখল, দুবেও একই গবেষণা করতে এসেছে, বুঝল দুবেকে না সরালে তাদের বাড়া ভাতে ছাই পড়বে। সুতরাং আনা হল ওই 'হাত'। অপেক্ষায় রইল বৃষ্টির রাতের। তারপর—

একটা কথা ডক্টর। দুবে তো ওখানে প্রায়ই একা থাকতেন। তখন তো তাকে গুলি করে বা গলা টিপে খুন করা যেত?—পাণ্ডে বললেন।

—হ্যাঁ, যেত তবে তাতে গোলমাল হওয়ার সম্ভবনা ছিল। একজন বিজ্ঞানী খুন হলে সরকার চুপচাপ বসে থাকত না। তদন্ত শুরু হত। ধরা পড়ুক বা নাই পড়ুক তাতে আসল উদ্দেশ্য মাঠে মারা যেত। কিন্তু এতে কি হতে যাচ্ছিল? সাপ মরল, লাঠিও ভাঙল না। পুরো ব্যাপারটাই হয়ে যাচ্ছিল বর্ষার রাতে জিপ অ্যাকসিডেন্ট।

ডক্টর মুখার্জি 'হাত'-এর ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন। প্লিজ । ওটা কি সত্যিই জীবন্ত হাত?—পট্টনায়েক বললেন।

—হ্যাঁ, জীবন্ত। বেশ জটিল বিজ্ঞান। মানে যতটুকু আমি বুঝেছি। তবে তার আগে বরং একরাউন্ড কফি হয়ে যাক। গলা শুকিয়ে গেছে।

—নিশ্চয়ই। পট্টনায়েক ইন্টারকম তুললেন।

অনেকক্ষণ ধরে আমার একটা খটকা লাগছিল। বললাম,—আচ্ছা, মামা, কৃষ্ণকান্ত পাশোয়ান? সেদিন জঙ্গলে তার বিচ্ছিরি বিহেভিয়ার—

—ঠিক, ঠিক। ওই ঘটনাটা আমাকেও ধাঁধায় ফেলেছে।—পট্টনায়েক বললেন।

ওটা কোনও ধাঁধা নয়।—জগুমামা বললেন, এমনিতেই কৃষ্ণকান্তর মেজাজ যথেষ্ট খারাপ ছিল। থাকারই কথা। জঙ্গলে ওর ঠিকাদারির ব্যাবসা। দুদিন ধরে কোনও আদিবাসী মজুর কাঠ কাটতে রাজি হচ্ছিল না। ফলে ওর ব্যাবসার ক্ষতি হচ্ছিল। সে জন্যেই ও সেদিন চেষ্টা করছিল যদি মজুর-সর্দারকে ধমকে-ধামকে

বুঝিয়ে সুজিয়ে কাজ করানো যায়। বুধনের কাছে শুনলেন না ভূতের ভয়ে ওর বাবা-চাচারা দুদিন লকড়ি কাটছে না। ভূতটি আসলে কী জানেন? ওই 'হাত'!

—হাত?

—হ্যাঁ। 'হাত' কে তখন 'ট্রায়াল রান' দেওয়া হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে বুধনের চাচা ফিরছিল দিনের কাজ সেরে পড়বি তো পড় একেবারে তার সামনে। একে কাটা হাত, তার উপর চলন্ত! ভূতের আতঙ্কে দিশে হারা হয়ে বেচারি ছুটে গাঁয়ে ফিরে অজ্ঞান হয়ে যায়।

জগুমামা একটু থামলেন। তারপর বললেন,—যে কথা বলছিলাম, কৃষ্ণকান্ত যখন লেবারদের ধমক দিচ্ছিল, তার চোখে পড়ে আমাদেরকে। দ্যাখে, শুধু আমি নয়, সঙ্গে পুলিশের মাথাও রয়েছে। আশঙ্কা হয়, পুলিশে ছোঁবে না তো? একে মনমেজাজ খারাপ, তার উপর পুলিশি হুজ্জোতি, তা ছাড়া আমি ট্রেনে আলাপের সময় সত্যিটা গোপন করেছিলাম। এইসব ফ্যাক্টরগুলো জড় করলে সেদিন জঙ্গলে কৃষ্ণকান্তর ওরকম ব্যবহারের কারণ পরিষ্কার হয়ে যায়।

ধোঁয়া ওঠা কফি, সঙ্গে গরম পেঁয়াজি এসে গেছে।

লম্বা চুমুক দিয়ে মামা বললেন,—এবার বলি এ রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু 'হাত' প্রসঙ্গে। একটু খটোমটো। ধৈর্য ধরে শুনবেন।

পৃথিবীর জীবজগতের সবারই শরীর তৈরি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষ দিয়ে। ঠিক যেমনটি ইটের ওপর ইট গেঁথে বাড়ি তৈরি হয়। সাধারণত প্রতিটি কোষ জীবন্ত। এককে জাতের জীবের কোষ মোটামুটি একরকম আবার তাই যদি হবে, তো গাছের শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল কিংবা প্রাণীর ধড়, মাথা, হাত, পা, চোখ, কান এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কীভাবে হয়?

মজা এখানে। প্রকৃতি ঠিক করে দেয় কোন কোষগুলোর বৃদ্ধি ও বিকাশ কীভাবে হবে। এই বৃদ্ধি ও বিকাশের তফাতের জন্যেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি বা কাজকর্ম আলাদা আলাদা হয়ে যায়। এককে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্যে নির্দিষ্ট এককে জাতের কোষের সমষ্টিকে আবার বলা হয় 'টিস্যু'।

আমরা সন্মোহিতের মতো শুনছি। মামা বলে চলেছেন।

এই বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে মানুষ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে 'টিস্যু' নিয়ে নানান গবেষণা। চেষ্টা করছে জীবের শরীর থেকে তুলে এনে কৃত্রিম পরিবেশে তাকে বাঁচবার, বাড়াবার ও বিকাশ ঘটবার। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এরই নাম 'টিস্যু কালচার'।

একটু থেমে মামা বললেন,—এবার কি বুঝতে পারলেন ওই 'হাত'-এর রহস্য।

—টিস্যু কালচার।

কারেকট!—জগুমামা তারিফ করলেন, টুকলু! তোর বুদ্ধিটা ক'দিনেই খোলতাই হয়েছে!...গাছের ক্ষেত্রে এই 'টিস্যু কালচার' অনেকটাই সফল হয়েছে। শিকড়ের টিস্যুকে কালচার করে বানানো গেছে কৃত্রিম শিকড়। কিন্তু প্রাণীদের বেলায় বেধেছে ঝঞ্ঝাট। কারণ, কী জানেন? কারণ তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাধারণ বৈচিত্র্য। যেমন একটা 'হাত'। তার মধ্যেই আবার রয়েছে হাড়, মাংস, শিরা-উপশিরা এইসব নানা মালমশলা। ফলে হাতের আলাদা-আলাদা মালমশলা কালচার করা সম্ভব হলেও পুর্ণাঙ্গ কোনও প্রত্যঙ্গ তৈরি করা এখনও সম্ভব হয়নি বলেই জানতাম।

অর্থাৎ পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে খাতায়-কলমে প্রকাশিত হয়নি। গোপনে যে সম্ভব হয়েছে, তার নিদর্শন এই কাটা 'হাত'। সম্ভব করেছে এমন কোনও দেশ, যারা আমাদের চেয়ে বিজ্ঞানে বেশ কয়েক বছর এগিয়ে আছে এবং যাদের লোভের শেষ নেই। ভেবে দেখুন, বিজ্ঞানের এই অসাধারণ আবিষ্কারকে তারা লাগাল মানুষ খুনের কাজে!

একটু ডিস্টার্ব করছি ডক্টর মুখার্জি। হাতটা চলত-ফিরত কীভাবে? যতটুকু জানি, ব্রেন ছাড়া কোনও প্রত্যঙ্গ তো কাজ করতে পারে না।—পট্টনায়েক বললেন।

—এখানে ব্রেনের কাজটা করত রিমোট কনট্রোল সিস্টেম। দূর থেকে চালিত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। আমরা জঙ্গলের তাঁবুতে যে যন্ত্রটা দেখেছিলাম, সে ছিল হাতের চালক বা মগজ। ওই যন্ত্রটিকে আবার অপারেট করছিল অপরাধীরা, আরও অনেক দূর থেকে। কাল রাতে যে মুহূর্তে ওরা আঁচ করতে পারল আমরা সব জেনে ফেলতে চলেছি, সঙ্গে-সঙ্গে ওই যন্ত্রটাকে ধ্বংস করে দিল। লুকিয়ে ফেলল হাতটাকে! আগে থেকেই ওই যন্ত্রের মধ্যে বিস্ফোরক মজুত করা ছিল।

—কিন্তু মামা, হাতটা ঠিক সময়ে গাড়ির চালে এসে পড়ত কীভাবে?

হুঁ, গুড কোয়েশ্চেন।—মামা বললেন, আমি যুক্তি দিয়ে যতটুকু ব্যাখ্যা করতে পেরেছি, বলি। যদিও প্রাণশেখর দুবে ছিল অপরাধারীদের টার্গেট, সে খতম হওয়ার পরও ওরা বেশি রিস্ক নিতে চায়নি। ঠিক করে কেবল বর্ষার রাতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে। কারণ, বর্ষার রাতে মানুষজন বেরোবার চান্স কম।

তবু সাবধানের মার নেই। 'হাত' টাকে রিমোট সিস্টেম-এর সাহয্যে তারা ঝুলিয়ে রাখত রাস্তার ধারের কোনও গাছের ডালে। চালু থাকত রিমোট সিস্টেম। যন্ত্রটা এমনই, দূর থেকে কোনও ইঞ্জিনের শব্দ পেলেই তার সেন্সর-সেল সক্রিয় হয়ে উঠবে। হাতটাকে নিখুঁত সময়ের মাপে ফেলে দেবে গাড়ির চালে। বর্ষার রাতে এমনিতে গাড়ির গতি কম থাকে। অর্থাৎ যদি কেউ ঘটনাক্রমে আসেও নি:শব্দে সরে যাবে পৃথিবী থেকে। দুনিয়া জানবে দুর্ঘটনা।

কী সাংঘাতিক ব্যাপার!—পাণ্ডে এতক্ষণ বাদে কথা বললেন, কালকের ঘটনা ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

পট্টনায়েক বললেন,—এবার শেষ প্রশ্ন। প্রবীর দারুকাকে আপনি হঠাৎ সাসপেক্ট করলেন কী-কী কারণে?

—তিনটে নিশ্চিত ক্লু পেয়ে। চশমা, রুমাল আর টেলিভিশন।

মামা বললেন, স্টিলফ্রেমের চশমার একটা ভাঙা ডাঁটি অ্যাকসিডেন্টের জায়গায় কুড়িয়ে পেয়ে টুকলু আমাকে দিয়েছিল। দেখি, ডাঁটির এককোণে একটা অক্ষর এমবস করা 'ডি'। তখন ওটা দুবের চশমার ভাঙা অংশ বলে ধারণা হয়। কিন্তু পরে পুলিশ হেফাজতে দুবের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে দেখলাম, তার চশমাটা পুরোপুরি অক্ষত আছে। ওইদিন বিকেলে প্রবীর দারুকার দোকানে, সে যখন কয়েক মিনিটের জন্য কফি অর্ডার করতে গিয়েছিল, টেবিলের ওপর রেখে যাওয়া তার চশমার একটা ডাঁটি দেখি নতুন লাগানো। অন্যদিকে 'পি' এমবস করা অর্থাৎ দুর্ঘটনার রাতে অ্যাকসিডেন্টের পরে প্রবীর ওখানে গিয়েছিল। সব কাজ ঠিকঠাক হয়েছে কিনা দেখতে। সে সময়ই সম্ভবত কাদায় হোঁচট খেয়ে পড়ে তার চশমা ভাঙে এবং একটা ডাঁটি সে খুঁজে পায় না।

মামা বলে চলেন, দ্বিতীয় নিদর্শন, রুমাল। কলকাতা থেকে ট্রেনে আসার সময়ে লক্ষ্য করেছি, প্রবীর দারুকার প্রায়ই রুমাল দিয়ে চশমা এবং মুখ মোছার অভ্যেস। রুমালটা বেশ বড়সড় এবং শৌখিন। তখন আমার চোখে পড়েছিল ওই রুমালের কোণে 'পিডি' এমব্রয়ডারি করা। জঙ্গলে বুধনের কাছ থেকে যখন ওই রুমাল পেলাম, তখন ব্যাপারটা আমার স্ট্রাইক করল। দুজনের নামের আদ্যক্ষর এক হলেও ওটা দুবের রুমাল নয়। পরে পুলিশ হেফাজতে দুবের পকেট থেকে পাওয়া সাধারণ রুমাল দেখে আমার ধারণা বদ্ধমূল হল। বুধন জঙ্গলে যে নতুন বাবুটিকে দেখেছিল, সে আর কেউ নয়, প্রবীর দারুকা।

—এক মিনিট মামা। প্রবীর দারুকা আমাদের সঙ্গেই সস্ত্রীক ট্রেনে রাঁচি ফিরছিলেন। তা হলে কীভাবে উনি এই ব্যাপারের সঙ্গে—

—ওতে কোনও অসুবিধে নেই। দুবেকে সরিয়ে দেওয়ার পরে ও কলকাতায় গেছিল, সম্ভবত কোনও কর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। দিনদুয়েক কাটিয়ে ফিরছিল রাঁচি।

আপনার শেষ ক্লু টেলিভিশনের ব্যাপারটা?—পট্টনায়েক শুধোলেন।

—হ্যাঁ। ওই ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল প্রবীরের চেম্বারে ঢুকে। প্লাস্টিক ঢাকা দেওয়া থাকলেও ফাঁকফোঁকর দিয়ে যেটুকু দেখেছি, তাতে নিশ্চিত হয়েছিলাম, ওই যন্ত্রটা সাধারণ টেলিভিশন নয়, কোনও স্বয়ংক্রিয় কম্প্যুটার জাতের যন্ত্র। ওর যমজ ভাইকেই আবার দেখেছি গতকাল, জঙ্গলে তাঁবুর মধ্যে। যে

লোকের স্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানের সাজ-সরঞ্জাম সাপ্লাইয়ের ব্যাবসা, তার ও যন্ত্র কোন কাজে লাগবে? মাত্র তিন বছরে এতবড় চোখ ধাঁধানো দোকান হাঁকিয়ে বসল। চড়চড় করে পয়সা করতে থাকল, এটাও কি খুব স্বাভাবিক? সব মিলিয়ে অভিযানে বেরুবার আগে মোটামুটি সিওর ছিলাম, প্রবীর দারুকা দুবের খুনের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জড়িত।

ইয়েস, আর একটা প্রমাণ। পাণ্ডের দিকে ফিরে মামা বললেন, কাল রাতে আপনার ভ্যানের টায়ার ফুটো করে যে জিপটা পালিয়ে যায়, সেই জিপে ছিল প্রবীর দারুকা। ওর জিপ হুড্ডুতে দাঁড় করানো ছিল, অন্ধকারে আপনি দেখতে পাননি। ও আপনার পিছন-পিছনই ফিরে আসে। আপনি নেমে জঙ্গলে ঢুকতে, আমাদের শিক্ষা দিতে ও টায়ার ফুটো করে পালায়। বলুন, ওর দোকানের সামনে কাল রাতে জিপের টায়ারের টাটকা দাগ দেখেছিলেন তো?

হ্যাঁ, দেখেছি।—পাণ্ডে বিহ্বলভাবে বললেন, তাঁর চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে উঠেছে।

ওয়াভারফুল! ডক্টর মুখার্জি, আপনার অ্যানালিসিস যে-কোনও গোয়েন্দাকে লজ্জা দেবে।—পট্টনায়েক বলে উঠলেন।

—থ্যাঙ্কিউ। তবে একটা ব্যাপার ভুলে যাবেন না, অনুসন্ধিৎসা আর বিশ্লেষণ ক্ষমতা না থাকলে সত্যিকারের বিজ্ঞানচর্চা হয় না। সেদিক দিয়ে বিজ্ঞানীরা গোয়েন্দাদের চেয়ে—আরে! আসুন! আসুন!

স্যার-স্যার আপনি একদম মাত করে দিয়েছেন।—দু-হাতে দুটো বড়-বড় প্যাকেট ঝুলিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন অনন্ত সরখেল। দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে তাঁর মূলোর মতো দাঁতের হাসি, ও: স্যার, আপনি যে কীভাবে...ইয়ে স্যার, সব খবর পেয়ে গেছি। তাই স্যার একটু মিষ্টিমুখ—

—খবর পেয়ে গেছেন?

—ফুল ফুটলে সৌরভ ছড়াতে কি দেরি লাগে স্যার? স্যার, এই জন্যেই পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো।...

দাঁড়ান, দাঁড়ান।—জগুমামা বাধা দিয়ে বললেন, অনন্তবাবু, ওটা নেহরু নয়, গোপালকৃষ্ণ গোখলের কথা। আপনি ঠান্ডা হয়ে একটু বসুন। কী খাবেন বলুন? চা, না কফি?

—একটা স্যার হলেই হল।

—টুকলু, অর্ডার দে।...আর শোন, কী করবি ঠিক করেছিস? আজই কলকাতা ফিরবি, না চট করে নেতারহাটটা ঘুরে নিবি? পাহাড় ঝরনা, জঙ্গল সব মিলিয়ে চমৎকার জায়গা।

—না-না কোথাও না। স্ট্রেট কলকাতা।

আমার ভেতরটা এখন টগবগ করে ফুটছে।

ছায়ামূর্তি

১

সেই ভোর থেকে বৃষ্টি। কখনও টিপটিপ, কখনও মুষলধারে। আকাশে জমাট মেঘ। ক'দিন কী গরমটাই না পড়েছিল।

সামনে বইখাতা খোলা। খোলাই আছে। এমন দিনে কি পড়তে ইচ্ছে করে? বর্ষাভেজা রবিবারের সকাল! তার উপর বাড়িতে জগুমামা সশরীরে বর্তমান।

হ্যাঁ, আমার মামা বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় এখন মাসখানেকের ছুটি কাটাচ্ছেন আমাদেরই বাড়িতে। গল্প শোনার সুযোগ কি সহজে মেলে? পিকলুটা এঁটুলির মতো সারাক্ষণ সেঁটে আছে মামার সঙ্গে। আর আমি? পুজোর ছুটির পরেই টেস্ট।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং! টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো।

ওপার থেকে ভেসে এল অ্যামেরিকান অ্যাকসেন্টে মহিলা কণ্ঠ,—ক্যান আই স্পিক টু ডক্টর মুখার্জি?

—মামা! মামা, তোমার ফোন।

মামা খাটের উপর এক গন্ধমাদন সাইজের বই পড়ছিলেন। পাশে পিকলু, চোখ বুজে মহানন্দে আঙুল চুষছে। পাক্কা দশবছর বয়স হল এখনও বদভ্যেস গেল না!

মিনিটদুয়েক টেলিফোনে কথাবার্তা হল। তারপর মামা বললেন,—টুকলু চটপট রেডি হয়ে নে, বেরোব।

—এখন? হেড অফিসের পারমিশন?

মা বাধা দিলেন না। শুধু বললেন,—এই জল ঝড়ের মধ্যে বেরোবি?

কী করা যাবে?—মামা বললেন, কাল ভোর ছ'টাতে ক্লারার দিল্লির ফ্লাইট। নইলে দেখা হবে না।

—ক্লারা কে?

—আমার এক বান্ধবী। গত বছর লন্ডনে বিজ্ঞান সম্মেলনে ক্লারা অ্যান্ডারসনের সঙ্গে আলাপ হয়। ভারী খোলামেলা স্বভাব। তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। মাত্র বত্রিশ বছর বয়স। এর মধ্যেই বায়োকেমিস্ট্রিতে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

এস, এস। এক বছর পর দেখা। গ্র্যান্ড হোটেলের সুসজ্জিত স্যুইটে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ক্লারা অ্যান্ডারসন। বললেন, এই ইয়ং বয়কে তো ঠিক—

—অর্ণব ভট্টাচার্য, আমার নেফিউ। কী ব্যাপার ম্যাডাম? হঠাৎ কলকাতায়?

—কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম।

—কীরকম?

আমি বলছি।—এবারে মুখ খুললেন শ্রী অ্যান্ডারসন। চৌকো মুখ, ঝোপড়া গোঁফ, ব্যাকব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল, রোল্ডগোল্ডের হাইপাওয়ার চশমা। সব মিলিয়ে রাশভারী চেহারা। বললেন, আমি দু-একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। তারই একটার ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং পড়েছে দিল্লিতে। তা ক্লারা ধরে বসল, ও-ও আসবে। কী করি, লাইফ-পার্টনার! হংকং হয়ে দিল্লি যাবার পথে কলকাতায় জাস্ট একদিনের হল্ট।

আপনার এই কোম্পানির কাজকর্ম?—মামা শুধোলেন।

বিভিন্ন ধরনের অ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস তৈরি করা।—নিজের কার্ড বাড়িয়ে দিলেন অ্যান্ডারসন। ওঁর হাতের কড়ে আঙুলটি জোড়া।

টমাস অ্যান্ডারসন, ডিরেক্টর, মেটকাফে অ্যালয় (ইন্ডিয়া) লিমিটেড। তলায় গোটা বারো দেশের নাম। তার মধ্যে রয়েছে এশিয়ার হংকং, সিঙ্গাপুর, ইরাক, পাকিস্তান এবং ভারত।

ক্লারার কোলে ভারী মিষ্টি দেখতে একটা ডলপুতুল। তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ক্লারা হেসে বললেন,—আচ্ছা জাগাবনডু, তুমিই বল, এসব কোম্পানিগুলোকে কী তোমাদের দেশে অ্যালাও করা উচিত?

জগুমামা কফিতে চুমুক দিতে গিয়েও থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি কিছু বলার আগেই শ্রী অ্যান্ডারসন কপালে কৃত্রিম করাঘাত করলেন,—ও মাই গড! আবার ক্লারা, তুমি! সেম অ্যালিগেশন। আরে ভাই আমাদের কোম্পানির কাজ স্রেফ অ্যালয় বানানো।

ও তো লোক দেখানো।—ক্লারা মুখ টিপে হেসে বললেন, জাগাবনডু, তুমি কি বল? ভূপাল অ্যাকসিডেন্টের পর কোনও মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিকে তোমাদের দেশে ঢুকতে দেওয়া উচিত?

—তুমি শুধু-শুধু ওনার লেগপুল করছ! আর তোমার আমার বলায় কি আসে যায়! আমাদের গভর্ণমেন্ট-পলিসি, ও সব ছাড়ো। তোমার গবেষণা কেমন চলছে বলো?

—চলছে। রিসেন্টালি অ্যাটম নিয়ে একটু পড়াশোনা করছি। তোমার কী খবর?

—আমি? সরকারি বিজ্ঞানীর কি আর গবেষণার খুব ফুরসত মেলে? তার মধ্যেই ফাঁক-ফোঁকরে এটা-সেটা। তোমারা কি দিল্লি থেকে অন্য কোথাও যাচ্ছ? পারলে কাশ্মীরটা একটু ঘুরে যেও। হেভেন অন আর্থ।

দেখি।—ডলপুতুলকে আদর করতে-করতে ক্লারা বললেন, কর্তার সময় পাওয়া নিয়ে কথা।

বাড়ির দরজায় পা দিতে দিতে একটার ঘণ্টা বাজল। বাবা বেরিয়ে এলেন,—যাক, ফিরেছ! এই মিনিট পনেরো আগেই দিল্লি থেকে তোমার ফোন এসেছিল। ভদ্রলোক একটা ফোন নম্বর দিয়েছেন। তুমি না পেলে উনিই আবার ফোন করবেন বিকেল পাঁচটার পরে। বললেন, বিশেষ জরুরি দরকার।

—কী নাম বললেন?

—কি সাম 'পট্টনায়েক'। ফোনে খুব ডিস্টার্বেন্স হচ্ছিল, পুরো নামটা বুঝতে পারিনি।

পট্টনায়েক! মানে সত্যসাধন পট্টনায়েক? সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল গতবারের সেই ঘটনাটা।

তখনই আলাপ হয়েছিল মামার পুরোনো বন্ধু পট্টনায়েক আঙ্কলের সঙ্গে। চমৎকার লোক। মামার কাছে শুনেছি, পরপর কয়েকটা প্রোমোশন পেয়ে উনি এখন সিবিআইয়ের ইনস্পেক্টর জেনারেল।

ওঁর ফোন কি? তা হলে কোথাও কি কিছু গুরুতর ঘটেছে?

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং করে পাঁচটা। সারাটা দুপুর চেষ্টা করেও ফোন মেলেনি। আমি ধস্তাধস্তি করে চলেছি জ্যামিতির প্রবলেম নিয়ে।

মা ডাকলেন,—টুকলু, মামাকে নিয়ে আয়। চা হয়ে গেছে।

ঠিক তখনই আবার বেজে উঠল টেলিফোন।

মামা ধরলেন,—ইয়েস, স্পিকিং!...স্ট্রেঞ্জ!...ইমিডিয়েটলি?...হোয়াট?...অ্যাকসিডেন্ট!... অবকোর্স!

এরকম পরপর কয়েকটা বিস্ময়বোধক ও জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক শব্দ।

আমি এদিকে দারুণ কৌতূহলে ছটফট করছি। নিশ্চয়ই গুরুতর গণ্ডগোল।

—কী রে, তোদের চা যে সরবত হয়ে গেল।

দিল্লি থেকে পট্টনায়েকের ফোন।—মামা বললেন, ক'দিন যে আরাম করব, তার উপায় নেই। তল্পিতল্পা গুছিয়ে ছুটতে হবে।

—বলিস কী! কোথায়?

—একেবারে ভারতের উত্তরের প্রত্যন্তদেশ লাদাখে।

—লাদাখ! ব্যাপারটা কী?

—ফোনে যেটুকু বুঝলাম, সেখানে উদ্ভট সব কাণ্ডকারখানা ঘটেছে। লাদাখের গ্রামবাসীরা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে জ্যান্ত দেব-দেবী দেখে...মিলিটারি ট্রাক খাদে পড়েছে, সব মারা গেছে। একমাত্র জীবিত জওয়ান আনবিলিভেবল জবানবন্দি দিয়েছে।

—সে কী গো! কবে যাচ্ছ?

যাচ্ছ না, বল যাচ্ছি। মামা হেসে বললেন, তোর পরীক্ষার যথেষ্ট দেরি আছে, ক'দিন ঘুরে এলে মনটা তাজা হয়ে যাবে। ঠিক মেকআপ করে নিতে পারবি। কী পারবি না?

শুনছ?—ব্যাপারটা কোনদিকে ঘুরছে বুঝতে পেরে মা কাতরকণ্ঠে বললেন, জগু কী বলছে?

শুনে কী করব?—বাবা যে কখন আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়ালই করিনি। হেসে বললেন, বাধা দিয়ে লাভ হবে না। জগু তোমার ছেলেকে নেবেই। আর দেখেছ তো গিন্নি, যেখানে গোয়েন্দা ফেল, সেখানে তোমার ভাইয়ের খেল!

২

বেল্টটা খুলে আরাম করে বসুন।—জগুমামা আলতো টোকা দিলেন অনন্তবাবুকে।

দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে সামান্য হাসলেন ভদ্রলোক। তারপর ফের ঝুঁকে পড়লেন জানলার দিকে।

এবার আমি খোঁচা দিয়ে বললাম,—ও অনন্তবাবু! এখনি সিটবেল্ট বাঁধার দরকার নেই। নামার সময় বাঁধবেন।

অনন্তবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে একগাল হাসলেন।

কী হলটা কি?

—যা ব্বাবা! কানে কিছু ঢুকলে তো? অনন্ত সরখেলের দুটো কর্ণকুহরেই মোক্ষম তুলো ঠাসা।

এজন্যে অবিশ্যি জগুমামাই দায়ী। দমদম এয়ারপোর্টে উনিই অনন্ত সরখেলকে পইপই করে বুঝিয়েছেন প্লেনে চড়ার নিয়মবিধি সম্বন্ধে।

আমাদের বোয়িং ৭০৭ এখন উড়ে চলেছে মেঘরাজ্যেরও অনেকখানি ওপর দিয়ে। চকচকে নীল আকাশ, ঠিক নীচেই সূর্যের আলোয় রঙিন মেঘের বিছানা।

এই যাত্রায় অনন্ত সরখেলের সঙ্গ নেওয়াটা অনেকটা কাকতালীয়ভাবে হয়ে গেল। গতকাল আমি যখন মালপত্র গোচ্ছাচ্ছি, মামা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সকে ফোনে ধরার চেষ্টা করছেন, সেই সময় আমাদের বাড়িতে হঠাৎ অনন্ত সরখেলের আবির্ভাব। এই প্রথম।

রাঁচির পরে দ্বিতীয়বার ওর সঙ্গে দেখা হল।

এসে যেই শুনেছেন, আমরা আবার অভিযানে বেরোচ্ছি, ব্যস। কচ্ছপের কামড় মেরে ঝুলে পড়লেন। নাছোড়বান্দা। মামা যত তাঁকে বোঝান 'ঠিক আছে, এর পরে যখন যাব, আপনাকে খবর দেব', উনি তত বলেন, 'এবারই নিয়ে চলুন স্যার, পরের ব্যাপার পরে। একটু দয়া করুন স্যার, দেখবেন স্যার, কোনও ঝামেলা করব না। এসব কেসে স্যার লোকবল বড় বল। কাশ্মীর, লাদাখ...স্যার'!...

মামার রাজি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

মামার কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে বর্তমানে ফিরে এলাম। চাপাস্বরে মামা বললেন,—দ্যাখ।

—কী?

—ওই যে।

সামনের অন্যদিকের সারিতে কোনাকুনি বসা লোকটি শান্তভাবে বসে। দুটি হাত কোলের ওপর। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, পাতলা চুল পেতে আঁচড়ানো। এটা দেখার কি আছে। লোকটার পাশে একটি অপেক্ষাকৃত কমবয়েসি যুবক। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। দুজনেই উইন্ডো দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে।

মামা আবার বললেন,—কিছু বুঝলি?

—নাহ। কী?

—থাক, বুঝিসনি যখন, বুঝে দরকার নেই।

এই সময় আমার মাথার উপরের সর্তকতা লেখা অক্ষরগুলো জ্বলে উঠল। মাইক্রোফোনে গমগম করে উঠল মহিলা কণ্ঠ,—প্লিজ ফাসন ইয়োর সিট-বেল্টস। উইদইন আ ফিউ মিনিটস...

ঝকঝকে সাজানো ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে লাউঞ্জে পা রাখতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর,—হ্যাল্লো। ডক্টর মুখার্জি। হাই অর্ণব।

সত্যসাধন পট্টনায়েক। সোফায় ছড়িয়ে বসে আছেন। আমরা তিনজন সামনের সোফায় বসলাম।

মামা অন্তবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন,—এনাকে চিনতে পেরেছেন? রাঁচির কাণ্ডের শেষ দৃশ্যে যাঁর উদয়। গতকাল হঠাৎ হাজির হয়ে এমনভাবে ঝুলে পড়লেন যে ওনাকে বাদ দিলে আমার ঠ্যাং দুটোকেও রেখে আসতে হত।

তারপর লঘুস্বরে বললেন,—কী ব্যাপার বলুন তো? বেশ দিদির কাছে ছুটি কাটাচ্ছিলাম, তা আমার কপালে নেই!

পট্টনায়েকের মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। বললেন, বিশ্বাস করুন ডক্টর মুখার্জি, যেসব কাণ্ড ঘটেছে বা ঘটে যাচ্ছে, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, আসল রহস্যটা ভেদ করতে পারিনি। এদিকে এতজন জওয়ান মারা গেল। বাধ্য হয়ে—

আরে ধুর মশাই!—মামা হেসে বললেন,—ঠাট্টাও বোঝেন না? সংক্ষেপে বলুন তো, কী হয়েছে?

—আমি জাস্ট ছুঁয়ে যাচ্ছি। ডিটেলস ওখানে গিয়ে নিজের কানে শুনবেন।...দাঁড়ান, কফি বলি।

অনুচ্চকণ্ঠে পট্টনায়েক বলতে শুরু করলেন।

প্রথমটা ব্যাপারটায় কেউ আমল দেয়নি। ধরে নিয়েছিলাম, নিরক্ষর পাহাড়ি মানুষদের চোখের ভুল বা ওরকম কিছু। তারপর যখন জওয়ানদের ট্রাক খাদে পড়ল, এবং একমাত্র বেঁচে যাওয়া সৈনিক আজগুবি সব ঘটনা গড়গড় করে বলল, তখন আর বসে থাকা গেল না। আর আমি ভেবে দেখলাম, এ কর্ম আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়।...

জায়গাটা লাদাখের রাজধানী লেহ থেকে বেশ খানিকটা উত্তরে। সীমান্তের কাছে। মাইলের পর মাইল বরফ আর পাহাড়ের মাঝে একমাত্র জনবসতি, মিংথুলা গ্রাম। মাত্র কয়ঘর বাসিন্দা। মাসতিনেক আগে হেড-কোয়ার্টারে বসে রির্পোট পেলাম, গাঁ খালি করে গ্রামবাসীরা সব লেহতে চলে এসেছে। কী হল? দায়িত্বশীল একজন ইনস্পেকটার পাঠালাম। সে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে যে সংবাদ নিয়ে এল, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

—কী সংবাদ?

—গ্রামে কিছুকাল ধরে নাকি সব দেব-দেবী, মহাপুরুষরা আর্বিভূত হচ্ছেন। বুদ্ধ শিব, ব্রহ্মা, এনারা সব। যখন-তখন এদের আবির্ভাব ঘটে। কিছুক্ষণ ধরে নানান বাণী দেন। সবশেষে সকলেই বলেন, মানুষ যেভাবে হিমালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তাতে তাঁদের বাসস্থান আর থাকছে না। মানুষের এই উৎপাতে এঁরা সব

চলে এসেছেন এই লাদাখে। এখানেই ওরা থাকতে চান। তাঁদের অনুরোধ অধিবাসীরা যেন গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

—ওয়াট! ইমপসিবল! তারপর?

—হ্যালুসিনেশন ভেবে আমরা তখনও নিষ্ক্রিয়। ক'দিন পরেই খবর পেলাম, ওই গাঁয়েরই কাছাকাছি জায়গায় জওয়ানদের ট্রাক খাদে পড়েছে। লেহ-র হাসপাতালে বেঁচে যাওয়া একমাত্র জওয়ান জানাল, হঠাৎ নাকি একপাল হিংস্র বাঘ-সিংহ পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে লাফিয়ে পড়েছিল তাদের ট্রাকের সামনে। আচমকা তাদের দেখে দিশেহারা ড্রাইভার মাথার ঠিক রাখতে পারে না। ভাগ্যক্রমে ওই ছেলেটিই একমাত্র বেঁচে যায়, ট্রাক থেকে ছিটকে পড়ে।

এক মিনিট, এক মিনিট।—অনন্তবাবু হঠাৎ ছটফট করতে-করতে এগিয়ে যান কফির কাউন্টারের দিকে।

—প্লিজ টেলমি টাওলে হোয়ার?

কেয়া?—ওয়েটারটি হতভম্ব।

টাওলে, টাওলে! যায়গা।—অন্তবাবু হাত-পা নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

পাশেই এক যুবক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন,—কী চাইছেন। বলুন তো?

অনন্তবাবু হাতে স্বর্গ পেলেন। মুখ কুঁচকে বললেন,—ধূর মশাই! বাথরুমে যাব। তলপেট ফেটে যাচ্ছে। ছাতুর কিস্যু বোঝে না—!

—ওদিকে। একটা লেডিজ, অন্যটা জেন্টস। দেখে ঢুকবেন।

'থ্যাঙ্কু থ্যাঙ্কু' করতে-করতে অনন্ত সরখেল দ্রুতবেগে ঢুকে গেলেন। যুবক এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। সকালের প্লেনে ইনি বসেছিলেন মামার দেখানো ভদ্রলোকের পাশে।

যুবক বললেন,—নমস্কার, আপনারা কি শ্রীনগরের ফ্লাইট ধরবেন?

—হ্যাঁ। আপনি?

—আমার ওখানেই রুটিরুজি। হোটেল চালাই। পিওর বাঙালি খানা। ছুটিতে কলকাতা এসেছিলাম। এই আমাদের কার্ড। যদি দয়া করে পায়ের ধুলো দেন।—

কার্ডে ছাপা—'স্বপন বিশ্বাস হোটেল মেঘালয়, ডালগেট, শ্রীনগর।'

এরমধ্যে 'টাওলে' থেকে তৃপ্তির হাসি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন অনন্ত সরখেল। এসেই আমার কানে কানে বললেন,—একবার ঘুরে এলে পারতে। যা-সব সিস্টেম না, ইচ্ছে করছিল ওখানেই শুয়ে পড়ি।

মামা বললেন,—তারপর? আপনি নিজে গেছিলেন ওই গ্রামে?

—না। আগেই বলেছি, আমার লিমিটেশন আমি জানি। লেহ থেকে রিপোর্ট পেয়ে বুঝলাম, এ রহস্য উদ্ধার আমার অসাধ্য। তবে হ্যাঁ, আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে গোয়েন্দাদের একটি দল পাঠানো হয়েছিল মিংথুলায়। তারাও কোনও মাথামুণ্ডু বোঝেনি। মিংথুলা গ্রামের পাশে একটা বহু-পুরোনো গুম্ভা আছে। ওখানকার লামারা অবশ্য এখনও আছেন। তারা কিন্তু এসব কিছু দেখেননি। ট্রাক-দুর্ঘটনার দিন শুধু মানুষের আর্তনাদ শুনে বেরিয়ে এসে দেখেন ট্রাকটি গড়িয়ে পড়ছে খাদ বেয়ে।...

আমাদের কফিপর্ব শেষ। ফ্লাইটের গেটের দিকে এগোতে-এগোতে পট্টনায়েক বললেন,—গভর্নমেন্টও কেসটা নিয়ে অসম্ভব ওরিড। কারণ, ঘটনাস্থলটা এমন জায়গায়, যার একদিকে গা ঘেঁষে পাকিস্তানের দখলে 'আজাদ কাশ্মীর' অন্যদিকে 'আকসাই চিন'। আফগানিস্তান আর সোভিয়েত বর্ডারও খুব দূরে নয়।

শ্রীনগর এয়ার পোর্টের বাইরে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি ট্যাক্সি ধরার জন্যে। এখান থেকে যতটুকু দেখা যাচ্ছে ভূস্বর্গকে, তাতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি।

আররে, ডক্টর মুখার্জি না?—জগুমামার কাঁধে ভারী হাতের চাপড়, বাজখাই গলা।

এক শিখ ভদ্রলোক। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। বয়স পাঁচের কোঠায়, মুখে দাড়ি পাগড়ি ছাড়া কানে মাকড়ি, চোখে নীল গগলস। আন্তরিক গলায় বললেন,—চিনতে পারছেন?

মামা হাসিমুখে বললেন,—কী যে বলেন, আপনাকে ভোলা যায়? কেমন আছেন?

—ভালো। তা এখানে? বেড়াতে?

ঠিক বেড়ানো নয়, একটু কাজও আছে। গবেষণার ব্যাপারে। এখান থেকে কিছুদুরে একটা চমৎকার গবেষণার স্পট পেয়েছি।

—কেয়া তাজ্জব! আমিও যাচ্ছি এই ভ্যালিরই আরেকটু ইনটিরিয়ারে, গবেষণার ব্যাপারে। দাঁড়ান, আলাপ করিয়ে দিই।—ভদ্রলোক একটু দূরে দাঁড়ানো হোঁতকা কালো আরেকটি লোককে ডাকলেন, ইনি মিস্টার লুথরা, আমার ফিনানসিয়ার।

—নমস্কার, নমস্কার। ভালোই হল। একই জায়গায় কাজ, মাঝে-মাঝে দেখাও হয়ে যেতে পারে।

ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন।

—ইনি কে মামা? আগে তো কখনও—

ডেঞ্জারাস লোক।—মামা বললেন, লন্ডন বিজ্ঞান সম্মেলনে ভারতীয় হয়েও এই গুরবচন সিং-ও তার চেলা চামুনণ্ডারা আমায় বেকাদায় ফেলার নানান চেষ্টা করেছিল। প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল, আমার রিসার্চ বেসলেস।

৩

দু-দিকে বরফে ঢাকা পবর্তমালা আকাশ ছুঁয়েছে। লম্বা-লম্বা ফার-পাইনেরা মাথা দোলাচ্ছে শনশন হাওয়ায়। মাঝেমধ্যে দু-একটা আপেলের বন, গাঢ় সবুজের মাঝে কমলা ছোপ।

আমাদের এয়ারকন্ডিশন্ড বাস ছুটে চলেছে লেহ শহরের দিকে। কালকের দিনটা কাটিয়েছি শ্রীনগরে, ওই স্বপন বিশ্বাসের মেঘালয়ে। ছেলেটা যথেষ্ট যত্নআত্তি করেছে। আজ সকালে হোটেল ছাড়ার সময় ওকে দেখিনি। শুনলাম, ভোরেই বেরিয়ে গেছে।

কালকের দিন কেটেছে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে। লাদাখের দুরন্ত ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচাতে কিছু পশমি জামাকাপড় কিনেছি। এক ফাঁকে আমি আর অনন্তবাবু আবার পহেলগাঁও ঘুরে এসেছি।

কাল থেকে একটা কথা মাথার মধ্যে ঘুরছিল। মামাকে বলে ফেললাম,—'আজাদ কাশ্মীর' কোথায় মামা?

মামা বললেন,—এখানেই। পাকিস্তান এই রাজ্যের পশ্চিমে প্রায় অর্ধেকটা দখল করে বসে আছে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে। চিন আবার এই রাজ্যের লাদাখ জেলার পুবদিকে খানিকটা ঢুকে বসে আছে। ১৯৬২-র যুদ্ধের সময় চিনা ফৌজ ওই অব্দি এসে থেমে যায়। তারপর বলে, ওই অংশটা ইতিহাস অনুযায়ী তিব্বতেরই অংশ।

—কিন্তু পাকিস্তান যে ১৯৪৭ থেকে দখল করে বসে আছে, ভারত পুনরুদ্ধার করছে না কেন? তা ছাড়া ম্যাপে কাশ্মীরের যে সীমানা দেখি, সেটাকি ওই অংশগুলো বাদ দিয়ে?

—দাঁড়া, এক এক করে বলি। ভারতের মানচিত্রে পুরোটাই দেখানো হয় জম্মু-কাশ্মীরের সীমারেখা আসলে তা না থাকলেও। কারণ, এই জবরদখল ভারত মেনে নেয়নি। আর ভারত কেন পুনরুদ্ধার করছে না, সেটা বুঝতে গেলে পুরোনো ইতিহাসটুকু জানতে হবে। সংক্ষেপে বলছি, শোন।

বিট্রিশ যখন দেশ টুকরো করে স্বাধীনতা দিল, সেই সময় দিল শেষ শয়তানি চাল। যাওয়ার আগে বলে গেল, ভারতে যে ক'টি করদ রাজ্য আছে, তাদের রাজাদের ইচ্ছে অনুযায়ী তারা ভারত বা পাকিস্তান যে-কোনও রাষ্ট্রে যোগ দিতে পারে।

সাদা মনে দেখলে মনে হবে, কত ভালো। রাজাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা দেশভাগের অসহ্য সমস্যার সঙ্গে আরও এমন একটা সমস্যার বীজ পুঁতে দেওয়া, যাতে নতুন দুটো স্বাধীন দেশ নিজেদের মধ্যে শত্রুতা চালিয়ে যায় ভবিষ্যতে।

সবচেয়ে বড় গোলমাল পাকালেন মহারাজা হরি সিং। তিনি তখন জম্মু-কাশ্মীরের রাজা। উনি দোনামোনা করতে লাগলেন। নতুন ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে শ্রীনগরের সড়ক পথে যোগাযোগ তখন নেই। লাহোর হয়ে শ্রীনগরের রাস্তা পড়ে গেছে পাকিস্তানে।

পাকিস্তান দেখল, সুবর্ণসুযোগ। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের ওপর তাদের লোভ প্রথম থেকে। তা ছাড়া ওখানে বাসিন্দাদের মধ্যে মুসলমান মানুষের সংখ্যা বেশি।

সুতরাং কাশ্মীর উপত্যকায় নি:শব্দে ঢুকে এল পাকিস্তানি গুপ্তচর। তারপর হঠাৎ সাতচল্লিশের অক্টোবরে কাশ্মীরের ভিতরে ঢুকে পড়ল পাক-ফৌজ। উত্তর-দক্ষিণ বেয়ে। মহারাজা হরি সিং ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, তাঁর হাল! জরুরি এসওএস পাঠালেন দিল্লিতে—আমি ভারতে যোগ দিলাম। কাশ্মীর বাঁচান।

সড়কপথে কোনও যোগাযোগ নেই, বিমানই ভরসা। তাতে কী এসে যায়! সেই সময়ই দেখা গেল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জওয়ানদের লড়াই। ঝাঁকে-ঝাঁকে বিমান থেকে নামছে তারা আর ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে হানাদারদের ওপর। চলল মারাত্মক যুদ্ধ। জোর কদমে ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে চলল।

পরিস্থিতি দ্রুত বদলে গেল। পাকিস্তান দেখল, এ কী রে বাবা! যা পেয়েছি সবটাই যে হাতছাড়া হয়ে যাবে! রাষ্ট্রপুঞ্জে তাদের করুণ আবেদন গেল। সঙ্গে সঙ্গে কী আশ্চর্য, ব্রিটেন আমেরিকার বশংবদ রাষ্ট্রপুঞ্জ ফতোয়া দিল, 'থামাও যুদ্ধ।'

বাধ্য হয়ে থেমে গেল ভারতীয় বাহিনী, দাঁড়িয়ে গেল 'যুদ্ধবিরতির সীমা' বরাবর। সত্যি বলতে, ওইটাই এখন সীমানা, যাকে বলা হয় নিয়ন্ত্রণ রেখা বা লাইন অব কন্ট্রোল।

—কিন্তু মামা, রাষ্ট্রপুঞ্জ এরকম আদেশ দিল কেন? এ তো ঘোর অন্যায়!

—অন্যায়! হুঁ! ব্রিটেন আমেরিকা সব সময় চায়, ভারত-পাক বিরোধ জিইয়ে থাকুক। দেশ দুটো নিজেদের মধ্যে মারামারি করে পঙ্গু হয়ে থাকবে। কোনও উন্নতি হবে না। ব্রিটেন আমেরিকা ঠেলে মাল বেচবে, অস্ত্র বেচবে। কী লাভ বল তো!

স্যার, সোনমার্গ।—অনন্তবাবুর কথায় দেখলাম, বাস এসে থেমেছে সামান্য কিছু দোকান পাট, রেস্তোরাঁ' দিয়ে সাজানো ফাঁকা একটা জায়গায়।

অদ্ভুত সুন্দর জায়গা সোনমার্গ। একটু রুক্ষ্ম, কিন্তু নিসর্গের কোনও তুলনা হয় না। যেদিকে তাকাই, বরফে ঢাকা আকাশস্পর্শী হিমালয়ের শিখর। একটু দূরে সিন্ধুর এক শাখা। কল কল শব্দে নেচে চলেছে পাথরের ফাঁক বেয়ে।

কাশ্মীরে আসার পর থেকেই দেখছি অন্তবাবুর মধ্যে একটা ভাব এসে গেছে। কখনও মামাকে আবেগের সঙ্গে বলেছেন, 'স্যার জন্ম আমার সার্থক,' কখনও বেসুরো গলায় গেয়ে উঠছেন, 'আমার মাথা নত করে

দাও'...

মামাই বললেন,—একটা কাজ করুন অনন্তবাবু। লাদাখে জলের খুব ক্রাইসিস। আপনি বরং ওয়াটার-বটলগুলোয় পিওর জল ভরে নিয়ে আসুন।

নিশ্চয়ই স্যার।...কি হে টুকলু, যাবে নাকি?

আমি 'না' বলাতে একটু মন:ক্ষুণ্ণ হলেও নিজের আনন্দেই 'ঊর্ধ্বগগনে বাজে বাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল' গাইতে-গাইতে চলে গেলেন নদীর দিকে। আমরা চায়ের দোকানে বসেছি।

মামা বললেন,—আজ তো কারগিলে হল্ট?

হ্যাঁ। ও:—সো টিডিয়াস জার্নি! লেহ পৌঁছোতে-পৌঁছোতে কাল বিকেল। ওর চেয়ে প্লেনে এলে—

—সরি পট্টনায়েক। আমি হেল্পলেস। দেখলেন তো, ভাগ্নের সড়ক-ভ্রমণের ইচ্ছে। সঙ্গে আবার ওই বুড়ো পাগলও—

—মামা! মামা!—দ্যাখো, দ্যাখো! উত্তেজনায় মামার সার্ট টেনে ধরেছি।

মামা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন,—হ্যাঁ, সিংরা নামছে ওই বাসটা থেকে। আরে ওদের পিছনে আমাদের স্বপন বিশ্বাস না? টুকলু, এক কাজ কর। চট করে দেখে আয়, ওই বাসটার সামনে কী লেখা আছে?

বাসের সামনে লেখা 'শ্রীনগর-লেহ'। আশ্চর্য ব্যাপার! তার মানে গুরবচন, লুথরাও এবং এমন কী স্বপন বিশ্বাস চলেছে লেহ তে। ব্যাপার কী?

মামা শুনে চুপ করে গেলেন।

হঠাৎ সবাই হকচকিয়ে গেল পরিচিত চিৎকারে,—ফের? ফের পিছে পিছে আসতা হ্যায়? বোলতা নেহি, তোমকো নেহি বোলেগা?

দেখি, দু-হাতে কাঁধে গোটাছয়েক জলের বোতল ঝুলিয়ে অনন্তবাবু লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছেন। পিছন-পিছন গুটিগুটি আসছে এক স্থানীয় কিশোর। কাতরভাবে কী যেন বলছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে অনন্ত সরখেল তেতে উঠছেন।

—কী হয়েছে? অনন্তবাবু?

আর বলবেন না স্যার!—অনন্তবাবু রীতিমতো বিরক্তিগলায় বললেন, কোন দেশে যে এসে পড়লুম জানি না! নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিল, বোতল দেখিয়ে জল ভরে দিতে বললুম। সেটা ঠিক বুঝল। বোতল নিয়ে যেই ফিরেছি, অমনি জামায় দেয় টান। যত বলি কী, তত ওই এক কথা—নাম! আর আমিও স্যার অনন্ত

সরখেল, সবার কাছে হুটহাট নিজের নাম বলি কখনও? স্যার বলুন। অচেনা লোকজনের কাছে বলা কি উচিত? তা আমার নাম জেনে—

—দাঁড়ান। দেখছি। কেয়া ভাই, কেয়া মাংতা?

ছেলেটা সেলাম ঠুকল,—বাবু ইনাম।

শুনলেন?—তিড়িং করে উঠলেন অনন্ত সরখেল।

—ধ্যুর মশাই! ও তো বকশিশ চাইছে। রাঁচিতে অ্যাদ্দিন কাটিয়েও রাজভাষায় আপনি দেখছি দিগগজ।

—হে:-হে: স্যার। আমাদের ওখানে স্যার দেহাতি হিন্দি। এদের সব উর্দু টান!

কারগিলে এসে পৌঁছোবার আগেই সূর্য চলে গেছে পাহাড়ের ওপারে। আবছা আঁধার নামার সঙ্গে-সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে শীত। উরেব্বাপস, কী শীত! শরীর অসাড় হয়ে আসছে। দু-দুটো পুলওভারের ওপর উইন্ডচিটার চাপিয়েও কেঁপে-কেঁপে উঠছি। রাতে নাকি মাইনাসে নেমে যায় তাপমাত্রা!

ছোট শহর কারগিল। কাছাকাছির মধ্যে বাজার-বসতি, হোটেল-বাসগুমটি। কিন্তু সামরিক দিক দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সব সময় মিলিটারি কনভয় টহল দিচ্ছে রাস্তাঘাটে। মামা বললেন, খাদের ওপারেই পাক-সীমান্ত। 'আজাদ কাশ্মীর'।

পথে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমন কিছু না। জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখতে-দেখতে কখনও-সখনও বাসের ভিতরে তাকিয়েছি। প্রায় প্রতিবারই দেখেছি, মামা কাত হয়ে এক দৃষ্টে দেখছেন, দুই লামা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুককে। ঢোলা আলখাল্লায় তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা, কাঁধে বড় বোঁচকা। একজনের কোলের উপর একটা মূর্তি। বোধহয় বুদ্ধমূর্তিই হবে।

বাস থেকে নামার পর তাদের দেখতে পাইনি।

৪

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে লেহ শহর। লাদাখের রাজধানী। রাতের ঘুম ভেঙে ধীরে-ধীরে জেগে উঠছে। কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে প্রথম-সূর্যের গোলাপি রং মেখে যাচ্ছে কাঠের বাড়ি, চোতেন, গুম্ভা আর দুরের পর্বত শিখরে। একটা-দুটো লোক চলাচল করছে নিস্তব্ধ পথ বেয়ে।

এমন পবিত্র সুন্দর জায়গায় কী শুরু হয়েছে?

—টুকলু, চটপট! পট্টনায়েক এসে পড়বেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট, বাথরুম সব সেরে তৈরি। বেরোবার মুখে রেস্ট হাউসের কর্মী গোলাম নবীর সঙ্গে দেখা। মামা বললেন,—দুপুরের দিকে একটু থেকো। আর অনন্তবাবু ঘুমোচ্ছেন। একটু খেয়াল রেখো, কেমন?

হাসপাতালের কেবিনের সামনে কড়া পাহারা।

বাইরে সোফায় মিলিটারি অফিসার অভ্যর্থনা জানালেন,—আসুন।

ভদ্রলোকের নাম মেজর পঙ্কজ মুক্তান। দুর্ঘটনার কবলে পড়া সৈনিকরা ওঁর অধীনস্থ এক ব্যাটেলিয়ন।

সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ, যুবকটি হেলান দিয়ে শুয়ে ছিল। বছর ছাব্বিশ বয়স। মুক্তান হিন্দিতে বললেন,—প্রকাশ, এরা তোমার কাছ থেকে ঘটনাটা ডিটেলসে শুনতে এসেছেন। গভর্নমেন্টের লোক। যেমন-যেমন ঘটেছিল, বলে দাও!

প্রকাশের মুখে মুহূর্তে দেখা দিল ভয়ের ছায়া। বলল,—আপনারা বিশ্বাস করবেন স্যার?

—নিশ্চয়ই করব।

—কী হয়েছে জানেন, প্রকাশের কথা বিশেষ কেউ বিশ্বাস করছে না। বলছে নিশ্চয়ই ওরা নেশা-ভাং করেছিল, কী দেখতে কী দেখেছে! প্রকাশ, তুমি নিশ্চিন্তে বলো!

প্রকাশ চোখ বুজল। পট্টনায়েককে ইশারা করতে উনি টেপরেকর্ডার 'অন' করলেন। প্রকাশ আস্তে-আস্তে বলতে থাকল।

লেহ শহরে আমাদের হেডকোয়ার্টার। প্রতি সপ্তায় উত্তর-সীমান্ত থেকে এক একদল জওয়ান নিয়ে আমাদের ট্রাক আসে। এখানে জওয়ানরা কয়েকদিন আনন্দ ফূর্তি করে ফ্রেশ হয়ে নেয়। ট্রাক আবার ফিরে যায় সীমান্তে। রসদ আর জওয়ান নিয়ে।

লেহতে কয়েকদিন কাটিয়ে আমরা সেদিন ফিরছি বর্ডারে। ভোর ভোর, একটু আগেই রওনা হয়েছি, যাতে সকাল-সকাল পৌঁছোতে পারি। সবাই খুব মুডে আছি, হইহুল্লা গানবাজনা চলছে খুব।

পথে একটাই জনবসতি। আর সব সুনসান। গ্রামটার কাছে যখন পৌঁছোই, তখন বেলা এগারোটা, শনশন হাওয়া দিচ্ছিল। রোদ্দুরে চারদিক ঝকঝকে। হঠাৎ আমাদের একজন সঙ্গী চেঁচিয়ে ওঠে,—আরে থাম থাম। দ্যাখ তো ওরা কারা?

ওই গাঁয়ের পাশে একটা প্রাচীন তিব্বতি গুম্ভা আছে। বাইনোকুলারে চোখ লাগিয়ে দেখি, কয়েকজন অচেনা মানুষ ঘোরাঘুরি করছে গুম্ভাটার আশেপাশে।

ওরা কারা? আগে তো দেখিনি। ট্রাক থামিয়ে নেমে পড়লাম আমরা।

দু-পা এগিয়েছি কি এগোইনি, চারদিক কাঁপিয়ে ভয়ংকর জান্তব গর্জন—হু-উম। ঘাঁ—উম-ম!

ঘুরে তাকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম! এ কী দেখছি? দু-দিকে পাহাড় বেয়ে ঝড়ের বেগে নেমে আসছে শয়ে শয়ে বাঘ, সিংহ। আসছে আমাদেরই দিকে!

বাঘ-সিংহ এই পর্বতে? এল কীভাবে? এখন? আমাদের কয়েক বন্ধু দ্রুত রিভলভার দিয়ে ফায়ারও করেছে, কিন্তু আশ্চর্য! একটা গুলিও ওদের গায়ে লাগেনি।

আতঙ্কে আমরা দিশেহারা। ছুটে গেলাম ট্রাকের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে ওই হিংস্র জন্তুগুলো ঘিরে ধরেছে আমাদের চারদিক দিয়ে। সামনে পিছনে ওরা! হুংকার ছাড়ছে, লাফ মারছে! উ:! কী ভয়ানক!

বলতে-বলতে প্রকাশের চোখ খুলে গেছে। দু-চোখে শুধু ভয় আর আতঙ্ক। বলে,—থোড়া পানি।

ঢকঢক করে জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হল! তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল,—ব্যস! তার পরই—হ্যাঁ। তারপরই আমাদের ড্রাইভার অন্ধের মতো ট্রাক চালিয়ে দিল সামনের দিকে। আমি শুধু বুঝতে পারি, ট্রাক পালটি খাচ্ছে খাদে। কখন যে লাফ মেরেছি, জানি না। আর কিছু মনে নেই।

ওকে আমরা সেন্সলেস অবস্থায় উদ্ধার করি। খাদের ঢালে একটা পাথর আঁকড়ে পড়ে ছিল।—মেজর মুক্তান বললেন, বর্ডার থেকে লেট-নাইটে যখন ওয়ারলেসে এনকোয়ারি এল, তখন রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কেবিন থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে আমরা হাঁটছি। মেজর বললেন,—ঘটনাটা পুরো আজগুবি, তাই না? কিন্তু একটা সত্যি তো আছে। কী সেটা? জানতেই হবে ডক্টর মুখার্জি। পট্টনায়েক আমায় সব জানিয়েছেন আপনার সম্পর্কে। আপনি পারবেন। প্লিজ।

মামা জবাব না দিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

জিপে বসে পট্টনায়েক বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, কিছু আঁচ করতে পারছেন?

—উঁহু!...এক মিনিট পট্টনায়েক! গাড়ি থামান।

মামা প্রায় ছুটে ঢুকে গেলেন সামনের বাজারের সরু গালিতে।

—আরে ক্লারা। তোমরা। কবে এলে?

হ্যাল্লো! জাগাবনডু, অর্ণব!—ক্লারা হাততালি দিয়ে উঠলেন, হোয়াট আ সারপ্রাইজ! তোমরাও এখানে? আমরা আজই এলাম। শ্রীনগরের একটি লোক এখানে আসার প্রোপোজাল দিল। সাহেব রাজি হচ্ছিল না। এখন নিজেই বলছে, ওয়ান্ডারফুল প্লেস ।

টমাস অ্যান্ডারসন হেসে বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, আপনিও কি বেড়াতে?

ওসব কি কপালে আছে মশাই?—মামা পট্টনায়েককে দেখিয়ে বললেন, ইনি একটা সায়েন্টিফিক ইনডাসট্রি করতে চান। তার প্রোজেকট তৈরি করা, স্পট ঠিক করা, এইসব ব্যাপারেই হঠাৎ চলে আসা।

আপনারা ক'দিন আছেন তো?

ক'দিন আর কোথায়?—ক্লারা বললেন, কালই ব্যাক করছি। তোমরা কি আজ ফ্রি আছো?

সন্ধের পর।—মামা বললেন, আমরা রেস্ট-হাউসে উঠেছি। চলে এসো, আড্ডা দেওয়া যাবে।

ড্রাগন আর ভয়ংকরদর্শন সব কাল্পনিক প্রাণীদের মুখ এমব্রয়ডারি করা লম্বা-লম্বা কার্পেট আর জোব্বা পোশাক ঝুলছে। লাদাখি হ্যান্ডিক্রাফটসের বেশ বড় দোকান।

আমরা চারজনে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। গোলাম নবী ভেতরে ঢুকেছে। অনন্তবাবু মাঝে-মাঝে কার্পেটগুলো টিপে-টিপে দেখছেন। আর ভিতরে উঁকি-ঝুঁকি মারছেন। হঠাৎ বললেন,—স্যার, ড্রাগন-ট্রাগন তো শুনেছি চিন-তিব্বতের পেটেন্ট, এখানেও রয়েছে দেখছি। যেন মিনি-তিব্বত।

মামা বললেন,—ঠিকই বলেছেন। লাদাখ ঐতিহাসিক দিক দিয়েও তিব্বতের খুব ঘনিষ্ঠ। এখানকার স্থাপত্য-সংস্কৃতি-শিল্প সবই তিব্বতি। এমনকী লাদাখি ভাষা, যাকে সরকারিভাবে বলা হয় বোধিক, তাও আসলে তিব্বতি।

এই সময় গোলাম নবী বেরিয়ে এল,—সাহেব, আসুন।

কাল কথাপ্রসঙ্গে ও বলেছিল, ওর চেনা-জানা একটি ছেলে মিংথুলার বাসিন্দা। পালিয়ে এসেছে। সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে আসা।

ছায়া-ছায়া অন্ধকার দোকান ঘর। এখন দুপুর। বিশেষ খদ্দের নেই। গোলাম পরিচয় করাল 'সাংহবী'র সঙ্গে। বলল,—সাহেবরা তোমার গাঁয়ের ব্যাপারে জানতে চান। সরকারি লোক।

জেনে কী করবেন? লড়বেন দেবতাদের সঙ্গে?—বিরক্ত হাসি দেখা দিল সাংহবীর মুখে। বলল,—কালকে এক সাহেবও এসেছিলেন ওইসব ব্যাপার সম্বন্ধে জানতে। কোত্থেকে খবর পেয়েছেন, আমি ওই গাঁয়ের ছেলে। সব শুনে উনিও বললেন, ব্যবস্থা করবেন। আরও বললেন, এ সব কথা আমি যেন আর কাউকে না বলি।

—কীরকম দেখতে বলো তো?

—মাথায় পাগড়ি ছিল, মুখে দাড়ি-গোঁফ আর চোখে কালো চশমা। লম্বা-চওড়া চেহারা।

মামাতে-আমাতে মুখ চাওয়াচাওয়ি হয়ে গেল। মামা গোলামকে বললেন,—ওকে বুঝিয়ে বলো, ওর কোনও চিন্তা নেই। আমাদের কাছ থেকে কথা পাঁচকান হবে না।

গোলাম নবী অনেক জোরজার করার পরে সাংহবী বলতে রাজি হল।

আগে থেকে আমাদের মোটামুটি সব জানাই ছিল। তবে দুটো নতুন ব্যাপার জানা গেল।

প্রথম, দেবতা বা মহাত্মারা গাঁয়ের মানুষদের থেকে বেশ কিছুটা তফাত রেখে আবির্ভূত হতেন। সেই সময় অতি উৎসাহে বা ভক্তিতে কোনও গ্রামবাসী যদি এগিয়েও যেত, তবুও তাঁদের কখনওই খুব কাছে পাওয়া যেত না। যতই এগোনো যাক তাঁরা যেন একজায়গায় দাঁড়িয়ে, অথচ সরে সরে যাচ্ছেন। এক অতি উৎসাহী ছেলে একবার অমন এগোতে-এগোতে নাকি খাদের পাশে চলে গেছিল। আর একটু এগোলেই শেষ। তখন নাকি দেববানীও শোনা গেছিল, দেবতাদের অত সহজে ছোঁয়া যায় না।...

দ্বিতীয়, সাংহবীদের গাঁয়ের পাশেই যে বহু প্রাচীন 'তাম্পু' গুম্ভা আছে, তাতে এখনও জনাতিনেক লামা রয়ে গেছেন। এ সব আশ্চর্য ঘটনার ব্যাখ্যা পেতে তারা সবাই গিয়েছিল তাঁদের কাছে। কোনও সদুত্তর পায়নি।...

সাংহবীর সঙ্গে আলোচনা যখন শেষ পর্যায়ে, তখন হঠাৎ 'ধড়াম' শব্দ এবং অনন্তবাবুর পরিত্রাহী আর্তনাদ। অনন্ত সরখেল এতক্ষণ আপনমনে দোকানের মধ্যেই ঘুরেফিরে দেখছিলেন।

হকচকিয়ে ছুটে গিয়ে দেখি, একটা কার্পেটের ওপর চিত হয়ে পড়ে অনন্ত সরখেল 'উ: আ:' করছেন। বললেন,—ই-স! এমন জোরে ল্যাং মারল শয়তানটা।

—কে মারল?

—অন্ধকারে মুখ দেখতে পাইনি। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম, এককোণে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা শুনছিল। আমি গিয়ে সোজাসুজি চার্জ করতে বলে কিনা 'আপনার কি?' ব্যস। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জাপটে ধরেছি। কিন্তু ব্যাটা যন্তর জিনিস। ল্যাং মেরে পালিয়ে গেল।

৫

মেজর মুক্তান নিজেই স্টিয়ারিং-এ বসেছেন। পাশে জগুমামা ও পট্টনায়েক। পিছনে অনন্ত সরখেল, আমি এবং দুজন সশস্ত্র সৈনিক। চলেছি মিংথুলা গাঁয়ের দিকে।

আজ ঠিক বেরোবার মুখেই আচমকা এমন এক দু:সংবাদ এসে ধাক্কা দিল, ওলটপালট হয়ে গেছে সব।

কাল যার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, মিংথুলা গাঁয়ের সেই সাংহবী নিরুদ্দেশ!

আজ সকালে গোলাম নবী গেছিল তাকে ডেকে আনতে। ঠিক ছিল, সাংহবীও যাবে আমাদের সঙ্গে। কিন্তু ঘণ্টাদেড়েক পরে গোলাম ফিরল বিমূঢ় মুখ নিয়ে। হাতে তার পাকানো একখণ্ড তুলোট কাগজ। কাগজটা পাওয়া গেছে সাংহবীর বাসার দরজার সামনে।

তাতে লাদাখিতে লেখা ছিল, 'পবিত্র কিছু দর্শন করলে যেমন অতি পূণ্য হয়, নাস্তিকদের কাছে তা বর্ণনা করলে তেমনই ভয়ংকর পাপ হয়।'

আকস্মিক এই ধাক্কা আমাদেরও বিহ্বল করে দিয়েছে। কাগজটা উলটে-পালটে দেখতে দেখতে মামা শুধু বিড়বিড় করছেন,—সর্বত্র...সর্বত্র ছড়িয়ে আছে...আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে।...

গোলাম নবী ভয়ার্ত গলায় বলেছিল,—আমার কী হবে সাব?

মামা তাকে 'তোমার কি ভয়?...তুমি তো ও গাঁয়ের নও' ইত্যাদি ভরসা দিলেও সে যে তেমন আশ্বস্ত হয়নি, সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা গেছে।

গতকাল সন্ধে কিন্তু কেটেছিল চমৎকার। অ্যান্ডারসনরা এসেছিলেন। আড্ডা দিয়ে তারা উঠলেন সাড়ে-সাতটায়, লাদাখের হিসেবে অনেক রাত। মুক্তান, পট্টনায়েকও এসেছিলেন। ওঁরাই গাড়িতে দুজনকে লিফট দিয়ে দিলেন।

কাল রাতে কম্বলের তলায় ঢোকার সময়ে দেখছি, মামা বসেছেন টেপরেকর্ডার নিয়ে। সকালের সেই 'ইন্টারভিউ' কত রাত অবধি শুনেছেন জানি না। কারণ, তার আগেই নন্টে-ফন্টের কমিকস পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—এই সেই স্পট।—মুক্তান দেখালেন।

অতলস্পর্শী খাদ আর আকাশছোঁয়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পাকদণ্ডী পথের মাঝে এই জায়গাটা একটু ব্যতিক্রম। বাঁ-দিকে মালভূমির মতো খানিকটা প্রায় সমতল জায়গা। চারপাশে পাহাড়। ডানদিকে তার যথারীতি খাদ। সামনে-পিছনে দু-দিকেই খানিকটা সোজা গিয়ে পথ হারিয়ে গেছে পাহাড়ি বাঁকে।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে দূরে খেলনার মতো কয়েকটা কুঁড়েঘর। মিংথুলা গ্রাম। পাশে তার সেই গুম্ভাটা। দূরবিনে চোখ দিয়েও কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন পাওয়া গেল না। শুধু একটানা ঝোড়ো হাওয়ার শনশন।

আমরা সবাই রাস্তার ডানদিকে। ঠিক যেখান থেকে ট্রাকটা গড়াতে গড়াতে নেমে গেছিল। কী গভীর! তাকালেই মাথা ঝিমঝিম করে। বুকের ভেতর মুচড়ে উঠল কতগুলো তরতাজা প্রাণ হারিয়ে গেছে রাক্ষুসে খাদের অতলে।

পথের ধারে যে বোল্ডারটিতে প্রথম ধাক্কা খায় ট্রাকটা, সেটা একটু টাল খেয়ে আছে। আশেপাশে পড়ে আছে নানান ধাতব টুকরো। একটাতে চিনতে পারলাম, গাড়ির রেডিয়েটরের ঢাকনা।

মামা ওখানে থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিলেন। চকচকে ধাতব কিছু। পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন।

পট্টনায়েকের সঙ্গে অনন্ত সরখেল বেশ জমিয়ে নিয়েছেন।

—মিস্টার পট্টনায়েক, ওইটাই তা হলে মিংথুলা? দেব-দেবীর বাসস্থান?

—সেরকমই বলেছেন দেবতারা।

—হাউ থ্রিলিং! হতেও পারে মশাই। হিমালয় হল ওনাদের খোদ বাসস্থান। ভাবছি, একবার দেবদর্শন করব নাকি?

—আপনি গেলেই কি দেখা দিতে তেনারা বসে আছেন?

—আহা, তা নয়। না হয় মাটি কামড়ে পড়ে থাকলুম। ভেবে দেখুন, আমাদের সাধু রামকেষ্ট এক কালীকে পেয়েই কেমন ফেমাস হয়ে গেলেন। আর একসঙ্গে এতগুলো—

ইঞ্জিনের শব্দ। পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা জিপ। সীমান্তের দিক থেকে ফিরছে সে।

আমরা সড়কের একধারে। জিপ দ্রুত এগিয়ে আসছে! কিন্তু...কিন্তু...জিপের মধ্যে ওরা কারা?

ওই জিপটা আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছে।

মুক্তান! মামা আমাদের গাড়ির দিকে হঠাৎ ছুট দিলেন।—উই হ্যাভ টু ফলো দেম! কুইক! মুহূর্তে আমরা উঠে পড়েছি জিপে। স্টার্ট হয়েই জিপ ছুটেছে গোঁ-গোঁ করে।

সব কিছু ঘটল দশ সেকেন্ডের মধ্যে।

আমাদের সামনের জিপে গুরবচন সিং ও লুথরা। চালক হোটেলের সেই স্বপন বিশ্বাস।

ওই জিপ পাহাড়ের বাঁকে ঢুকে পড়েছে। মুক্তানের মুখ পাথরের মতো...বাড়ছে আমাদের জিপের স্পিড। সিট ধরে শক্ত হয়ে বসে আছি। পাশে অনন্তবাবুর মুখের রং বহুরূপীর মতো বদলে যাচ্ছে।

পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই—এ কী! ওই জিপটা কোথায়? মিলিয়ে গেল?

হঠাৎ আবার ইঞ্জিনের শব্দ। এবার সামনের দিক থেকে। বাঁকের মুখ থেকে সামনে এসে গেল আরেকটি জিপ।

কিন্তু তারপর যা দেখলাম, অবিশ্বাস্য! অসম্ভব!

অবিকল একই রঙের জিপটা নিমেষে আমাদের ক্রস করে গেল। হতভম্ব হয়ে দেখলাম, ওই জিপেও রয়েছেন একই ব্যক্তিরা।

অর্থাৎ গুরবচন সিং, লুথরা আর স্বপন বিশ্বাস!

হিঁচিক...হিঁচিক...হিঁচিক!

দু-হাতে জিপের রড চেপে ধরেছেন অনন্ত সরখেল। দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে দাঁতগুলো বিশ্রীভাবে বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরোচ্ছে। আর মুখ দিয়ে হেঁচকির গোঙানি, হিঁচিক...হিঁচিক!

—সাব, কফি।

ধড়মড় করে উঠে বসেছি। যা ব্বাবা, বিকেল চারটে বেজে গেল?

বাইরে বিকেলের আলো মরে আসছে। এ দেশে সন্ধ্যা নামে অনেক আগে। রাত এখানে লম্বা, শীতার্ত।

পাশে অনন্তবাবু অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। মামা ঘরে নেই। নিশ্চয়ই কাজে বেরিয়ে গেছেন। পারেনও বটে!

সত্যি, অনন্ত সরখেল আজ যা খেল দেখালেন! আমরা নিজেরাই যাচ্ছেতাই অবস্থায়, তার মধ্যে উনি একেবারে—

কী টুকলু, একা-একাই খাচ্ছ? এমন সেলফিশ হয়ে যাচ্ছ না! অনন্ত সরখেলের চোখমুখ এখন পুরো স্বাভাবিক।

—আপনাকে ডেকে তুলব। সত্যি বলছি, সাহসে কুলোয়নি। শেষে সকালের মতো যদি দাঁত ছিরকুটে পড়েন, সামলাতে পারব না।

হেঁ-হেঁ! কীরম দিলুম বলো তো? অনন্তবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, আসলে কি জানো, আমার তখন যাকে বলি 'ভাবসমাধি'...। তোমরা শুধু মুদু—যাগ্যে, এই তো স্যার ফিরেছেন।

জগুমামা এসেই বসে পড়েছেন। রীতিমতো হাঁপাচ্ছেন। নবীকে কফি বলতে বেরোলাম।

কফিতে চুমুক দিয়ে মামা বললেন,—বুঝলি, আরও জট পাকিয়ে গেল।

—জট! কেন?

—আমি আর পট্টনায়েক বেরিয়েছিলাম গুরবচনের খোঁজে। ছোট্ট শহর লেহ। দাড়িপাগড়ি গগলস-এর কল্যাণে খুব একটা সমস্যা হল না। লুথরা-গুরবচন একই হোটেলে রয়েছে। কিন্তু স্ট্রেঞ্জ ব্যাপারটা হল, হোটেলের সকলে একবাক্যে বলল, গুরবচন লুথরা নাকি সারা সকাল হোটেলেই রেস্ট নিচ্ছিল। আমরা ওখানে যাওয়ার মিনিট দশেক আগে দুজনে বেরিয়েছে।

—সে কী! সকালে যে পরিষ্কার দু-দুবার দেখলাম ওদের?

ভূ-উ-ত! আ-ত্মা!—অনন্তবাবুর হাতের কাপ 'ট্যা-র-র' শব্দে কাঁপতে শুরু করেছে। যে-কোনও মুহূর্তে বিছানায় চা পড়ে একটা কেলেংকারি হবে। কম্পিতগলায় বললেন,—স-স্যার, এসব দে-দেবতাদের ব্যাপার। আজ সকালে হয়তো তাঁরাই টেনে বের করে নিয়ে গেছেন ওদের আত্মাকে। আমরা তাদেরই দে-দেখেছি! জয় মা! জয় মা! বাঁচাও মা!

৬

গমগম স্বরে ধ্বনিত হচ্ছিল : 'ওম...বুদ্ধম...থম...'

সমস্বরে উচ্চারিত স্তোত্রমালার মধ্য থেকে এই কয়টি শব্দ আলাদাভাবে বোঝা যাচ্ছিল।

আমরা তাম্পু গুম্ভার প্রবেশ কক্ষে দাঁড়িয়ে। বিশাল হলঘর। সামনের বাতিদানে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। তার ওপারে প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তি, তিব্বতি ঘরানার।

প্রদীপের হালকা আলোয় উপাসনাকক্ষটি আলো-আঁধারি। ছমছমে পরিবেশ। চারপাশের দেওয়ালে লম্বা-লম্বা 'স্কোল' ঝুলছে। সিল্কজাতীয় কাপড়ের ওপর বুদ্ধের, নানা জীবজন্তুর ছবি আঁকা। খিলান, বড়-বড় থামের গায়ে নানান কারুকাজ, রঙিন ছবি।

আমার কাঁধ প্রাণপণে খামচে ধরে আছেন অনন্ত সরখেল। বুঝি না, পইপই করে বারণ করা সত্বেও কেন যে ভয় পেতে আসেন!

ঢুকতেই উপাসনারত তরুণ এক লামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মেজর মুক্তান কাজ চালানো গোছের লাদাখি জানেন। যা বলার উনি বলছেন। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে তরুণটি চলে গেছেন ভেতরে। ভিতরে তখন থেকেই মন্ত্রোচ্চারণ চলছিল, আমরা উপাসনার সময়েই এসে পড়েছি।

হঠাৎ আমার মনে হল, ঘরের মেঝেটা বেশ কাঁপছে। ভূমিকম্প না কি?

মামার দিকে তাকাতে বললেন,—হ্যাঁ। ভূমিকম্পই মনে হচ্ছে। পাহাড়ি অঞ্চলে আকছার হয়। দেখলি না, সিমলায় কেমন ভূমিকম্প হয়ে গেল?

জগুমামা এগিয়ে গিয়ে কান পাতলেন দেওয়ালের গায়ে।

—ওম!

সামনে তরুণ লামা। তার পিছনে এক প্রবীণ লামা। গায়ের রং টকটকে, মুখে মঙ্গোলিয়ন ছাপ। মুখের অজস্র আঁকিবুকি বাদ দিলে শরীর বেশ শক্তপোক্ত। ইনিই তা হলে এ গুম্ভার প্রধান রিনচেন লামা।

আমরা অভিবাদন জানালাম।

তরুণ লামা বললেন,—প্রধান কিছুদিনের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর ইনি ইশারায় দেবেন, আমি বুঝিয়ে দেব।

মামা মুক্তানের দিকে চকিতে তাকালেন। মুক্তান বললেন,—মিলিটারি ট্রাক যেদিন খাদে পড়ে, সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন?

রিনচেন মুখ হাঁ করলেন, ডানহাতের আঙুল তুলে দুটো পাঁচ আঁকলেন, তারপর হাত উলটোলেন।

তরুণ বললেন,—আমরা গুম্ভা থেকে বহু মানুষের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছি। তারপর সড়কের কাছে গিয়ে দেখি একটা ট্রাক গড়াতে-গড়াতে নীচে পড়ছে। ব্যস, এটুকুই।

—আর একটা কথা। গ্রামবাসীদের কাছে তথাগত এবং অন্যান্য দেব-দেবীরা এসে যে উপদেশবাণী দিতেন এবং বলতেন গ্রাম ছেড়ে যেতে, সে সম্পর্কে কিছু জানেন?

রিনচেন ডানহাতের তর্জনি উপরের দিকে তুললেন, নামালেন, ডানহাত বাঁ-হাত আড়াআড়ি রাখলেন, তারপর' রামকৃষ্ণের 'মুদ্রা' দেখালেন।

তরুণ বললেন,—হ্যাঁ। গ্রামবাসীরা ওনাকে এসব জানিয়েছিল। উনি ধ্যানে তথাগতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তথাগত বলেন, উনি বহুযুগ আগেই 'নির্বাণ' লাভ করেছেন, এই পৃথিবীর কাছে আসার কোনও ইচ্ছে তাঁর নেই। হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে প্রধানের বিশেষ জ্ঞান নেই। কিছু বলতে পারেন না। ওঁর মনে হয়েছে, এসব কোনও অপদেবতার কাজ। এই গ্রামের দখল নিতে চায়।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার কাঁধে অনন্তবাবুর কড়া আঙুলগুলো খিমচে বসে গেল!

মুক্তান মামাকে নীচুগলায় কিছু জিগ্যেস করলেন। তারপর বললেন,—আপনারা এই ব্যাপারে আশঙ্কিত নন?

রিনচেন লামা শুধু হাসলেন।

তরুণ বললেন,—আমাদের গুম্ভার চারদিকে তান্ত্রিক বন্ধন দেওয়া থাকে। কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

হঠাৎ 'খট' করে শব্দ হল। মামা 'উ:' শব্দ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। সামনেই ছোট একটা টুল ছিল ওতে ধাক্কা খেয়েছেন।

মামা চটপট উঠে দাঁড়ালেন, হাতটা পকেটে ঢোকালেন। অন্যহাতে রুমাল বের করে মুখ মুছতে-মুছতে বললেন,—চলুন যাওয়া যাক।

ঝাপসা অন্ধকার থেকে ঝকমকে দিনের আলো বাইরে। আমার ঘাড়ের কাছে 'ফোঁও-স'। অনন্ত সরখেল এতক্ষণে নিশ্বাস ছাড়লেন।

পট্টনায়েক হেসে বললেন,—অনন্তবাবু, আপনি সেদিন বলছিলেন সাধনা করবেন। যদি এত নার্ভাস হয়ে—

নার্ভাস! আমি!—অনন্তবাবু আকাশ থেকে পড়লেন, কী যে বলেন! আসলে টুকলুর জন্যেই আমার বড় চিন্তা হয়।

রাগে ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে উঠল আমার। অনন্ত সরখেল দূরে পাহাড়ের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে আছেন।

লাদাখ রোড থেকে জিপ স্টার্ট দিল লেহ-র দিকে।

জিপে বসামাত্র অনন্তবাবুর ভয়টয় উধাও। হঠাৎ ফূর্তি চেগে উঠেছে। গলা ফাটিয়ে গাইছেন, 'মেরুবিজয়ের চেতন বাড়াও হে শূন্য...'

উফ! রবীন্দ্রনাথ হার্টফেল করতেন।

স্টপ!—জগুমামা বলামাত্র জিপে ব্রেক কষলেন মুক্তান এবং গানে অনন্ত সরখেল।

আমরা তখন মিংথুলা ছাড়িয়ে পরপর দুটো পাহাড়ি বাঁক পেরিয়ে এসেছি। নামতে-নামতে মামা বললেন, —টুকলু, আমরা একটু পরে আসছি। মুক্তান, আপনি ওদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবেন।

মামার কাঁধে ঢাউস একটা সাইড-ব্যাগ। কোমরে ঝুলে রয়েছে রিভলভার। পট্টনায়েকের কাঁধে একখানা পোর্টেবল স্টেনগান।

জিপ আবার ছুটে চলেছে দুরন্ত গতিতে। সবাই চুপ। চুপ অনন্তবাবুও। মামারা নেমে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে গোটা পরিবেশটা কেমন পালটে গেছে।

হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে তীব্র হর্ন। বেরিয়ে এল একখানা জিপ।

সঙ্গে-সঙ্গে আমায় চেপে ধরেছেন অনন্তবাবু।

জিপের মানুষটি আমাদের অতি পরিচিত গুরবচন সিং। চালকের আসনে আজ একটি অচেনা যুবক।

আমাদের পাশ কাটাবার সময়ে তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন গুরবচন সিং। বোধহয় চেনার চেষ্টা করছিলেন।

আমার কাঁধে আঙুলের চাপ আলগা হয়ে গেল। অনন্তবাবু নিশ্চিত হয়েছেন, এরা বিদেহী নয়।

বিকেল পেরিয়ে গেছে। মামা ফিরেছেন। এখন সোফায় আধশোয়া। একমনে সিগারেট টেনে চলেছেন। বোঝা যাচ্ছে, চিন্তায় ডুবে আছেন।

—মামা! আজ গুরবচনকে দেখেছিলে? আমরা যখন ফিরছি, তখন ওরা যাচ্ছিল।

—জানি।

—কোনদিকে গেল ওরা? তোমরা ফলো করেছিলে?

—ওরা গুম্ভাতেই এল। আমরা তখন ওখানেই।

—তাহলে তোমাদের এত দেরি হল কেন?

—ফোটোগুলো আর্জেন্ট প্রিন্ট করতে দিয়ে এলাম। কাল দিয়ে দেবে।

গুরবচনরা গুম্ভায়! ফোটো! কার ফোটো? সবটা গুলিয়ে গেল। নাহ, আজ ঠিকঠাক জবাব পাব না।

অনন্ত সরখেল বললেন,—চলো, একটু বেরোবে নাকি?

এইসময় দরজায় ঠকঠক। পট্টনায়েক আর মুক্তান।

—তাহলে কাল আমাদের ফাইনাল মিশন?

হ্যাঁ।—মামা বললেন, দেরি করলে নাটের গুরু পালিয়ে যেতে পারে।

—আপনি সব দিক থেকে সিওর ডক্টর মুখার্জি?

নাইনটিনাইন পার্সেন্ট। তবে মনে রাখতে হবে, এটা সাধারণ মার্ডার নয়। তাই শেষ দৃশ্য পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

লাস্ট সিন অব লাদাখস।—অনন্তবাবু বলে উঠলেন।

৭

সকাল সাতটা। কুয়াশার চাদরে ঢাকা লেহ শহর। এখনও জেগে ওঠেনি।

আমরা স্টার্ট করে দিয়েছি। বুলেট-প্রুফ মিলিটারি ভ্যানের পিছনে আমরা চারজন—পট্টনায়েক, মুক্তান, মামা এবং আমি। অনন্ত সরখেল মামার হাতে পায়ে ধরাধরি করেছিলেন। মামা রাজি হননি। আপাতত তিনি মিলিটারি জিম্মায়। বলা তো যায় না, হয়তো ওনাকেই কিডন্যাপ করল।

বরফ-কনকনে ঝোড়ো বাতাস, সামান্য ছোঁয়াতে শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। ভ্যানের সবক'টা কাচ তোলা। তবু ফাঁকফোঁকর দিয়ে ঢুকছে।

পাহাড় বেয়ে এখন সূর্য উঠেছে। পাহাড়ে-পাহাড়ে শুরু হয়ে গেছে রঙের খেলা। কিন্তু প্রকৃতিকে উপভোগ করার মতো মানসিক অবস্থা নেই। আমরা সবাই উত্তেজনা এবং আশঙ্কায় টানটান। কী ঘটতে চলেছে একটু পরে?

মুক্তান বললেন,—ডক্টর মুখার্জি আপনি কি মনে করেছেন, পুরোটাই মানুষের কাণ্ড?

—হ্যাঁ, গতকাল যেখানে আমরা গা-ঢাকা দিয়েছিলাম, সেখান থেকে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই কয়েকজনকে গুম্ফায় ঢুকতে এবং বেরুতে দেখেছি, তাদের ফোটো তুলেছি। আজ বিকেলে প্রিন্ট পাব। তখন হয়তো জানার কিছুই বাকি থাকবে না, তবুও আমাদের ডকুমেন্ট হিসেবে...একটা কথা, আপনাকে যা বলেছিলাম, সেইরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন তো?

—নিশ্চয়ই। সেইসঙ্গে এটাও বলেছি, আমি অর্ডার না দেওয়া পর্যন্ত যেন ফায়ারিং না হয়। আপনি কি অলৌকিক কিছু দেখার প্রত্যাশা করেছেন?

—করছি। আমার মনে হচ্ছে, প্রতিপক্ষ যখন দেখবে তারা চারদিক থেকে ঘেরাও, তখন বাঁচার জন্যে চেষ্টা তারা করবেই।

—তাম্পু গুম্ভা কি ওদের ঘাঁটি?

—হ্যাঁ। ওখান থেকেই সমস্ত অ্যাকশন হয়েছে বা হচ্ছে।

—তার মানে, 'লামা'-রা বা তাদের শিষ্যরা সব ফেক?

—একদম তাই। অরিজিন্যালদের হয়তো মেরেই ফেলা হয়েছে।

এক দিকে আকাশছোঁয়া পর্বত। অন্য দিকে অতলস্পর্শী খাদ। নির্জন পাহাড়ে শুধু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নি:সঙ্গ এঞ্জিনের শব্দ।

বসে আছি আমরা। চুপচাপ। মুক্তান বাইরের দিকে তাকিয়ে। পট্টনায়েক, মামা জোরে-জোরে সিগারেট টানছেন। আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত। আর একটু পরেই—

—টুকলু, একটা গান হোক না! গতবারের মতন!

মামা বলে কী, এখন গান?

ঠিক সেই সময় আমাদের ভ্যান দাঁড়িয়ে পড়ল। মামা বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন,—এখানে নয়। একটু এগিয়ে চলুন, পাশের জমিতে নামব। গুম্ভার কাছাকাছি পৌঁছোতে হবে।

এবড়ে-খেবড়ো পাথুরে জমি। গাড়ি টলমল করতে করতে এগোচ্ছে। সামনের সিট ধরে আছি। মামা কিছু বললেন মুক্তানকে। উনি সঙ্গে-সঙ্গে ওয়ারলেস অন করলেন। নীচু গলায় কাউকে অর্ডার দিচ্ছেন।

ভ্যান থেমে গেছে। প্রায় চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে তাম্পু গুম্ভা।

গুম্ভায় ঢোকার দরজা বন্ধ। কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই।

বাঁ-দিকে পরিত্যক্ত মিংথুলা গাঁয়ের কুঠিগুলো। সেদিকেই তাকিয়ে আছেন পট্টনায়েক। হঠাৎ উত্তেজিতকণ্ঠে বলে উঠলেন,—ডক্টর মুখার্জি! দেখুন, দেখুন!

আমরাও চমকে উঠেছি, আগে তো চোখে পড়েনি। ওগুলো কী! হা-হা করে খোলা বাড়িগুলোর কয়েকটার মেঝেতে মুখ বের করে আছে মোটা-মোটা চিমনির মাথা। অল্প-অল্প ধোঁয়াও বেরোচ্ছে, সেখান থেকে।

মামা বললেন,—আমি আগেই দেখেছি।

মুক্তান নেমে পড়লেন পোর্টেবল লাউড স্পিকার হাতে। ঠিক এই সময় সবিস্ময়ে দেখলাম, চারদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে পিলপিল করে নেমে আসছে সশস্ত্র ফৌজ।

ওরা ভারতীয় সেনা। মেজরের ব্যাটেলিয়ন। যাক, আমরা তা হলে অরক্ষিত নই।

গুম্ভাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে ফায়ারিং-রেঞ্জের পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফৌজ। তার পরেই মেজর মুক্তান কেটে-কেটে ঘোষণা করলেন লাউড স্পিকারে—

'তাম্পু গুম্ভাবাসীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অবিলম্বে তারা নি:শর্ত আত্মসমর্পণ করুন। কোনওরকম চালাকির চেষ্টা করলে সেটা আত্মহত্যার সামিল হবে। আমাদের ফৌজ আপনাদের ঘিরে ফেলেছে।'

ইংরেজি, হিন্দি আর লাদাখিতে পরপর তিনবার বললেন।

কোনও উত্তর এল না। তুষাররাজ্যে আমরা দম আটকে দাঁড়িয়ে।

সময় পার হয়ে যাচ্ছে। জগুমামা ইশারা করলেন মুক্তানকে। সঙ্গে সঙ্গে আবার স্পিকারের সুইচ 'অন' করলেন মেজর। বললেন—

'আমরা আর তিন মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে নির্দেশ পালিত না হলে আমরা পরবর্তী অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব।'

এবারেও নি:শব্দ।

এক, দুই, তিন, চার...

হঠাৎ বিস্ময়ের ধাক্কায় কেঁপে উঠলাম। আকাশে দৈববাণীর মতোই বেজে উঠেছে জলদগম্ভীর কণ্ঠ। নিখুঁত ইংরেজিতে শোনা যাচ্ছে।

'তোমরা মুর্খ, তোমরা ধর্মের উপর হাত তুলেছ। এ দুষ্কর্মের শাস্তি তোমাদের পেতে হবে।...'

মুক্তানের সামলে নিতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তার পরেই ফের সরব হল আমাদের লাউডস্পিকার—

'দোষী-নির্দোষীর বিচার আইনের পথে হবে। এখনই দরজা খুলুন। আমরা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এনেছি। নতুবা—'

বেশ।—মুক্তানের কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যুত্তর ভেসে এল—তবে তোমাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করো।...

পরমুহূর্তে শিরদাঁড়া দিয়ে বরফস্রোত বয়ে গেল। গুম্ভার দরজা আপনি আপনি খুলে গেছে। প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয় এসেছে পাল-পাল হিংস্র শ্বাপদ—বাঘ এবং সিংহ!

হিংস্র গর্জন করে তারা ছুটে গেল সব দিকেই। একদল তেড়ে আসছে আমাদের দিকে।

আমি...আমি কিছু ভাবতে পারছি না। তবে কি আমরা ওদের খাদ্য হতে যাচ্ছি? স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নিজের ওপর কোনও কন্ট্রোল নেই। অসাড় হয়ে আসছে শরীর। আমি, আমি কি পড়ে যাব?

না! জগুমামার বলিষ্ঠ হাতের প্রচণ্ড চাপড় এসে পড়ল আমার পিঠে।—মুক্তানকে চেঁচিয়ে বললেন, কুইক! অ্যাকশন।

দু-হাতে ভর করে বসে পড়েছি পাথুরে জমিতে। চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে আরেক অলৌকিক দৃশ্য!

বাঘ-সিংহের দল ভেদ করে জান-কবুল জওয়ানরা ছুটে যাচ্ছে গুম্ভার দিকে। আশ্চর্য, একজনও আহত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে না বাঘ-সিংহের আক্রমণ। মনে হচ্ছে যেন জন্তুদের ভেদ করে তারা ঢুকে যাচ্ছে গুম্ভায়!

ইন্দ্রজাল? অলৌকিক? নাকি দৃষ্টিভ্রম?

—মামা!

এই হ্যাঁচকায় আমাকে টেনে দাঁড় করালেন মামা। বললেন,—কিপ আপ য়োর স্পিরিট মাই ভাগ্নে! জানিস, পৃথিবীর আজ বিজ্ঞান কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে? নাথিং ভৌতিক, নাথিং অলৌকিক।

ইতিমধ্যে জওয়ানরা দলে-দলে ঢুকে গেছে গুম্ভায়। ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে বাঘ-সিংহের পাল।

এখন আবার সব নিথর, নিস্তব্ধ। মুক্তান এগিয়ে যাচ্ছেন গুম্ভার দিকে। আমরা তিনজনে দাঁড়িয়ে আছি ভ্যানের কাছে।

হঠাৎ জাওয়ানদের একটা দল বেরিয়ে এল গুম্ভার মধ্যে থেকে। এ দিকেই আসছে। বয়ে নিয়ে আসছে দুটো দেহকে! সংঘর্ষে কেউ কি আহত হল? কোনও ফায়ারিং-এর শব্দ তো শুনিনি।

তারা মুখোমুখি মেজর মুক্তানের। গ্রুপ ক্যাপ্টেন স্যালুট ঠুকে বললেন,—স্যার, এ দুজন গুম্ভার একটা ঘরে সেন্সলেস হয়ে পড়েছিল।

সামনে গিয়েই ফের চমক।

একজন মিংথুলা গাঁয়ের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সেই কিশোর—সাংহবী। আর অন্যজন? একে তো ভাবিনি।

বিজ্ঞানী গুরবচন সিং।

মামা আস্তে বললেন,—মনে হয় হাই ডোজ ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

এরপরেই শোনা গেল দলবদ্ধ বুটের শব্দহীন রাজ্যে তুমুল খট-খটা-খট | দুই সারিতে ভাগ হয়ে গুম্ভা দিয়ে বেরিয়ে আসছে সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী।

দুই সারির মধ্যে মাথা নীচু করে কিছু মানুষ। গুম্ভার বাসিন্দা। এরা আপাতত বন্দি।

মিছিলের একেবারে শেষে দেখা গেল তিনজনকে। এদেরকে আমাদের খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। একজন গুম্ভার অধ্যক্ষ রিনচেন লামা, অন্যজন সেদিনের তরুণ লামা। তৃতীয় লামার কোলে সুন্দর একটি

বুদ্ধমূর্তি, কোথায় দেখেছি ওদের? তিনজনেরই ভাবলেশহীন মুখ।

ঠক-ঠক-ঠক! স্যালুট-বুটে এসে দাঁড়ালেন জওয়ানরা। ক্যাপ্টেন উত্তেজিত। বললেন,—স্যার, ভিতরে ঢুকে আমরা অবাক। কী নেই স্যার? আশ্চর্য পাতাল শহর। ভিতরে স্যার, কাজ চলছিল। বাপস! কতরকমের যন্ত্রপাতি।

জগুমামা ঘাড় নেড়ে বললেন,—বুঝলেন এবার? ওই পাতাল পুরীর আউটলেটগুলো বেরিয়েছে মিংথুলার বাড়িগুলোর মেঝে ফুঁড়ে। আমার ধারণা সব মিলে গেছে। চলুন, এখানে কড়া মিলিটারি পাহারা থাকবে। অনেক রহস্য পরপর বেরিয়ে আসবে।

৮

বিকেল চারটে। বাইরে ডুবন্ত সূর্য। রেস্ট-হাউসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছি আমরা তিনজন। জগুমামা একটু আগে পট্টনায়েককে নিয়ে বেরিয়েছেন ফোটোর প্রিন্ট আনতে।

সবাই অপেক্ষা করছি মামার জন্যে। এমনকি 'বক্তিয়ার' খিলজি শ্রীযুক্ত অনন্ত সরখেলও মুখবন্ধ। পট্টনায়েকের কাছ থেকে সব শোনার পর শুধু একটাই মন্তব্য করেছিলেন 'হরিবোল'। বাংলা না ইংরেজি কোন অর্থে বললেন, বুঝিনি।

আজকের সকালটা ভীষণ অচেনা মনে হচ্ছে। কী অকল্পনীয় ঘটনা সত্যি-সত্যি ঘটে গেল!

দুপুর-দুপুর যখন লেহ শহরে ফিরেছি, তখন কথা বলারও শক্তি ছিল না, কিছু পেটে দিয়ে বিছানায় শরীর ফেলতেই তলিয়ে গেছি ঘুমের অতলে।

ফেরার সময় মামার সঙ্গে কথা হয়নি। আমার কথা ছেড়েই দিলাম, পট্টনায়েক, মুক্তানও ভরসা পাননি কিছু জিগ্যেস করতে। কারণ কী জানি না, এতবড় সাফল্যের পরেও মামার মুখের চেহারা হঠাৎ যেন হয়ে গেছিল জলভরা মেঘের মতো থমথমে। চুপচাপ মামা তাকিয়েছিলেন বাইরের দিকে।

দরজা খুলে গেল। জগুমামা আর পট্টনায়েক ঢুকলেন। ঠিক ওঁদের পিছনেই গোলাম নবী। হাতে কফির ট্রে। চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা ও খুশির ছাপ।

কফিতে বেশ লম্বা চুমুক দিলেন জগুমামা। সবার দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন,—আপনারা শুনতে চান তো, না কি?

—কী যে বলেন! আমরা কতক্ষণ শ্বাস চেপে বসে আছি। এ যেন খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। বাড়ির লোক বলছে, আজ খাবে তো?...আর পারছি না সায়েব, বলে ফেলুন।

জগুমামা একটু হাসলেন। একটা লম্বা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন,—দেখুন, বোঝার সুবিধের জন্যে আমি পুরো ব্যাপারটাকে তিনটে অংশে ভাগ করছি। এক, অলৌকিক দেব-দেবী ও বাঘ-সিংহ রহস্য। দুই, এই রহস্য সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য। তিন, রহস্যের নাটের গুরু কারা? এটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, ওই তিন লামা হচ্ছে কিং-পিন। ওরা আসলে কারা? ঠিক আছে?

আমরা ঘাড় নাড়লাম। জগুমামা বলতে শুরু করলেন।

প্রকাশের কথা আমি টেপ করে রাখি এবং সেই রাতে বারবার চালিয়ে শুনি। আমার একটা ব্যাপারে খটকা লাগে। প্রকাশ বলেছিল, বাঘ-সিংহ হামলা করেছে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর। কিন্তু একজনও একটুও জখমও হয়নি। অন্যদিকে প্রকাশের বন্ধুরা শুট করেও একটাকেও মারতে পারেনি।

ওই দিন দুপুরে আমরা যাই মিংথুলা গাঁয়ের বাসিন্দা সাংহবীর কাছে। তার কথা থেকে একটা ব্যাপার জানা গেল, দেবতারা কিছু দূরত্বে থাকতেন। পরিষ্কার দেখা যেত, কিন্তু এগোলেও তাঁদের ছোঁয়া যেত না। তারপর মিলিয়ে যেতেন দেবতারা। কোথায় যেতেন? মানুষ হলে তাদের ঠিক ট্রেস করা যেত। তা হলে ওরা মানুষ নয়। তবে? রহস্যের গিঁট পাকিয়েছে কোথায়?

মামা থামলেন। তারপর বললেন,—ঠিক সেই সময় হঠাৎ পরোক্ষভাবে সাহায্য পাই আমার এই কিশোর অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছ থেকে। ঘুমন্ত টুকলুর বিছানার পাশে রাখা ছিল বিদেশি কমিকস। এমনিই একটু উলটেপালটে দেখছিলাম। আর ওই কমিকসের বই থেকেই অদ্ভুতভাবে পেয়ে গেলাম রহস্যের কিনারা।

—কমিকসের বই থেকে!

—হ্যাঁ, ওই কমিকসটা ছিল কল্পবিজ্ঞানের। একটাই পড়লাম। ভিনগ্রহের বাসিন্দারা পৃথিবীতে আসছে, মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু সশরীরে আসছে না! পৃথিবীতে এসে পৌঁছোচ্ছে তাদের ত্রিমাত্রিক ছবি বা থ্রি ডাইমেনশনাল ইমেজ।

ঠিক তখনই মাথায় স্পার্ক দিল, আরে, তাই তো! এখানেও কি ওই ভেলকি চলছে? কারণ শুধু কল্পবিজ্ঞানে নয়, বাস্তবেও ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে অনেকদিন ধরে। যদ্দুর মনে পড়ছে বোধহয় চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী গ্যাবর প্রথম বলেছিলেন ত্রিমাত্রিক ছবি সম্বন্ধে। বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছিল হলোগ্র্যাফি। এরপর হলোগ্র্যাফি নিয়ে রিসার্চ হয়েছে এবং হচ্ছে।

—স্যার, একটু খুলে বলবেন? মানে...ইয়ে...

—বলছি, বলছি। নিশ্চয়ই জানেন যে-কোনও সাধারণ ছবি সবই দ্বিমাত্রিক। সিনেমায় যে মুভি দেখি, সেও তাই। অর্থাৎ লম্বা পাব, চওড়া পাব। কিন্তু পাব না তার ব্যাস। কিন্তু ত্রিমাত্রিক ছবিতে পাওয়া যাবে

তিনটেই। এই মুহূর্তে হলোগ্র্যাফিক ক্যামেরায় যদি আপনার পোজের একখানা ছবি তুলে রাখি এবং একটু পরে তাকে প্রোজেক্ট করি, দেখা যাবে, অবিকল আরেকটা অনন্তবাবু চোখ গোল করে বসে আছেন।

—আরিব্বাস! স্যার এবার মেকানিজমটা, মানে কীভাবে—?

—হ্যাঁ, তবে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ জটিল। অর্ডিনারি ফোটোগ্র্যাফির মতো হলোগ্র্যাফির ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে নির্মিত ধাতুর প্লেট ব্যবহার করা হয়, যাকে বলে হলোগ্র্যাফি-প্লেট । একরঙা লেজার রশ্মিকে ব্যবহার করা হয় ফোটো তুলতে। সাধারণ আলো চলবে না। হলোগ্র্যাফি-প্লেটে ছবিটা গাঁথা হয়ে থাকে। পরে যখন ইচ্ছে তাকে প্রোজেক্ট করা হয়। পুরো অপারেশনটা হয় কম্পিউটারের সাহায্যে।

—এই হলোগ্র্যাফির ছবি কি সচল করা যায় সিনেমার মতো?

—তাই তো করা হয়েছে। মনে করে দ্যাখ, আমরা যেদিন দুর্ঘটনার জায়গায় যাই, সেদিন হলোগ্র্যাফির একটা প্লেট আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমার পকেটে ঢোকাতে তুই দেখেওছিলি। লাদাখ রোডে মিংথুলার দুদিকে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত ওই প্লেট আর খুদে ক্যামেরা বসানো। পট্টনায়েক আর আমি যেদিন ডুব মেরেছিলাম, সেদিন দেখেছি সড়কের দু-পাশেই ওই ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারছিস—

গুরবচন, লুথরা, স্বপন বিশ্বাস যাদের দু-দুবার দেখে অনন্তবাবু জ্ঞান হারালেন, পুরোটাই হলোগ্র্যাফির ভেল্কি। কিংবা ওই বাঘ-সিংহের পাল বা দেব-দেবীদের আবির্ভাব সবই লেসার রশ্মির কারিকুরি। তাইতো?

—রাইট।

—এসব পুরো কন্ট্রোল করা হত তাম্পু গুম্ভা থেকে?

—রাইট। ওটা ছিল এদের মেন স্টেশন।

—সেটা তুমি বুঝলে কী করে?

—ওটা হচ্ছে মিস্ট্রির সেকেন্ড ভাগ। যে-কোনও বুদ্ধিমান মানুষ গুম্ভা ও লামাদের সন্দেহ করবে। ধর্মবিশ্বাসীদের কথা অবশ্য আলাদা। কারণ জনহীন বরফরাজ্যে মানুষ বলতে তারাই ছিল। গ্রামবাসীরা আগেই চম্পট দিয়েছে। এই সন্দেহ যাচাই করার জন্যে সেদিন গেছিলাম তাম্পু গুম্ভায়। আমার আগেই চোখে পড়েছিল মিংথুলার পরিত্যক্ত কুঠিগুলোর মেঝে থেকে মুখ উঁচানো চিমনিগুলোকে। এর মানে নিশ্চয়ই মাটির নীচে কিছু রয়েছে। গুম্ভায় যখন ঢুকলাম, টের পেলাম মেঝেতে হালকা কাঁপুনি। কানে এল চাপা গোঁ-গোঁ শব্দ! নিশ্চয়ই মাটির নীচে তাহলে কিছু চলছে। আর শব্দকে চাপা দেবার জন্যে তখন স্টিরিয়োতে বাজছিল স্তোত্রধ্বনি। হয়তো তখনও এমন কোনও জরুরি কাজ চলছিল, যা আমরা হঠাৎ এসে পড়লেও বন্ধ করা যায়নি। ওই দিনই পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে বিশেষ কিছু মানুষকে ওখানে ঢুকতে বেরোতে দেখি।

তাদের ফোটোও তুলে এনেছি। তবে ডেফিনিট প্রুফ আমার হাতে এসে গেল গুম্ভায় অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে।

—হোঁচট খেয়ে!

—হ্যাঁ। সেদিন গুম্ভায় কাঠের আসনে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেছিলাম। আসলে আসনটার পাশে ইংরেজিতে টাইপ করা একটা ফুলস্কেপ কাগজ পড়ে ছিল। ওটাকে হাতাবার জন্যেই আমায় ভান করতে হয়েছিল। কাগজটায় কী লেখা ছিল জানেন?

কী?

—পরমানুতত্ত্বের কিছু জটিল অঙ্ক। সম্ভবত ভিতর থেকে হাওয়ার উড়ে এসেছিল কাগজটা। কাগজটা পাবার সঙ্গে-সঙ্গে গুম্ভার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শুধু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর হলাম না, বুঝে ফেললাম কেন ওইরকম জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

—পারমানবিক কেন্দ্র!

—ইয়েস ভাগ্নে। ভেবে দ্যাখ। মানচিত্রে মিংথুলার অবস্থান। কী স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট। পাঁচ-পাঁচটা দেশের সীমানা নাগালের মধ্যে। কোনও সুপার পাওয়ার যদি ওখানে গোপন ঘাঁটি বানাতে পারে, তার ভবিষ্যৎ ভাবতে পারছিস?

—ভবিষ্যৎ!

—হ্যাঁ। নিজের দেশ থেকে কয়েকটা বোতাম টিপে ওরা এই পাঁচটা দেশকে মুছে দিতে পারে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। সেই ভয়ংকর কাজ শুরু করেছিল ওরা। লোকাল কিছু লোভী মানুষকে টাকায় বশ করে। হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে হয়েও যেত, যদি না—

—যদি না?

—যদি না মুক্তানসায়েবের ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা সেদিন দেখে ফেলত। প্রকাশের জবানবন্দিতে শুনেছেন, ওরা সেদিন সময়ের আগেই রওনা হয়েছিল লেহ ছেড়ে। আর সেটাই হল বিভ্রাট। মিংথুলাবাসীরা আগেই পালিয়ে গেছে। সুতরাং ওখানে লামারা ছাড়া কোনও মানুষ থাকার কথা নয়। কিন্তু জওয়ানরা সেদিন ওখানে কিছু নতুন মানুষকে দেখে ফেলে। সঙ্গে-সঙ্গে ওরা বুঝতে পারে, আর চাপা দেওয়া যাবে না। খবর ছড়িয়ে যাবে। একমাত্র উপায়, ওদের নি:শব্দে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। অতএব বাঘ-সিংহের ভেলকি দেখানো হল। ট্রাক পড়ল খাদে। প্রকাশ কাকতালীয়ভাবে, বেঁচে গেল। ওরা জানতে পারলে অবশ্য প্রকাশকে ছাড়ত না।

পট্টনায়েক হঠাৎ ফেটে পড়লেন,—নৃশংস! পৈশাচিক! এদের প্রত্যেকের কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত। ডক্টর মুখার্জি, লামারা কারা?

—সুপার পাওয়ারের প্রতিনিধি এবং এক দিশি চর। এবারে ঘটনার শেষ অংশে আসছি।

এক মিনিট স্যার!—হঠাৎ মামার পায়েই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন অনন্ত সরখেল। বললেন, পায়ের ধুলো দিন স্যার। শুনেছিলুম বিজ্ঞানীরা হন কাছাখোলা, আপনি যে স্যার চাঁছাছোলা! মানে একেবারে ছাল ছাড়িয়ে—

—আহা, করছেন কী? থামুন, থামুন, বাকিটা বলতে দিন।

—হ্যাঁ ডক্টর মুখার্জি। প্লিজ শেষ করুন।

প্রথমেই বলি, এই রহস্যের অপরাধীকে খুঁজে বের করতে তার দেহের একটা অস্বাভাবিকতা আমায় খুব সাহায্য করেছে। কলকাতাতে আমার প্রথম দেখা হল বিজ্ঞানীবান্ধবী ক্লারা আর তার স্বামী টমাস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে। সেদিনই এল পট্টনায়েকের ট্রাঙ্ককল।

গ্র্যান্ড হোটেলে ওদের সঙ্গে আড্ডার সময়ে কোলে একটা ডলপুতুলে হাত বুলোতে বুলোতে ক্লারা আমায় জানিয়েছিল তাদের ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য। আমিই তাদের কাশ্মীর বেড়ানোর পরামর্শ দিই।

তারপর কী হল টুকলু তোর নিশ্চয়ই মনে পড়ছে, প্লেনে একটি লোকের দিকে আমি তোর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। লোকটির ডান হাতের কড়ে আঙুলটি ছিল জোড়া। শ্রীনগর থেকে কারগিলে যাওয়ার বাসে আবার দেখলাম দুই লামাকে, যাদের একজনের কড়ে আঙুল ছিল জোড়া, অন্যজনের কোলে ছিল ছোট বুদ্ধমূর্তি। আপনারা তাম্পু গুম্ভার প্রধান লামাকে ঠিকঠাক লক্ষ্য করেছেন, দেখেছেন? তারও কড়ে আঙুল জোড়া।

লেহর মেন মার্কেটের কাছে ক'দিন আগে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছিল অ্যান্ডারসন দম্পতির সঙ্গে। পরদিনই তারা নাকি দেশে ফিরে যাচ্ছে। সেদিন সান্ধ্য আড্ডায় তোরা আড্ডা মারছিলি। হ্যাঁ, আমিও। তবে গল্প করতে-করতে আমি একটা ভেরি স্পেশাল মার্ক মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। সেটা হল—

—কড়ে আঙুল জোড়া। তার মানে—তার মানে—

—হ্যাঁরে, টুকলু। মানুষের মন বড় অদ্ভুত। উপর-উপর দেখে তার ভিতরের অন্ধকারের একটুও আভাস পাওয়া যায় না। বাইরে অমন খোলা-মেলা মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে...কী যে বলব।

মামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, তাঁর গলা ভারী হয়ে এসেছে। আস্তে-আস্তে বললেন,—ওই তরুণ লামাটি কে বুঝেছিস? মেঘালয় হোটেলের স্বপন বিশ্বাস। ওদের ওই ষড়যন্ত্রের একনম্বর এজেন্ট। আসলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আগেই শুরু হয়েছিল। অ্যান্ডারসনরা দুজনে এসেছিল পরমাণুকেন্দ্র সরজমিনে দেখে যেতে। স্বপন বিশ্বাস ছিল ওদের গাইড।

—আচ্ছা মামা, ডলপুতুল আর মূর্তি দুটো কি এক?

হ্যাঁ।—মামা বললেন,—হালোগ্র্যাফি ক্যামেরার খোলস। কখনও ফাঁপা ডলপুতুলে ঢুকিয়ে রাখছে। কখনও বুদ্ধমূর্তিতে। আমি নিশ্চিত, ওই ক্যামেরায় আমাদেরও ত্রিমাত্রিক ছবি তোলা আছে।

—মামা, একটা কথা বলব? ক্লারার কথা ভেবেই কি আজ সকালে তুমি গম্ভীর হয়ে গেছিলে?—আমি আবার শুধোই।

—হ্যাঁরে। ভালো লাগছিল না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ, সেই কথাটা ভুল হয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার বাড়ি। একঘর রুদ্ধশ্বাস শ্রোতার সামনে লাদাখ কাহিনি আমাকেই বলতে হচ্ছিল। বেশ একটা গর্ববোধ করছিলাম। এখন ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, কী সাংঘাতিক সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছি।

অনন্ত সরখেলও হাজির। চোখেমুখে হিরো-হিরো ভাব ফুটিয়ে এবং মুখে সুক্ষ্ম হাসি ঝুলিয়ে একের পর এক সিঙারা সাবাড় করে যাচ্ছেন।

—তবে একটা ব্যাপারে মামা, আমার একটা প্রশ্ন থেকে গেছে।

—বলে ফ্যাল।

—গুরবচন-লুথরার ভূমিকাটা আসলে কী?

—হুঁ। তোরাও জিগ্যেস করিসনি। তাই টপকে অন্য জায়গায় চলে গেছি। শোন, ওরাও গেছিল একই উদ্দেশ্য নিয়ে। পারমাণবিক কেন্দ্র বসাতে। গুরবচন ভারত সরকারের কাছে পেশ করেছিল তার পরিকল্পনা। ততে সে লিখেছিল, ওইখানে কেন্দ্র বসাতে পারলে সরকার অর্থনেতিক রাজনৈতিক দুদিক দিয়ে লাভবান হবে। প্রথমত পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগিয়ে পাহাড়ের ভিতরের মূল্যবান সব খনিজ বের করা যাবে। দ্বিতীয়ত ওই জায়গায় পাওয়ার স্টেশন বসানো মানে প্রতিবেশী দেশরা সমঝে চলবে। লুথরা একজন সরকারি অফিসার, গুরবচনের পরিকল্পনা আদৌ বাস্তব সম্মত কি না সেটা দেখতে গেছিল ওর সঙ্গে।

—তারপর?

—সব গেল ওলটপালট হয়ে। ওখানে ততদিনে পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গেছে। স্বপন বিশ্বাসের সঙ্গে গুরবচনের আলাপ হল লেহগামী বাসে। কথায় কথায় স্বপন বুঝে ফেলল গুরবচনের উদ্দেশ্য। সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক করে গুরবচনকে গুম করতে হবে। তাকে থামানোর একমাত্র পন্থা। গুলতাপ্পি মেরে গুরবচনকে আসতে বলে গুম্ভায়। ওদিকে লুথরার কাছে পাঠায় তুলোট কাগজে শাসানি! 'পালাও এ দেবরাজ্য ছেড়ে, নতুবা

তোমাকেই পালাতে হবে দুনিয়া ছেড়ে'। লুথরা অতি ভিতু মানুষ। গুরবচন যখন নিখোঁজ, সে নি:শব্দে কেটে পড়ে লাদাখ থেকে। গুরবচন তখন গুম্ভায় বন্দি।

—আমাদের গতিবিধি বা ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ওরা বোঝেনি?

—বোঝেনি আবার? হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিল। নইলে সেদিন সাংহবীর দোকানে কে আড়াল থেকে আমাদের ফলো করছিল? মনে নেই। অনন্তবাবু ল্যাং খেয়ে চিৎপাত হলেন। সাংহবীকেও গুম করা হয়েছিল একই উদ্দেশ্যে। ওর মুখ বন্ধ করার জন্যে। কিন্তু ওরা বিলক্ষণ খবর পেয়ে গেছিল, আমরা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ইনভেস্টিগেশনে এসেছি। সুতরাং আমাদের কিছু হলে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যাবে। সরাসরি আমাদের অ্যাটাক করার সাহস পায়নি।

হঠাৎ নাটকীয়ভাবে অনন্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন, দু-হাত সামনে প্রসারিত করে মাথা ঝাঁকিয়ে গেয়ে উঠলেন, —বল বল বল সবে, শত বীণা, বেণু রবে, ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে...।

আমরা হতভম্ব। তবে এই প্রথম অনন্ত সরখেল নির্ভুল কথায় ও সুরে গান গাইলেন।

শারদীয়া ১৯৮৬

আলোয় সেদিন অন্ধকার

১

ক্ষুব্ধকণ্ঠে অনন্ত সরখেল বললেন,—আপনি যে এমন সেলফিশ কাণ্ড করবেন স্যার, ভাবতেও পারিনি।

—কেন? কী করলাম?

—'স্রেফ বেড়াতে যাচ্ছি' বলে বেতলা চলে গেলেন, পরে শুনলুম সাংঘাতিক সব রহস্য ভেদ করে এসেছেন।

টুং-টাং-টুং! কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলতে সামনে এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক। ধূসর স্যুট, লাল টাই, রিমলেস চশমা। সঙ্গে ছোট্ট ফুটফুটে একটি মেয়ে।

—এক্সকিউজ মি। এখানেই তো। জগু, স্যরি জগবন্ধু থাকে?

—হ্যাঁ, আপনিই কি সকালে ফোন করেছিলেন?

—রাইট। আমি জয়ন্ত দত্ত।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন। মামা—

ডাকবার আগেই জগুমামা দরজার কাছে এসে পড়েছেন। কয়েক মুহূর্ত দুজনে নিষ্পলক দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তার পরই মামা বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন,—একদম ভোল পালটে ফেলেছিস।

—বা:, বারে জগু বা:। নিজে কী ছিলি, দেখেছিস একবার। কুড়ি বছর আগের গ্রুপ ফোটোটা বের করে দ্যাখ।

—আরিব্বাস! সেই ফোটো তোর কাছে এখনও রেখেছিস জন্তু! মামণি, নিশ্চয়ই তোর মেয়ে? কবে বিয়ে করলি?

—উফ, দাঁড়া! একেবারে রকেট চালিয়ে দিলি যে, আগে বসতে দিবি, নাকি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই সব হিসেব শেষ করবি?

—স্যরি! আয়, আয়। ভেতরে আয়।

রোববারের সকাল দারুণ জমজমাট। অনন্ত সরখেল রাঁচি থেকে কলকাতায় এসেছেন। অতএব হাজির। এসেছেন জয়ন্ত দত্ত, মামার বিশ বছরের বন্ধু।

মাকে চায়ের কথা বলে ফিরে এসে দেখি, জন্তু আর জগু পুরোনো দিনের গপ্পে জমে গেছেন। পিকলুটাও বইপত্তর ফেলে উঠে এসেছে। ও আর অনন্তবাবু দুজনে মিলে পড়েছে ছোটটাকে নিয়ে।

—তোমার নাম কী?

—মৌসুমী।

—তুমি ম্যাজিক দেখবে? এই পয়সাটা কত?

—ফিফটি পয়সা।

—ফাইন। এটা আমি গিলে ফেলব, কেমন? তারপর—হ্যাঁ, তোমার পেট থেকে বেরুবে! দ্যাখো, দ্যাখো...

আধুলিটা দু-আঙুলে নাড়তে-নাড়তে চোখ মুখের ভয়ানক চেহারা করলেন অনন্ত সরখেল।

—মৌসুমী, দ্যাখো, হিং টিং ছট! গিলি গিলি আব্বা! গিললাম—গিলি—গিললাম—য-যা:! ইউম! গিলেই ফেললাম।

মৌসুমী তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অনন্তবাবুর দিকে।

টুং—আঙুলের ফাঁক গলে আধুলিটা পড়েছে মাটিতে।

সঙ্গে-সঙ্গে মৌসুমি হাততালি দিয়ে উঠেছে,—এমা! ফেল-ফেল। কট হয়ে গেছ।

অনন্ত সরখেল পুরো ধসে গেছেন। বিড়বিড় করে বললেন,—আসলে প্র্যাকটিস নেই। নইলে জাদুসম্রাট একদিন আমায় বলেছিলেন...যাকগে!

তারপর উদাস হয়ে আধুলিটা পকেটে পুরে টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে ওলটাতে লাগলেন। পিকলুটা মৌসুমীকে বগলদাবা করে নিয়ে গেল ভেতরে। মার কাছে। ওর এই এক স্বভাব, বাচ্চা পেলেই হামলে পড়ে। আমি এবার কান দিলাম দুই বন্ধুর আড্ডায়।

মামা বলছেন,—ফিরে জীবেশের সঙ্গে দেখা করেছিলি?

হ্যাঁ রে। জীবেশ সায়েন্স কলেজে পার্টটাইম লেকচারার। তা ছাড়া নিজের বাড়িতে ল্যাবও করেছে। আমি ফেরার পর তোর খবর না পেয়ে ওকেই প্রথমে খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু দেখা হওয়ার পর মেজাজ চটকে গেল।

—কেন?

—এতকাল পরে প্রথম দেখা। অথচ দেখা হতে কী বলল, জানিস? বলল, কী চাঁদু, আমেরিকা থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এলে যে? সুবিধে হল না? কী হাতি-ঘোড়া শিখলে? বুঝলি জগু, কলেজের রেষারেষিটা ও এখনও ভোলেনি।

—ধ্যুৎ! তোর সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। জ্যাঠাবাবু কেমন আছেন?

—খুব ভালো। ওল্ড ম্যান স্টিল ব্যাটিং কনফিডেন্টলি। আমি আসায় খুব খুশি হয়েছেন। আর মৌসুমীকে ছাড়া তো ওনার একদণ্ড চলে না। সম্পত্তিগুলোও বারো ভূতে খাচ্ছিল।

—সে তো হবেই। এই বয়সে একেবারে একা। ব্যাবসা তো কিছু কম নয়। তা তোদের ওপর পুরোনো রাগ বা অভিমান কিছু—

—একটু তো ছিলই। তবে সেসব প্রথমদিনেই কেটে গেছে। আমাকে জড়িয়ে বুড়োর সে কী কান্না!...যাক, আজ উঠি। চলে আয় একদিন। বাড়িটা মনে আছে তো? ওখানেই একটা ছোটখাটো ল্যাব করেছি।

—জ্যাঠাবাবু?

—পরশু নর্থ বেঙ্গল গেছেন। বিজনবাড়ি এলাকায় আমাদের চা বাগানে। গত দু-বছর যা গণ্ডগোল চলছিল। এখন একটু শান্ত হতেই ছুটেছেন।

—একা গেলেন?

—না, জ্যাঠাবাবুর এক বন্ধুর ছেলে, জলধর সেন সঙ্গে আছে। বছর কয়েক সে ওনার পার্সোনাল সেক্রেটারির কাজ করছে। ওকে জগু আজ তাহলে উঠি।

জয়ন্ত দত্ত আর মৌসুমীকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সবে বসেছি, টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো!

—হ্যালো। ডক্টর মুখার্জি আছেন?

—আপনি কে বলছেন?

—সত্যসাধন পট্টনায়েক।

সাড়ে তিনটে বাজে। মামা শোবার ঘরে। কাগজ পড়ছেন। গুটিগুটি গিয়ে খাটে বসলাম।

—মামা, এই জয়ন্ত দত্তর কথা কখনও তো তোমার কাছে শুনিনি।

শুনবি কী করে?—মামা কাগজ বন্ধ করে হাসলেন, ও তো এদেশে ছিল না।

—ছিল না?

—না। কুড়ি বছর আগে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। মামা বললেন,—কলেজে পড়তে-পড়তে জয়ন্ত, জীবেশ দুজনের সঙ্গেই আমার আলাপ। তা থেকে দারুণ বন্ধুত্ব! অধ্যাপকরা আমাদের নাম দিয়ে দিলেন জে কিউব। তিনজনেরই নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। কিন্তু আবার পড়াশোনায় ছিল তেমনই কম্পিটিশন। বিএসসি-তে কলেজ থেকে জয়ন্ত হল প্রথম, জীবেশ দ্বিতীয় আর আমি তৃতীয়। দু-এক নম্বরের ফারাক। ভরতি হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেও জে কিউব-এর রাজত্ব। কিন্তু এমএসসি-র মাঝামাঝি জয়ন্ত হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল। ছাড়া-ছাড়া ভাব। ঠিকমতো আসে না, ক্লাস করে না। আমাদের কানে এল, ও খারাপ খপ্পরে পড়েছে। ছেলেবেলায় ওর বাপ-মা মারা গেছিলেন। নি:সন্তান জ্যাঠাবাবুর কাছে মানুষ। জ্যাঠার নয়নের মণি। জ্যাঠা শিবশঙ্কর দত্ত, অগাধ সম্পত্তির মালিক। আমরা দুজনে একদিন ওকে খুব বোঝালাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বাধ্য হয়ে গেলাম ওদের হাতিবাগানের বাড়িতে জ্যাঠাবাবুর কাছে। সব শুনে তিনিও খুব বকাঝকা করলেন।

—তারপর?

তারপর, দেখা হল আজকে। কুড়ি বছর পরে। ও: কীভাবে যে সময় চলে যায়! ওর কাছেই শুনলাম, আমেরিকায় গিয়ে ওদেশি মেয়ে বিয়ে করেছিল। বউ মারা যেতে একা লাগতে লাগে। তখন তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফিরে আসে আবার কলকাতায়। তাও নাকি বছর খানেক হয়ে গেছে। এতদিন নাকি আমার ঠিকানা পায়নি, তাই দেখা করতে পারেনি।

বাইরে জিপের হর্ন! পট্টনায়েক এসে গেছেন।

একটানা গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে ছুটে চলেছে বাস। উঠছে পাহাড়ের বুক চিরে। দুদিকে সবুজ বনে ঢাকা পাহাড় আর গভীর খাদ। সামনেও আদিগন্ত পাহাড়ের ঢেউ। রঙিন রোদ্দুরে জ্বলজ্বল করছে।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমার দার্জিলিং আসা। আগে এসেছিলাম বাবা-মার সঙ্গে। প্রায় বছর দশেক আগে।

এবার অবশ্য বেড়ানোর প্রস্তুতি ছাড়াই আমাদের দার্জিলিং যাত্রা। আর অদ্ভুত এক রহস্যের কিনারা করতে।

গত পরশু পট্টনায়েকের কাছ থেকে পুরোটা শোনার পর জগুমামা 'না' করতে পারেননি।

পট্টনায়েক বলেছিলেন, সুবাস ঘিসিং যেদিন 'দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ' মেনে কলকাতায় ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে সই করেন, সেদিনই দিল্লির গোয়েন্দা দপ্তরে হঠাৎ গোপন খবর আসে—দার্জিলিং মহকুমার বিজনবাড়ি এলাকায় রহস্যজনকভাবে মারা গেছে প্রায় পনেরোজন গোর্খা। ওদের অধিকাংশই ছিল চা-বাগানের কর্মী। স্থানীয় মানুষদের মতে, এই মৃত্যু ঘটেছে এক মারাত্মক বিষাক্ত পোকার কামড়ে। পোকাগুলোর চেহারা দেখতে মশার মতো। অথচ তারা জ্বলে নেভে জোনাকির মতো।

গত দু-বছর বিজনবাড়ি ছিল উপদ্রুত এলাকা। সবে সেখানে শান্তি নেমেছে। এই সময়ে যদি এই নিরীহ বাসিন্দাদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আবার আগুন জ্বলে ওঠে, তবে সর্বনাশ!

এই রহস্যভেদ করতেই অগতির গতি ড: জগবন্ধু মুখার্জিকে তাই যেতে হচ্ছে। সিবিআই-এর আইজি পট্টনায়েকের সঙ্গে। সঙ্গে আমি আর অনন্ত সরখেল। অনন্তবাবুকে এবারে আর 'কাঁচি করা' যায়নি।

এইসব ঘটনাগুলো নিজের মনেই ভাবছি, হঠাৎ নিস্তব্ধ বাস গমগম করে উঠল রবীন্দ্রসঙ্গীতে—

আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ

তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি...

আমি পেয়েছি মোর স্থান...

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। আমাদের ঠিক পিছনের ধারের সিটে বসে এক ভদ্রলোক। চোখ বুজে তিনিই গাইছেন আপনমনে।

বাসের তালে-তালে ঝিমুচ্ছিলেন অনন্ত সরখেল। ধড়ফড় করে উঠতে গিয়েই—ঠক্কাস! সামনের সিটে সজোরে ঠুকে গেল মাথা।

ধুচ্ছাই!—কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে অনন্ত সরখেল বিড়বিড় করে উঠলেন, ষাঁড়ের মতো চিল্লিয়ে ঘুমটা দিল মাটি করে।

ভদ্রলোকের গান বেজে চলেছে,...জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান, বিস্ময়ে তাই জাগে...

অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। ফরসা টকটকে রং, তীক্ষ্ণ চোখ-নাক-মুখ, মাথায় ব্যাকব্রাশ করা পাতলা চুল, লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। সুপুরুষ চেহারা। একমনে গেয়ে চলেছেন।

শেষ করে চোখ মেললেন। সঙ্গে-সঙ্গে আমার সঙ্গে চোখাচোখি। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল,

—অপূর্ব!

থ্যাঙ্কিউ ! ভদ্রলোক হেসে বললেন, প্রকৃতির কাছে এলেই কোত্থেকে ওই বুড়ো ঋষি আমার মাথার মধ্যে এসে হাজির হন।

আপনার নাম?—অনন্ত সরখেল দুম করে বলে উঠলেন।

আচমকা প্রশ্নে ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন,—সরোজশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি?

—অনন্ত সরলেখল। তা মশায়ের কী করা হয়? কোথায় যাচ্ছেন?

—আরে মশাই, একটু থামুন। আপনি তো জেরা শুরু করে দিলেন!

এই রে। আমি তাড়াতাড়ি চোখ টিপে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। অনন্তবাবুর হেড অফিসে গোলমাল। তারপর বললাম,—আমরা মোট চারজন। আমি অর্ণব ভট্টাচার্য, সামনের সিটে বাঁ-দিকের জন আমার মামা ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি আর তার পাশে ওনার বন্ধু সত্যসাধন পট্টনায়েক। বেড়াতে যাচ্ছি। আপনি?

অনন্ত সরখেল কটমট করে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। সরোজশোভন বললেন,—আমার পেশা লোহালক্কড় নিয়ে, নেশা ঠিক তার উলটো। ব্যাবসা থেকে কিছু উপরি আমদানি হলেই বেরিয়ে পড়ি, ছুটে যাই পাহাড়ি প্রকৃতির কাছে। সারা ভারত ঘুরেছি। বাইরেও গেছি। তবে ট্যুরিস্ট স্পট আমার পছন্দ নয়। আমার পছন্দ নির্জন নিরিবিলি, যেখানে শোনা যায় প্রকৃতির গান। এই যেমন এবার যাচ্ছি সান্দাকফু। বিজনবাড়ি রিম্বিক হয়ে।

বিজনবাড়ি শুনেই খট করে উঠল। বললাম,—বাই এনি চান্স, একটা ইনফর্মেশন দিতে পারেন?

—কী?

—পাহাড়ে এমন কোনও পোকার কথা শুনেছেন কি, যারা জোনাকির মতো জ্বলে নেভে অথচ দেখতে মশার মতো খুদে! মানুষকে কামড়ায়! এমন বিষ, তাতে মারাও যায়?

—মারা যায়? জোনাকি-মশা! এত বিষ? না ভাই শুনিনি। কোন বইয়ে পড়েছিলাম এক মারাত্মক প্রজাতি, সম্ভবত অ্যানোফিলিস গ্যাম্বি ষাট সালে উড়ে গেছল আফ্রিকা থেকে ব্রাজিলে। তাদেরই কামড়ে হাজার-হাজার লোক মরেছিল। কিন্তু...কিন্তু তারা তো জ্বলে না! কেন, এমন অদ্ভুত কোনও জীবের খোঁজ পাওয়া গেছে না কি?

উত্তর দেওয়ার আগেই বাসটা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। দার্জিলিং-এর বাস টার্মিনাস।

সরোজ শোভন কিটব্যাগ কাঁধে ফেলে জিগ্যেস করলেন,—তোমরা কোথায় উঠছ?

—জানি না। মামারা যা ঠিক করবেন।

*

দরজায় দুবার টোকা। ঘনাদার বইটা রেখে উঠে বসলাম। বাব্বা, রাত আটটা বেজে গেছে।

একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে সরোজশোভন। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন,—ঘুমোচ্ছিলে না কি?

—নাহ! সে সুযোগ নেই। অনন্তবাবু একাই একশো।

—তাই বলো। আমি ভাবছিলাম, কোত্থেকে আসছেন, ওনার নাকে নির্ঘাত অ্যামপ্লিফায়ার ফিট করা আছে। বুঝলে, আজ একটা আশ্চর্য জিনিস পেয়েছি। একটা তিব্বতি ঘণ্টা। এক লেপচার কাছ থেকে কিনলাম।

—এটা? কী হয়?

—দেখাচ্ছি। আগে ওনাকে তোলো।

বারকয়েক ঠেলা দিতে অনন্তবাবু চোখ মেললেন। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন,—ধূর! এসব ছেলেমানুষি ব্যাপার!

আহা দেখুনই না!—ছোট্ট একটা ঘণ্টা তুলে দেখিয়ে সরোজ শোভন হেসে বললেন, লেপচা বলল, এই ঘণ্টার ওপর রাতে নাকি নানা আত্মা ভর করে। তখন সেই আত্মার কণ্ঠস্বর বেরোয় এই ঘণ্টার মধ্যে দিয়ে।

মুহূর্তে অনন্ত সরখেল কম্বল-টম্বল ফেলে দিয়ে টানটান।

—অ্যাঁ! তা ইয়ে...মানে টুকলু, তুমি এ খাটে চলে এসো না! না-না, আপনি ওই খাটে বসুন! আমার টুকলুকে নিয়েই যত দুশ্চিন্তা!!

সরোজশোভন খাটে বসে আলো নিভিয়ে দিলেন। ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। তারপর রহস্যময় গলায় বললেন,—তবে শুরু করি, কেমন? এক...দুই...তিন...

ঢং ঢং ঢং।

...ওঁয়া...ওঁয়া...ওঁয়া

একটি শিশু ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদছে। শব্দটা যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে।

—শুনুন দ্বিতীয় আত্মার গলা। এক...দুই...তিন...

ঢং ঢং ঢং।

উঁহুঁ...উঁহুঁ...উঁহুঁ...

ধপ্পাস। আমি লাফ দিয়ে উঠে আলো জ্বেলে দিলাম!

অনন্তবাবু! চিত হয়ে পড়েছেন। থরথর কাঁপছেন। দু-হাতে বুকের মধ্যে চেপে ধরা কোলবালিশ।

ও অনন্তবাবু, ও মশাই, দেখুন, দেখুন!—সরোজশোভন খুবই অপ্রস্তুত, আত্মাফাত্মা কিস্যু নয়, স্রেফ মুখের ভেলকি! এই দেখুন—ঘণ্টার কোণের এই ফুটো দেখছেন—

বলেই ঘণ্টা বাজিয়ে মুখ দিতে বাচ্চার কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল। অনন্ত সরখেল সামলে উঠে বসেছেন। তবে চোখ-মুখ থমথমে। আমরা হাসছি। হাসতে-হাসতেই বেরিয়ে গেলেন সরোজশোভন।

আর সেদিকে তাকিয়ে নাক-মুখ কুঁচকে অনন্ত সরখেল বলে উঠলেন,—খুব যাচ্ছে তাই লোক, বুঝলে! মানুষ খুন করতে পারে।

ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন জগুমামা আর পট্টনায়েক।

—কী হয়েছে মামা?

—কাল রাতে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে। এইমাত্র থানায় খবর এসেছে। জয়ন্তের জ্যাঠা শিবশঙ্কর দত্তের সিভিয়ার সেরিব্রাল অ্যাটাক! ডাক্তারদের ধারণা, আচমকা আতঙ্কে এরকম হয়েছে। এখন হাসপাতালে, সেন্সলেস। চল।

৩

হোটেল 'ইন্দ্রপ্রস্থ'। অভিজাত হোটেল।

রিসেপশন পেরিয়ে কাচের ঘরে ঢুকতেই ম্যানেজার শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন,—আসুন, আসুন মিস্টার প্রধান।

আমরা বসলাম। জগুমামা বললেন,—আমরা মিস্টার দত্তের ঘরটা একটু দেখতে চাই। হ্যাঁ, ঘরটা সিল করা আছে তো?

জরুর।—সুব্বা বললেন, তবে ঘর তো একটা নয় দুটো।

—মানে?

—মানে বরাবর দত্ত সাহেব আর ওনার সেক্রেটারি মিস্টার সেন এখানে এসে পাশাপাশি দুটো ঘরে থাকতেন। আজ সকাল থেকে সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সেই ঘরটাও—

কথা শেষ করার আগেই মামা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ইনস্পেকটর প্রধানের দিকে। প্রধান বললেন,—এক্সট্রিমলি সরি, স্যর, বলতে ভুলে গেছি। আজ সকাল থেকে মিস্টার সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না। কাছাকাছি সব চৌকিতে ওয়ারলেস করা হয়েছে। কোনও খবর আসেনি।

হুম!—মামার চোখ দুটো সরু। একটু থেমে বললেন,—দয়া করে চলুন, স্পটে যাই।

নিশ্চয়ই। তবে তার আগে স্যর,—ধূমায়িত কফির কাপ এগিয়ে দিলেন সুব্বা।

কফিতে চুমুক দিয়ে মামা বললেন,—আপনার হোটেলেই কি বরাবর উঠতেন দত্ত সাহেব?

—হ্যাঁ। বছর দশেক ধরে আমাদের হোটেলের চারতলার স্পেশাল স্যুইট ওনার বুকড থাকত।

—মাঝে বছর দুয়েক এসেছিলেন?

—না। তখন গোলমাল চলছিল। এবারও অবশ্য নিজে যাননি চা বাগানে। কাগজপত্র নিয়ে গেছিলেন মিস্টার সেন। গতকাল সকালে চা বাগান থেকে কয়েকজন এসেছিলেন ওনার সঙ্গে দেখা করতে।

—তখন কি উনি ঠিকঠাক ছিলেন?

—অ্যাবসলিউটলি অলরাইট। এমনকী কাল সন্ধেবেলাতেও উনি নীচে নেমেছিলেন। আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গল্প করে উপরে উঠে যান। তারপর রাত দশটা নাগাদ দত্ত সাহেবের ডিনার পাঠানো হয় উপরে। আমিও চারতলায় থাকি। দত্ত সাহেবের ঘরের বাঁ-দিকে। এগোরোটা নাগাদ অফিস বন্ধ করে উপরে উঠেছি। ঘরে ঢুকে পোশাক পালটাচ্ছি। হঠাৎ কানে এল পাশের ঘর থেকে ফিসফিস। তার পরেই দত্ত সাহেবের চিৎকার,—এ—কে? তুমি? না-না...এগিও না...এ কী।...কী চাও...?

একটু থেমে আবার সুব্বা বলেন,—এই অবধি শুনেই দরজা খুলে ছুটে গেছিলাম ওনার ঘরের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। দত্ত সাহেবের দরজা হাট করে খোলা। তার ঘরের মধ্যে...সাংঘাতিক দৃশ্য। খাটের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছেন দত্ত সাহেব। শরীরটা কুঁকড়ে গেছে, আঁখদুটা খোলা, মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছে! কোনও সেন্স ছিল না।

—মিস্টার সেন?

—উনিও আমার পিছন-পিছন ছুটে এসেছিলেন। একটু সামলে নিয়ে আমরা তখন ফোন করি থানায়, অ্যাম্বুলেন্সে।

—তার মানে কাল রাতে জলধরবাবু স্পটে ছিলেন?

—হ্যাঁ স্যর। থানায় এজাহার দিয়ে, হসপিটালে ওঁকে ভরতি করিয়ে আমাদের ফিরতে ফিরতে ভোর রাত। ঝুট বলব না, মিস্টার সেন সারাক্ষণ সঙ্গে ছিলেন। বহোত হেল্পও করেছেন। অথচ সেই লোকই আজ সকাল থেকে...। বাধ্য হয়েই পুলিশকে জানিয়েছি।

হুঁ।—কফির কাপ নামিয়ে রেখে জগুমামা বললেন, চলুন।

তালা খুলে চারতলার প্রথম সুইটে ঢুকে সবক'টা আলো জ্বেলে দিলেন প্রধান। দারুণ ওয়েল ফার্নিশড ঘর। দেওয়ালের হ্যাঙারে প্যান্ট-শার্ট ঝুলছে, ওয়াড্রোবের পাল্লা খোলা। একরাশ জামাকাপড়, তোয়ালে-টোয়ালে। এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষে চওড়া খাট। ধবধবে চাদর পাতা। চাদরটা কুঁচকানো।

বোঝা যাচ্ছে, শিবশঙ্কর দত্ত শায়িত অবস্থায় আগন্তুককে দেখে আতঙ্কে চাদর টেনেছেন। পিছনে সাদা ডিসটেম্পার করা দেওয়ালেও দু-একটা ছোপ। অর্থাৎ সরতে-সরতে শেষে দেওয়ালেও পিঠ ঘষেছেন।

হঠাৎ জগুমামা উবু হয়ে বসে পড়লেন। জিগ্যেস করলেন,—কাল কি রাতে বৃষ্টি হয়েছিল?

—হ্যাঁ স্যার।

—এই ছাপটা দেখেছেন? আস্তে-আস্তে খাট অবধি এগিয়েছে। জলকাদা মাখা। এখনই ফোটো তুলতে হবে।

তারপর উঠে দাঁড়ালেন। ড্রেসিং টেবিলের পাশে সুদৃশ্য লেখার টেবিল। দেওয়ালে আটকানো বুককেস, টেবিলের নীচে একজোড়া স্লিপার। সেদিকেই এগিয়ে গেলেন। ঝুঁকে পড়ে এটা সেটা ঘাঁটছেন।

ড্রেসিং টেবিলের উপরে একখণ্ড ভাঁজ করা কাগজ। মামা বাঁহাতে সেটাকে তুলে নিলেন। তিন লাইনের একটা চিঠি।

'শ্রীচরণেষু জ্যাঠাবাবু, আশাকরি কুশল। তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন। মৌসুমী খুব দাদু-দাদু করছে।—ইতি জয়ন্ত।'

—চিঠিটা কি কাল রাতে ছিল?

—হ্যাঁ স্যার, ওনার ভাইপোর চিঠি।—প্রধান বললেন।

হুঁ।—মামা রুমাল মুড়ে চিঠিটা বুক পকেটে ভরলেন। তারপর বললেন,—খাম? চিঠির খাম কই?

—খাম তো দেখিনি স্যার। এরকমই পড়েছিল রাতে। খাম বোধহয় ফেলে দিয়েছিলেন।

তালা খুলে ঢুকলাম পাশের ঘরে। এ ঘরটা জলধর সেনের। অনেক ছোট। সিঙ্গল বেডে পরিচ্ছন্ন বিছানা, ড্রেসিং টেবিলে টুকিটাকি জিনিসপত্র, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। আলনা থেকে তোয়ালে, দু-তিনটে প্যান্ট-শার্ট ঝুলছে।

নীচে একজোড়া নর্থস্টার, স্লিপার।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে জগুমামা। তাঁর অন্তর্ভেদী চোখদুটো সার্চলাইটের মতো ঘুরছে। কী ভেবে এগিয়ে গেলেন টেবিলের ওপর ব্রিফকেসের দিকে। একটানে খুলে ফেললেন।

—ঘরের সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?—একই কথা ফের বললেন।

আমরা স্যর, এ ঘরে আগে ঢুকিনি।—প্রধান বললেন।

ব্রিফকেস পর্ব শেষ করে মামা এগিয়ে গেলেন আলনায় ঝোলানো প্যান্ট-শার্টের দিকে। সবচেয়ে উপরের প্যান্টটার পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। উঁহু, সামান্য কিছু খুচরো টাকা-পয়সা...আর কিচ্ছু নেই!

আপনমনে মাথা নাড়ছেন মামা। কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন,—চলুন। ফেরা যাক। হ্যাঁ, দুটো ঘরেরই চাবি আমায় দিন। ডুপ্লিকেট মিস্টার সুব্বার কাছে থাক। এ ঘর দুটোয় কাউকেই অ্যালাউ করবেন না, সে যিনিই হোন।

জিপে উঠে পড়েছি। সবাই নিশ্চুপ। এসেছিলাম মারণ-মশার রহস্যভেদ করতে, তার আগেই অন্য বিপত্তি!

পট্টনায়েক বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, আমাদের কালকের প্রোগ্রাম ঠিক থাকছে তো?

—নিশ্চয়ই! সকালে বেরিয়ে যাব।

৪

আহা, এমন অপূর্ব হিমালয়। সেখানেও শান্তি নেই। দুনিয়াটাই বাজে লোকে ভরে গেছে।—অনন্ত সরখেল সখেদে বললেন।

আমাদের জিপ ছুটে চলেছে। মামা, পট্টনায়েক সামনে। অনন্তবাবুর মন্তব্য মামা ঘাড় ঘোরালেন,—ঠিকই বলেছেন! কিন্তু ওকি মশাই! আপনি আগাপাস্তালা ঢেকে ঢুকে বসেছেন কেন? বললাম তো এখানে মশার ভয় নেই। খুলে ফেলুন!

না-না ঠিক সেজন্যে নয়। তবে কিনা, ওই হিংস্র মশা দু-একটা উড়ে আসতে কতক্ষণ স্যার?—অনন্তবাবু চিঁচি করে বললেন, তবে আপনি যখন বলছেন স্যার, খুলেই ফেলি!

চুপচাপ দুপাশে চলমান নিসর্গে বুঁদ হয়ে বসে আছি। সরোজশোভনও একেবারে তন্ময়।

অনন্ত সরখেল ধড়াচুড়ো খুলে ফেলেছেন। গরমে সারা মুখটা বেগুনি হয়ে গেছে। মুশকিল হচ্ছে, চুপচাপ থাকা অনন্তবাবুর ধাতে নেই। ঘামটাম মুছে উনি হঠাৎ তারস্বরে জুড়ে দিলেন,—আলোকের এই বন্য ধারায় শুইয়ে দাও....

ক-কী!! সরোজশোভন ধমকে উঠলেন, কী হচ্ছেটা কি? রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে ছেলেখেলা? চুপ করুন। ওটা বন্যা নয়, ঝরনা! শুইয়ে না ধুইয়ে—ছি:-ছি:।

—দূর ছাতু! দিল বারোটা বাজিয়ে! আরে মশাই গানে ভাবটাই আসল, কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

আসলে সেই ভয় দেখানোর পর থেকে অনন্ত সরখেল সরোজশোভনের ওপর হাড়ে চটা। নেহাত জগুমামা সরোজশোভনকে চেয়েছেন বলে কিছু বলতে পারছেন না।

আমরা এখন যাচ্ছি বিজনবাড়ির দিকে। যেখানে হঠাৎ হানা দিয়েছে আশ্চর্য আলোজ্বালা বিষাক্ত মশারা এবং তাদের কামড়ে মারা গেছে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষ।

আজ ভোরে পায়ের ফোটো প্রিন্টগুলো এসে গেছে। যেতে যেতে মামা সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছেন।

জিপ থেমে গেল। এসে গেছি।

দুজন খাকি পোশাক হাজির হল,—গুড মর্নিং স্যার। আসুন স্যার। বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে একটু যেতে হবে।

পাহাড়ি ঢাল পথে আমরা নামতে শুরু করলাম। দুপাশে গাঢ় সবুজ চা বাগান, এখানে ওখানে ছোটখাটো বাংলো, আর সামনে আকাশজোড়া পাহাড়।

অনন্ত সরখেল সবার পিছনে। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে তিনি সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলেছেন।

একটু সমতল জায়গা। কাঠের ছোট-ছোট ভাঙাচোরা নোংরা ঝুপড়ি। দারিদ্র্যের ছাপ। চা বাগানের শ্রমিক বসতি। জায়গাটা থমথমে।

কয়েকজন প্রৌঢ় এগিয়ে এসেছেন। পুলিশ দুজন নেপালি ভাষায় আমাদের আসার কারণ জানাল।

খবরটা নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল। তারপরেই ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ এল। ঝুপড়িগুলির ভিতর থেকে। একটা বস্তির ভেতর থেকে হঠাৎ উন্মাদিনীর মতো বেরিয়ে এলেন এক বয়স্কা মহিলা। চোখদুটো জলে টসটস, আলুথালু জামাকাপড়।

মহিলা ডুকরে উঠলেন, কেন এসেছ বাবুরা? বলো, বলো? আমার চারটে লেড়কার দুটো মরেছে নিজেদের জাতের গুন্ডাদের হাতে। গোর্খাল্যান্ড রুখতে গিয়ে। তাতে আমি কাঁদিনি। ওরা লড়ে মরেছে। কিন্তু বাবুরা, বাকি দুটোর ছোটটাও যে চলে গেল? বলো, বলো, কোন শয়তানরা এখানে ছেড়েছে ও পোকা?...বলো—!

মহিলাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে গেল একজন, বোধহয় তার একমাত্র জীবিত ছেলে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা স্থাণু।

মামা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন,—মিস্টার পট্টনায়েক, যে মশাদের কামড়ে এত গুলো প্রাণ গেল, তার একটাকেও মি মারা সম্ভব হয়েছে?

সঙ্গে-সঙ্গে উপস্থিত একজন বলল,—জি সাব। একটা মরা শয়তানকে রেখে দিয়েছি শিশিতে ভরে। কিন্তু ওটা—ওটা আর জ্বলছে না।

মরে গেছে যে!—মামা বললেন, শিশিটা আমাকে দেবেন? পরীক্ষা করতে হবে। আপনারা কোন বাগানে কাম করেন?

—রডরিক টি এস্টেট। ওই যে সামনে মানিজার সাবের বাংলো।

ঠিক এই সময়ে ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল, ভিড়টা দুভাগ হয়ে গেল।

—নমস্কার! আমার নাম বীরেন্দ্র রাস্তোগী।

—নমস্কার ! আপনিই ম্যানেজার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দাঁড়িয়ে কেন, চলুন না! ওই যে আমার বাংলো। একটু চা-নাস্তা করবেন।

—ধন্যবাদ ম্যানেজার সায়েব। আমাদের একটু তাড়া আছে। মালিকদের কেউ আছেন? একটু দেখা করতে চাই।

—মালিক দুজন। একজন মাড়োয়ারি, অন্যজন বাঙালি।—ওঁদের কেউই পারমানেন্টলি এখানে থাকেন না। ওকেসানালি আসেন, হিসাবপত্র নিতে।

—দুজনের নাম-ঠিকানা বলা যাবে?

—নিশ্চয়ই। ত্রিভুবন আগরওয়াল, ৭১ নম্বর কস্তুরবা গান্ধি মার্গ, দিল্লি। আরেকজন শিবশঙ্কর দত্ত, ৫ নম্বর অনাথ দেব লেন, কলকাতা। দুজন দুই শহরে।

—শিবশঙ্কর দত্ত! ইনিই কি দু-একদিনের মধ্যে দার্জিলিং-এ এসেছেন? ওনার সেক্রেটারি কি জলধর সেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওনাকে চেনেন না কি? মিস্টার সেন গত সপ্তায় বাগানে এসেছিলেন। গেস্ট হাউসে দিন চারেক ছিলেন। হিসেবপত্র দেখলেন, কাগজপত্র নিয়ে গেলেন। গত পরশু আমি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টান্ট আমরা গেছিলাম দত্ত সায়েবের হোটেলে। কিছু ক্লারিফিকেশন চেয়েছিলেন।

মামা স্থির চোখে রাস্তোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—আপনি কি জানেন, ওই দিন রাতে সিভিয়ার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে দত্ত সায়েবের? এখনও উনি সেন্সলেস? আর সেক্রেটারি সেন নিখোঁজ?

ক-কী? কী বলছেন? আঁতকে উঠলেন রাস্তোগী, গত পরশু দুপুর পর্যন্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট ছিলেন। ফিউচার প্ল্যানটেশন নিয়ে দিনভোর আলোচনা হল। সেন সঙ্গে ছিলেন, নোট নিচ্ছিলেন।

সেটাই তো মিস্ট্রি, রাস্তোগীসায়েব। আমাদের রিকোয়েস্ট বাগানে কাউকেই অ্যালাও করবেন না। হতে পারে, তিনি দত্ত সায়েবের রিলেটিভ বা এময়ি। আপনারা আগে দেখেছেন। তবুও না। সেকেন্ডলি আপনার কাছে কি ইনস্পেকটর প্রধানের নাম্বার আছে? রেখে দিন। ইনস্ট্যান্ট জানাবেন। ও ইয়েস, সেন যদি আসে, চান্স কম, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে আটকাবেন। এবং জানাবেন। ও. কে.?

—ইয়েস স্যার।

*

দূর থেকেই জয়ন্ত দত্তকে দেখতে পেয়েছি। করিডরে উনি অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন, ঘনঘন সিগারেট খাচ্ছেন। উস্কোখুস্কো চুল, এলোমেলো পোশাক, উদভ্রান্ত চেহারা।

আমাদের দেখতে পেয়ে জয়ন্ত ছুটে এলেন। আকুল গলায় বললেন,—জগু, জগু! এ কী হয়ে গেল? আমার...আমার একমাত্র আপনজন...

শান্ত হ জয়ন্ত।—জগুমামা কোমল গলায় বললেন,—এখন আমাদের আসল কাজ অপরাধীকে খুঁজে বের করা।

—জগু, তোকে দেখতে পেয়ে যে কতটা...তুই—তুই কি এ খবর পেয়ে এসেছিস?

—না রে। আমি দার্জিলিঙে অন্য কাজে এসেছিলাম। হঠাৎ কাল রাতে খবরটা পেলাম।

কিছু বুঝতে পারলি? মানে...কেন...হঠাৎ...?

—না রে জ্যাঠাবাবু এখন কেমন?

—আগের চেয়ে একটু ভালো। জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু ব্রেন বোধহয় প্যারালাইজড। কাউকেই চিনতে পারছেন না। একেকবার চোখ খুলেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে চোখের মধ্যে ভয় ফুটে উঠছে। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে চাইছেন?

—কী বলছেন?

—জড়ানো গলায় মাঝে-মাঝে শুধু বলে উঠছেন, 'ও...জল...জল...না না...জল...জল...।' ডাক্তার বলছেন, আতঙ্ক থেকে ফিয়ার সাইকোসিস হয়েছে। তার থেকে বেরোতে পারছেন না।

জল!—মামা ভ্রু কুঁচকে বললেন, জল! মানে—তবে কি জলধর...? ওই নামটা বলতে চাইছেন?

কী! কি বললি?—জয়ন্তর চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠল। বললেন,—রাইট। একদম ঠিক বলেছিস। জগু তুই সত্যিই জিনিয়াস। ওই শয়তনটাই কালপ্রিট। আমি জ্যাঠাবাবুকে কতবার বলেছি, ওর হালচাল সুবিধের নয়, উনি কান দিলে তো! ওনার সেই এক কথা, বন্ধু শচীন সেনের ছেলে, ভালো ছেলে!

শচীন সেন? বোম্বের এক সময়ের লাখপতি, সেন-কার্লেকর কোম্পানির একস পার্টনার। তিনি কি? সরোজশোভন বলে উঠলেন। এতক্ষণ উনি চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন।

—অতশত জানি না মশাই। শুনেছি বোম্বেতেই থাকতেন। এক সময়ে নাকি অনেকগুলো ব্যাবসাও ছিল। পরে সেগুলো কী সব কারণে হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন ছেলেকে চিঠি দিয়ে পাঠান জ্যাঠাবাবুর কাছে?

জগুমামা একটা সুতো পেয়ে গেছেন। জিগ্যেস করলেন, আপনি ওদের কাউকে চিনতেন?

একটু-আধটু—সরোজশোভন বললেন, আমার পিসির দিকের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। পিসেমশাই বোম্বেতেই থাকতেন। পনেরো-বিশ বছর আগেও মাঝেমধ্যে অনুষ্ঠানে শচীনবাবুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হত। ভাবছি—

—কী?

—ভাবছি, ওদের বোম্বের ঠিকানা জোগাড় করে একবার ঘুরে আসব?

যাবেন? খুব ভালো হবে। খরচ সরকার দেবে। কী পট্টনায়েক সায়েব?

পট্টনায়েক সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন।

সঙ্গে-সঙ্গে অনন্তবাবু আমার হাত খিমচে ধরলেন। ফিসফিস করে বললেন,—য-যা! ক্রিমিন্যালটাকেই স্যার বিশ্বাস করে বসে আছেন। দেখে নিও টুকলু, এবার ভোগান্তি কপালে নাচছে!

৫

ফ্লাইটে কলকাতা ফিরছি। একটু আগে বাগডোগরা থেকে ফ্লাইট ছেড়েছে। জয়ন্ত দত্ত ফিরছেন বিকেলে, জ্যাঠাবাবুকে নিয়ে।

ইতিমধ্যে মামা বেশ কয়েবার গেছিলেন 'ইন্দ্রপ্রস্থ' হোটেলে। শুনলাম কয়েকবার নাকি জেরাও করেছেন হোটেলের কর্মচারীদের। তার ফলে একটা খবর বেরিয়ে এসেছে।

হোটেলের হেড কুক বলেছে সে রাত দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ কিচেন থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে আসার সময় দেখেছিল, কেউ একজন আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। লোকটি বেশ লম্বা। সে কিছু সন্দেহ করেনি, তাই কাউকে বলেওনি। দুর্ঘটনা ঘটার পরে অন্য সহকর্মীদের বললে তারা হেসে উড়িয়ে দেয়। কী দেখতে কী দেখেছে? রাঁধুনির আবার একটু পানদোষ আছে, তাই রাতে উলটোপালটা দেখা অস্বাভাবিক নয়!

এ ছাড়া পরশু চা বাগান, হাসপাতাল হয়ে হোটেলে ফিরে দেখি, একটা মুখবন্ধ খাম রিসেপশনে পড়ে আছে। মামার নামে এসেছে। পাঠিয়েছেন ম্যানেজার রাস্তোগী। উনি লিখেছেন, জলধর সেন বাগান-বাংলোর যে ঘরে ছিলেন, সেখানে ঝাড়ু দিতে গিয়ে সুইপার কয়েক পৃষ্ঠা টাইপ করা কাগজ পায়। সেগুলো উনি নিজের কাছেই রেখেছিলেন, সেনকে ফেরত দেবেন বলে।

প্লেন উঠে পড়েছে আকাশের আরও উঁচুতে। আমার পাশেই গম্ভীর অনন্ত সরখেল। এবার বেড়ানোটা বড্ড শর্টকাট হয়ে গেল। ওঁর মন ভালো নেই। আর পেছনে সরোজশোভন।

সরোজশোভন মোটামুটি লেগে আছেন অনন্তর পিছনে। একটু সুড়সুড়ি দিয়ে বললেন,—সরখেলসাব, প্লেন তো মহাশূন্যে! এবার একটা গানটান হোক। আপনার নিজের ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীত—

কেন, গানের সঙ্গে নাচবেন না কি?—অনন্তবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর আপনার ফুর্তি হচ্ছে!

—আহা, কী জ্বালা বলুন না!

—সে কৈফিয়ত কি আপনাকে দেব না কি, অ্যাঁ? কতবার স্যারকে মানা করলুম, আর যাই হোক পাগলছাগল জুটোবেন না।

—এই যেমন আপনি জুটেছেন!

এর পরেই অনন্ত সরখেলের অগ্নিদৃষ্টি এবং সরোজশোভনের আকর্ণ বিস্তৃত হাসি, এই চাপানউতোর খুব বেশিদূর এগোবার আগেই আমাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সামনে।

—আরে জগু! কোত্থেকে?

—দার্জিলিং। তুই?

—আমিও দার্জিলিং। গর্ভমেন্ট কলেজে একটা লেকচার ছিল। একা?

—না, না, ওই যে টুকলু। আমার ভাগ্নে।

ভদ্রলোক যেতে-যেতে ফিরে দাঁড়ালেন। গলাটা এতক্ষণ চেনা-চেনা লাগলেও পেছন থেকে বুঝতে পারিনি। জীবেশ মামা, জগুমামাদের 'জে কিউব' ওয়ান। ধবধবে সাদা স্যুট, পায়ে সাদা নর্থস্টার, নীল টাই, চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা। এখনও দিব্যি বয়সটাকে ধরে রেখেছেন।

জীবেশমামা আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন। তারপর আবার মামাকে বললেন,—কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা! কলকাতাতে আছি, অথচ কাজের চাপে দেখা সাক্ষাৎ হয় না।

—জয়ন্তর জ্যাঠার হঠাৎ সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে। দার্জিলিঙেই। জয়ন্ত দত্ত, বুঝেছিস তো? খবর পেয়েছিস?

—সে কী? না:! জ্যাঠা মানে...মাল্টিমিলিওনিয়র...শিবশঙ্কর দত্ত...! কবে হয়েছে?

—দিনচারেক আগে। রাতে। ডাক্তাররা বলছে দারুণ আতঙ্কে এটা ঘটেছে। এখন একটু ভালো, তবে ব্রেন ঠিকঠাক চলছে না। তোর সঙ্গে জয়ন্তর এরমধ্যে দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ, হয়েছিল। স্টেটস থেকে ফেরার পর নিজেই ফোন করে একদিন এসেছিল। হামবাগ একটা। কিছু মনে করিস না, বিদেশ ঘুরে যেন মহান সায়েনটিস্ট হয়ে এসেছেন!

—কেন রে?

কী বলে জানিস? আমায় জ্ঞান দিচ্ছে, এখানে পড়ে-পড়ে রট করছিস কেন? তার চেয়ে ওদেশে আমার বন্ধুবান্ধবকে লিখে দিচ্ছি, চলে যা। একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

জগুমামা হেসে ফেললেন। বললেন,—তুই কী বললি?

—এ কথার পর কার মাথা ঠিক থাকে, বল? আমিও ঝেড়ে দিলুম, অত যে বিগ-বিগ বাত ঝাড়ছ বাপু, তা নিজে তল্পিতল্পা গুটিয়ে এই রটন দেশে চলে এলে কেন?

বিকেলের চা খেতে খেতে মামাকে বললাম,—কিছু স্পষ্ট হল মামা?

মামা কিছু ভাবছিলেন। আনমনা ভাবে বললেন,—হুঁ, কিন্তু দুয়ে-দুয়ে চার যে কিছুতেই হচ্ছে না! দেখি, চিঠির রিপোর্টটা পাই!

—চিঠি? কার চিঠি?

ওই যে, ওনার চিঠি।—মামা আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন,—যদ্দুর শুনেছি, সিনিয়র অ্যাডভোকেট বসন্ত মজুমদার ছিলেন, শিবশঙ্কর দত্তের ঘনিষ্ট বন্ধু, পারিবারিক উকিল। ওনার কাছে একবার যেতে হবে। চল দেখি।

আধঘণ্টার মধ্যে ফোন করে দুজনে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বসন্তবাবুর বাড়ি খুব কাছে। বিশপ লেফ্রয় রোডে।

বাড়ির সবাইকে বলে দেওয়া হল, পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু নিয়ে এলে তারা যেন রেখে নেন।

বসন্ত মজুমদার আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সত্তরের কাছাকাছি বয়স। ভারিক্কি চেহারা। পুরু লেন্সের মোটা ফ্রেমের চশমা দিয়ে গভীর দুটি চোখ উঁকি দিচ্ছে।

আগেই মামার নাম শুনেছেন। তারপর যখন শুনলেন, মামা জয়ন্ত দত্তের ঘনিষ্ঠ ক্লাসফ্রেন্ড এবং শিবশঙ্কর দত্তের খুবই পরিচিত, স্নেহাস্পদ এবং সেই সুবাদে মামা নিজে থেকেই যখন তাঁকে 'তুমি' ডাকতে অনুরোধ করলেন, ভদ্রলোক গলে গেলেন।

মামা এবার আসল কথায় এলেন,—কয়েকটা বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাস্য আছে।

—উইলের বিষয়ে জানতে চাইছ?

—ঠিক ধরেছেন কাকু!

শোনো বাবা! বসন্ত মজুমদার মৃদু হেসে বললেন, উইলের কথা মক্কেল এবং উকিল বাদে কাকপক্ষীরও জানার কথা নয়। তবে তোমায় আমি বলব। কারণ, শিবশঙ্কর আমার বহুদিনের বন্ধু। আমি চাই যে যারা ওকে খুন করার চেষ্টা করেছে, তারা অপরাধের মোটিভের সঙ্গে উইলের সম্পর্ক আছে কিনা, সে জন্যেই তো কনটেন্ট জানতে চাইছ নাকি?

—একদম ঠিক, মেসোমশাই।

বসন্ত মজুমদার হাসলেন। বললেন,—শোনো, শিবশঙ্কর উইল করেছিল মোট তিনটে। জয়ন্ত দেশে ফেরার আগে প্রথম উইলে শিবশঙ্কর তার পুরো সম্পত্তির প্রায় সবটাই উইল করেছিল ওর বন্ধুর ছেলে জলধর সেনের নামে। কিন্তু জয়ন্ত দেশে ফেরার মাসদুয়েকের মধ্যে শিবশঙ্কর মত পালটায়। দ্বিতীয় উইলে সে অর্ধেক দেয় নাতনি মৌসুমীকে, বাকি অর্ধেক জলধরকে। কিন্তু কেন জানি না, শিবশঙ্কর এখানে থামে না। তৃতীয় উইল করল ক'দিন আগে। শিবশঙ্কর দার্জিলিং যাওয়ার ঠিক দুদিন আগে ওটা রেজিস্ট্রি হল। শেষ উইলে শিবশঙ্কর মোট সম্পত্তির দুয়ের তিন অংশ দিয়েছে মৌসুমীকে। বাকিটা রেখেছে জলধরের জন্যে। আইন অনুযায়ী, ওই উইলই ফাইন্যাল। এক্সিকিউটার হিসাবে মৌসুমীর অ্যাডাল্ট হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করবে ভাইপো জয়ন্ত।

পিঁ...পিঁ...পিঁ...

একটানা ফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। মামা তুলে নিলেন,—হ্যালো, জগবন্ধু মুখার্জি বলছি।

পরক্ষণে পালটে গেল তাঁর মুখের চেহারা। উত্তেজিতভাবে বললেন,—কী...? তোকে খুন করতে ল্যাবে? কখন?...চিনতে পেরেছিস?...গলা কী?...অন্যরকম!...আশ্চর্য!...এখনি যাচ্ছি।

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং করে চারটে বাজল।

জনহীন রাস্তা দিয়ে ফোর্থ গিয়ারে গাড়ি চালিয়ে ঠিক বারো মিনিটে আমরা পৌঁছে গেলাম দশ নম্বর চণ্ডী ঘোষ রোডে।

জীবেশমামা ছুটে এলেন। হাতে তাঁর জ্বলন্ত চুরুট। মুখ লাল।

—আয়। দেখে যা।—

প্রথম ঘরটা ড্রইংরুম। টিভি, সোফা, শোকেসে সুন্দর সাজানো। তারপর ল্যাবরেটরি—কাম—স্টাডিরুম। বেশ বড় ঘর। ঘরে ঢোকার দুটো দরজা। একটা বৈঠকখানা দিয়ে, অন্যটা অন্দরমহলের দিক দিয়ে। ঘরটার ডানদিকে গরাদহীন হালফ্যাশানের বড়-বড় জানালা, ভারী, পরদা ঝোলানো। দুটি জানালাই বাগানের দিকে।

ঘরের বাঁ-কোণে বইয়ের বিরাট আলমারি। তার পাশে ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারের বাঁ-দিকে ছোট্ট উঁচু ড্রয়ার, তার ওপর সুদৃশ্য টেবিল ল্যাম্প বসানো।

ল্যাবরেটরি বিধ্বস্ত। কয়েকটা র‍্যাক উলটে আছে। ঘরময় কাচের টুকরো।

কী হয়েছিল, সবটা বল!—জগুমামা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

জীবেশমামা আর আমি সামনের চেয়ারে। চুরুটে জোরে -জোরে টান দিয়ে জীবেশমামা বলতে আরম্ভ করলেন।

কাল সকালে প্লেনে তোর সঙ্গে দেখা। বাড়ি ফিরে একটু রেস্ট নিয়ে ল্যাবে ঢুকলাম ছ'টা নাগাদ।

কাগজপত্র নিয়ে ইজিচেয়ারে বসেছি। পড়ছি আর ভাবছি। ভেতর থেকে রাতের খাবার দিয়ে গেছে, পড়তে-পড়তে খেয়ে নিয়েছি। কখন যে তন্দ্রামতন এসে গেছে, জানি না। হঠাৎ করে অ্যালার্ম বেজে উঠল।

—এক মিনিট। দরজা বন্ধ ছিল?

—অবশ্যই। বাইরের গেট সাড়ে দশটার পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানটা এসেছিল বাগানের দিক দিয়ে। জানলা টপকে...চমকে উঠে দেখি, জানলার সামনে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘ মূর্তি। আচমকা এ ঘটনায় প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই, তবে বুদ্ধি হারাইনি। ওই ড্রয়ারটায় আমার লোডেড রিভলভার থাকে। সন্তর্পণে ওটাকে হাতে তুলে নিতে সাহস বেড়ে গেল। বললাম, কে—কে তুমি?

মূর্তিটা খনখনে গলায় হেসে উঠল, জলধর সেন।

—জলধর সেন! ঠিক শুনেছিস?

—সিওর! দাঁড়া সবই রেকর্ড করা আছে।—জীবেশমামা বললেন, ল্যাবে আমি এক নতুন যন্ত্র বসিয়েছি, এ ঘরের সব জানলা এমনকী দরজার পাপোসের নীচেও মাইক্রোফোন ফিট করা আছে। রয়েছে অ্যালার্ম কানেকশনও। রাতে যেদিন ল্যাবে কাজ করি, সাড়ে দশটার পর সুইচ অন করে দেওয়া হয়। রাতে কোনও অবাঞ্ছিত অতিথি যদি ঢুকে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম আর রেকর্ডার দুটোই চালু হয়ে যাবে। অর্থাৎ—

—অর্থাৎ যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অপরাধী ধরার ক্লু থেকে যাবে।

—রাইট। এবার রেকর্ডার চালু করছি, শোন।

প্রথমে অ্যালার্মের তীব্র শব্দ! তারপর—

—কে-কে তুমি?

—আমি...হা: হা: হা:...খুক খুক...জলধর সেন!

—জলধর সেন?

—হ্যাঁ। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?...খুকখুক...বিশ্বাস হবে, যখন গলা টিপে তোমায় মারব।

—মারবে? কেন?

—তুমি বন্ধুকে ঠকিয়েছ বলে।

—খবরদার! আর-এক পা এগিও না!

টেপ বন্ধ করে জীবেশ বললেন,—বেশ খানিকটা দূরে ছিল। ফায়ার করেছিলাম। অন্ধকারে মিস হল।

মামা চুপ। কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন,—ঠকানোর ব্যাপারটা কী?

—কী করে বলব? কিছুই বুঝতে পারছি না। কেনও বা এল আমায় খুন করতে? ব্যাপারটা এমন শকিং, কিছু বুঝতেই পারছিলাম না। হঠাৎ তোর কথা মনে পড়ল।

মামা বললেন,—একটু বাগানে চল।

জীবেশমামার হাতে জ্বলন্ত টর্চ। জানলার ঠিক নীচে থেকে বড়-বড় পায়ের ছাপ। জগুমামা বসে পড়লেন। দেখলাম, ওঁর বাঁ-হাতটা সন্তপর্ণে বুক পকেটে ঢুকে আবার বেরিয়ে এল।

—টুকলু, চটপট কয়েকটা ক্লোজআপ স্ন্যাপ নিয়ে নে। আর জীবু তোর ওই ক্যাসেটটা দিয়ে দে। স্টাডি করতে হবে।

সব কাজ সেরে গাড়িতে যখন বসলাম, ভোরের রোদ্দুর ততক্ষণে কলকাতার গাছপালা, বাড়িঘরের গায়ে মাথায় মাখামাখি।

মামা ড্রাইভ করছেন। সকালের ফুরফুরে বাতাসে তন্দ্রা এসে যাচ্ছে।

—মামা কোথায় যাচ্ছি?

—হাতি বাগানে। জয়ন্তর জ্যাঠা কেমন আছেন, দেখে আসি।

—হঠাৎ জীবেশমামার উপর অ্যাটাক হল কেন?

—এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বিডন স্ট্রিট পার হয়ে গাড়ি থামল। সরু গলির মধ্যে আধমিনিটের হাঁটা পথে, 'দত্ত ম্যানসন'। বড় ফটক। দারোয়ান খুলে খবর দিতে গেল। আমরা ড্রইংরুমে বসলাম। এক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লেন জয়ন্ত দত্ত।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে ওঁর? ঝোড়ো কাকের মতো বিধ্বস্ত চেহারা।

ধপ করে বসে পড়লেন সোফায়। তারপর তাকালেন আমাদের দিকে। শূন্য দৃষ্টি।

মামা হতভম্ব। ঝুঁকে পড়ে বললেন,—অ্যাই জয়ন্ত! কী হয়েছে—অ্যাই। জ্যাঠাবাবুর কিছু?

দুদিকে মাথা নাড়লেন জয়ন্ত। ওঁর দু-চোখে জল।

—তবে? অ্যাই? বল না?

জয়ন্ত হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন,—জগু, সর্বনাশ হয়ে গেছে রে। মৌসুমী, মৌসুমী কথা বলছে না।

—মৌসুমী! তার মানে? অসুস্থ?

জয়ন্ত অতিকষ্টে বললেন,—শরীর এখন ঠিক। কিন্তু কিছুর ধাক্কায়...ও...ও বোধহীন হয়ে গেছে। কথা বলছে না...রেসপনড করছে না। জগু আমার...আমার কী হবে? মৌসুমী—

শান্ত হ।—মামা বন্ধুর হাত ধরে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। অত ঘাবড়ে যাস না ভাই।

শিবশঙ্কর দত্তের ঘরের খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ছোট্ট মৌসুমী। নার্স তার দাদুর প্রেসার মাপছে।

মামা ঘরে ঢুকে খাটের দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন,—জ্যাঠাবাবু চিনতে পারছেন? আমি জগু। জয়ন্তর কলেজের বন্ধু।

কোনও উত্তর দিলেন না বৃদ্ধ। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মামার দিকে। একবার বাঁ-হাতটা ওঠাবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। আমি মৌসুমীর পিঠে হাত দিয়ে কোমল গলায় বললাম,—চিনতে পারছ আমায়? আমি টুকলুদাদা।

—মৌসুমীও উত্তর দিল না। ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখল আমায়, তারপরে আরও জোরে খাটের বাজু আঁকড়ে ধরল। চোখে-মুখে ভয়।

মামা বললেন, ভয়ংকর কোনও শক পেয়েছে। ওর এরকম অবস্থা কখন থেকে?

—আমি তখন ছিলাম নারে বাড়িতে। ফিরে এসে...

—তখন বাড়িতে কে-কে ছিল?

—সবাই ছিল। কাজের লোকজন—কাজের লোক মোক্ষদা, হরিহর, ঠাকুর নিশাপতি, দারোয়ান রামবিলাস সকলেই।

—ট্রেতে চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল এক মাঝবয়েসি মহিলা। জয়ন্ত মৃদুগলায় বললেন, —এই হচ্ছে মোক্ষদা। বহুদিন এ বাড়িতে।

মামা বললেন,—কাল রাতে কী হয়েছিল মোক্ষদা?

—একটু ইতস্তত করে মোক্ষদা বলল,—আমি তখন খুকুমণির দুধ গোছাচ্ছিলুম। ঘড়িতে দশটার ঘণ্টা বেজেছে। হঠাৎ করে নাইট নিবে গেল—নোডশেডিং। হেরিকেন ধরিয়ে সবে কয়েক পা এগিইচি, ও মাগো! সে কি চিৎকার দিদিমণির—আঁ—আঁ—আঁ! হাত থেকে আমার বাটি পড়ে গেল। পড়িমরি ছুটলুম খুকুমণির ঘরের দিকে। ততুক্ষুণে খুকুমণি খাটের ওপর চোখ উলটে আজ্ঞান!

—তারপর?

—বাড়ির সব নোকেরাও তখন এয়ে পড়েচিল। সবাই মিলে জলটল ছিটিয়ে নাকে ধোঁয়া দিয়ে দিদিমণির সাড় ফেরানুম। দিদিমণি তাকাল। উঠেও বসল। তারপর থেকে যেন জেগেও ঘুমুচ্চে। কথা বলচে না। ভয়ে যেন কাঁটা হয়ে আচে।

—লোকজন সবাই-ই ছিল বাড়িতে?

—হ্যাঁ গো দাদাবাবু।—মোক্ষদা একটু ভাবল। তারপর বলল, শুধু বেরজো আসেনি। দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্চিল। ওর খুব জ্বর ছেল কিনা।

বেরজো কে?

জয়ন্ত মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছিলেন। বললেন, ব্রজহরি। মৌসুমীর কেয়ারটেকার বলতে পারিস। স্কুলে নিয়ে যায়। বেড়াতে নিয়ে যায়। দিঘায় বেড়াতে গিয়ে মাসদুয়েক আগে ওকে নিয়ে এসেছি। ক'দিন ধরে ওর টানা জ্বরে ভুগছে। নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া। রাতের দিকেই জ্বরটা আসে। কাল ও থাকলে...

আ: জয়ন্ত! মামা একটু কড়া গলায় বললেন,—তোকে বলছি তো, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই অন্য সব কাজের লোকজনদের ডাক! একটু কথা বলি।

—সে বল! তবে আমি সেন্ট পার্সেন্ট সিওর, ওই অমানুষ জলধর সেন হচ্ছে নাটের গুরু।

৭

একজন যা করছে জেনে বুঝে, অন্যজন না জেনে, অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে।—জগুমামা কাজ করতে-করতে মুখ না তুলে বললেন। মামার টেবিলে এখন একগাদা জিনিস। গুচ্ছের ফোটো, কাগজের টুকরো, টেপরেকর্ডার ফোরেনসিক রিপোর্ট।

আমি খাটে হেলান দিয়ে চুপচাপ ভাবছিলাম। হঠাৎ এই কথায় রীতিমতো অবাক।

—তার মানে?

—তার মানে...থাকগে রিপোর্টটা আসতে দে।

রিপোর্ট কীসের?

—এলে দেখিস। দুপুরে একটা বাইরের টেলিফোন আসতে পারে। সঙ্গে-সঙ্গে ডেকে দিস।

—মামা আবার নিজের কাজে ডুবে গেলেন।

এই এক বিরক্তিকর স্বভাব জগুমামার। নিজেই শুরু করেন। আবার নিজেই চেপে যান।

এবারের ঘটনাগুলো সব এমন তালগোল পাকিয়ে গেছে যে, কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রথমে শুরু হল মারণমশা দিয়ে, তারপর জড়িয়ে পড়লাম সম্পূর্ণ অন্য ঘটনায়। তবে একটাই ভালো খবর। ফিরে এসে মরা মশাটাকে সরকারি ল্যাবে পরীক্ষা করিয়ে মামা নাকি নিশ্চিত হয়েছেন, বিজনবাড়ির চা-বাগানে আর কেউ মরবে না। মরেওনি। সুতরাং পট্টনায়েক দিল্লিতে ফিরে গেছেন।

গতকাল দত্ত ম্যানসনের সকলের জবানবন্দি টেপ করা হয়েছে। মোক্ষদা ছাড়া অন্য সকলের স্টেটমেন্ট মোটামুটি এক। আর কাল সকালেও ব্রজহরির গায়ে বেশ তাপ ছিল। লম্বা-চওড়া লোকটা কম্বল মুড়ি দিয়েও বোধহয় জ্বরের তাড়সে কাশছিল আর কুঁকড়ে যাচ্ছিল। দু-একটা কথা বলেই মামা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এত ঘটনা-দুর্ঘটনা-খুনের পরে মামাকে দেখেছি, কিন্তু গতকালের মতো বেভুলো কোনওদিন দেখিনি। নইলে দত্ত ম্যানসনে তাঁর কনুইয়ের ধাক্কায় জলভরতি গ্লাসটা মেঝেয় পড়ে চৌচির হয়?

টুং-টুং-টুং! সাতসকালে কে এল?

অনন্ত সরখেল। ঢুকতে-ঢুকতেই বললেন,—কী সমাচার টুকলু সাহেব? স্যার মেরে এনেছেন নিশ্চয়ই?

—মেরে? কাকে মেরে আনবেন?

—ধ্যুৎ! বলছি তদন্তের জাল গুটিয়ে এনেছেন তো?

—কী জানি! চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

যেতেই হবে! অনন্ত সরখেল আজকাল নস্যি নিচ্ছেন। দু-আঙুলের ডগায় এক টিপ নিয়ে নাকে চালান দিয়ে বললেন, অধমের কথা তো শুনবেন না স্যার! কতবার হিন্টস দিলুম।

—হিন্টস দিলেন!

—হ্যাঁ, দিলুম, ওই হতচ্ছাড়াটাই কালপ্রিট। ওটাকে থার্ড ডিগ্রি দিলেই সব বেরিয়ে পড়ত।

—কালপ্রিট? কে?

এর মধ্যেই নস্যির এফেক্ট শুরু হয়ে গেছে। অনন্ত সরখেলের নাক চোখ বিশ্রীভাবে বিকৃত হচ্ছে। তারপর বিরাট এক 'হ্যাঁচ্চো'। নাক-মুখ সাফ করতে-করতে বললেন,—আরে বাপু, ওই যে হে! তোমার সুপারস্টার গায়ক। ব্যাটা কী নাম বলেছিল যেন—ইয়েস, সরোজশোভন। বাপের জন্মে ওরকম নাম শুনেছ? একজোড়া নাম একসঙ্গে অ্যাঁ। সবটাই ফলস দিচ্ছে। নাটক করছে। ওই নচ্ছারটাই আসলে জলধর বুঝলে।

টুং...টাং...টুং...টুং...টুং...

কী ব্যাপার! কলিংবেলটা একটানা বেজেই চলেছে! আচ্ছা লোক বটে! বোতাম টিপেই রেখেছে!

দরজা খুলতেই আমাকে ধাক্কা মেরে ঢুকে পড়লেন জয়ন্ত দত্ত। পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন,—জগু! জগু! আমি আর বাঁচব না রে।

জগুমামা বেরিয়ে এসেছেন। জয়ন্ত তাঁর হাত ধরে টান দিলেন,—আয়, দেখে যা!

বেরিয়ে এলাম কম্পাউন্ডে। জয়ন্ত দত্তের বিদেশি গাড়িটা ক্ষতবিক্ষত!

—এ কী অবস্থা গাড়িটার?

—ইয়েস! অ্যান্ড দিস হ্যাস বিন ডান বাই দ্যাট...দ্যাট স্কাউন্ড্রেল জলধর সেন। ইয়েস! আই'ভ ডেফিনিটলি রিকগনাইজড হিম!

—কুল ডাউন প্লিজ। কী হয়েছে খুলে বল।

—এখানেই আসছিলাম। রোববার, তাই রেড রোড নিয়েছি। হঠাৎ আমার রিয়ার গ্লাসে চোখে পড়ল অনেকটা পিছনে একটা হুডখোলা জিপ। বেশ জোরে এগিয়ে আসছে।

...প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি।—একটু দম নিয়ে জয়ন্ত ফের বললেন, তারপর ড্রাইভারকে দেখেই চমকে উঠলাম। জলধর সেন! সিক্সথ সেন্স বলে দিল, ওর উদ্দেশ্য ঠিক নেই, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। জিপটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমি স্পিড বাড়াবার আগেই...জিপটা এসে দ্রাম করে মারল আমার ডান সাইডে। বোঁ করে পাক খেয়ে ঘুরে গেল আমার গাড়ি। জিপটা এবার এসে গেল বাঁ-দিকে। আমি তখন বুঝে নিয়েছি, আজ আমি শেষ। স্পষ্ট দেখলাম, জিপের সিটে বসে জলধর সেনের সে কী হাসি! তখনও নার্ভ ফেল করিনি আর গাড়িটা মজবুত ছিল বলে ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছি। যেটুকু সময় শয়তানটা হাসতে খরচ করেছে, তার মধ্যেই কোনওরকমে গাড়ি সোজা করে প্রাণপণে চালিয়ে দিয়েছি। সে-ও তাড়া করেছিল, আমার গাড়ির পিকআপ অনেক বেশি বলে ধরতে পারেনি। দ্যাখ, কী অবস্থা হয়েছে আমার।

জয়ন্তবাবুর সারা গা-হাত-পা কেটে ছড়ে গেছে। রক্তে জামাপ্যান্ট মাখামাখি। পিকলু ডেটল তুলো আনতে ছুটল।

জগুমামা বললেন,—এবার বল, আমার কাছে কেন আসছিলি?

—মৌসুমির জন্যে! মেয়েটার যে কী হয়ে গেল। কত ডাক্তার দেখালাম, কিছুই হল না।

—ডাক্তাররা কী বলছে?

—বলছে, কোনও মারাত্মক ভয় পেয়ে এমন ঘটেছে। সেই ভয় রিপিট করালে আর সেই সময় সাহস দিতে পারলে হয়তো নরম্যাল হতে পারে। বল তুই, এটা কী করে সম্ভব? জগু, প্লিজ, আমাকে একটু অ্যাডভাইস দে...ও :, আমি আর পারছি না।

দু-হাতে মুখ ঢাকলেন জয়ন্ত দত্ত।

জগুমামা বললেন,—তোর যদি আপত্তি না থাকে, আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি। যা এখন বাড়ি গিয়ে রেস্ট নে। একটা টিটেনাস দিয়ে নিস। আর মাথা ঠান্ডা রাখ। সব ঠিক হয়ে যাবে।

জয়ন্ত দত্তকে গাড়িতে তুলে ফিরছি, উঠোনে আবার ইঞ্জিনের গর্জন! কে এল? সরোজ শোভন। চাবি ঘোরাতে-ঘোরাতে জিপ থেকে নামছেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত সরখেল ফিসফিস করে বললেন,—দেখেছ? হুড খোলা জিপ। মিলে গেল তো? স্যারকে বলো।

মামা কিন্তু আন্তরিক গলায় বললেন,—আসুন সরোজবাবু! আপনার জন্যেই ওয়েট করছিলাম।

সোফায় বসে সরোজশোভন বললেন,—ও: হারিকেন ট্যুর। স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে সোজা চলে এসেছি। রোমহর্ষক সংবাদ!

—বলে ফেলুন।

—বোম্বেতে শচীন সেনের বাড়ি গিয়ে অবাক হয়ে যাই। মেরিন ড্রাইভের কাছে ওনার বাড়ি তালা বন্ধ। খোঁজখবর নিয়ে শুনলাম, শচীন সেন এখন দিল্লিতে। মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থাকেন।

আর ওনার ছেলে? জলধর সেন?

সেটাই সবচেয়ে রিভিলিং। জলধর সেন বছর দশেক আগে কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।

—সে কী!

—হ্যাঁ। এটাই ঘটনা। ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন শচীন সেন। কিছুটা অসংলগ্নতা দেখা দিয়েছিল তাঁর মধ্যে। স্ত্রী আগেই গত হয়েছিলেন। তখন মেয়ে-জামাই এসে তাঁকে নিয়ে যায় দিল্লিতে।

জগুমামা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। উঠে এসে সরোজ শোভনের হাত ধরলেন,—আপনি এই তদন্তে যে কী বিরাট উপকার করলেন, হয়তো আপনিও জানেন না। কিন্তু আরেকটু কাজ করতে হবে। পাশের ঘরে চলুন।

৮

নাচতে-নাচতে পিকলু এসে ঢুকল। মৌসুমীর হাত ধরেছে। ধুতি পরেছে, সেটাই গায়ে জড়িয়েছে। ঝাঁটা দিয়ে তিরধনুক বানিয়ে পিঠে জুড়েছে। চুল ঝুঁটি বাঁধা। মৌসুমীর পরনে শাড়ির টুকরো। ঠোঁটে, গালে গোলাপি রং চোখে কাজল। মাথায় ঝুঁটি। খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে।

পিকলু বলল,—কেমন হয়েছে মামা? ঠিক রাম-সীতার মতো লাগছে তো?

প্রতি রবিবার টিভিতে রামায়ণ চলছে। তারই এফেক্ট! মামা মিটিমিটি হেসে বললেন,—ফাইন! কিন্তু শুধু দাঁড়ালে তো হবে না বাপু, একটু নেচে কুঁদে দেখাতে হবে যে।

ঠিক, ঠিক। নাচ-গান দুটোই চাই!—পট্টনায়েক বললেন।

আগে থেকে রেডি করা ছিল। ক্যাসেট পুরে চালু করে দিলাম টেপরেকর্ডারে।

আজ সন্ধেয় জড়ো হয়েছি বিশেষ উদ্দেশ্যে। পট্টনায়েক কলকাতাতেই এসেছিলেন। তিনিও হাজির। মামা বলেছেন, মৌসুমীকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান হবে। নাচ-গানের পর জগুমামা দেখাবেন ম্যাজিক। সে-জন্যেই এই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ।

ক্যাসেটে বাজছে—ঠুমক চলত রামচন্দ্র বাজত পায়জনিয়া...

সঙ্গে সঙ্গে পিকলুও শরীর দোলাচ্ছে। কিন্তু মৌসুমী জড় পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। একটুও নড়ছে না। ও কী সাড়া দেবে না? জগুমামা হেরে যাবেন?

মিনিট দুয়েক মৌসুমীর হাত ধরে টানা হ্যাঁচড়া করে পিকলু হতাশ গলায় বলল,—না: মামা, করছে না।

ঠিক তখনই 'ঝপ' করে নিভে গেল ঘরের সব আলো। অন্ধকার। লোডশেডিং?

জগুমামার গলা শোনা গেল—আমিই আলো নিভিয়েছি। ম্যাজিক শো শুরু হয়েছে।

ঘরে পিনপড়া নৈ:শব্দ।

আবার ভেসে এল মামার গলা,—সবাই স্থির হয়ে বসুন। এটা ভৌতিক ইন্দ্রজাল!

কোঁক!—অনন্ত সরখেল।

মামা বলছেন,—এই ম্যাজিকে আমি আপনাদের সামনে হাজির করছি জলধর সেনকে। শিবশঙ্কর দত্তর বন্ধু শচীন সেনের ছেলে জলধর মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে নয় বছর আগে। একটা কথা, কেউ ভয় পেলে ঘর থেকে চলে যেতে পারেন।

—ভ-ভয়-খি-খিক-কি-সের?

অনন্ত সরখেল দু-হাতে খিমচে ধরেছে আমার কাঁধ।

অন্ধকার সয়ে গেছে। মামাকে আবছা দেখতে পাচ্ছি। মামা দরজা খুলে দিয়েছেন। কেটে-কেটে বললেন, —এসো...জলধর...এসো...। তোমারই জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।

ঝম-ঝম-ঝম...! ধাতব শব্দ হচ্ছে। দরজা দিয়ে ঢুকল দীর্ঘকায় এক মূর্তি।

ধপাস! অনন্ত সরখেল নির্ঘাত উলটে পড়েছেন।

ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে সে। তার শরীর দিয়ে সাদা আলো বেরুচ্ছে। জ্বলছে আর নিভছে।

মূতি এবার কথা বলল,—আপনারা আমায় দেখে অবাক হচ্ছেন। আমি আসতে চাইওনি। কিন্তু ওই ছোট্ট মেয়েটা—মৌসুমীই আমায় টেনে এনেছে প্রেতলোক থেকে, ওকে আমি বড্ড ভালোবাসি...খুকখুক...ওকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

মূর্তির কণ্ঠস্বর আগেও শুনেছি। জীবেশমামার বাড়িতে। রেকর্ড করা ছিল।

মূর্তি মৌসুমীর দিকে এগিয়ে আসছে আর বলছে,—মৌসুমী, ভয় পেয়ো না...খুক-খুক...এসো...কাছে এসো—।

না-নাহ!—হঠাৎ বোবা মৌসুমী চেঁচিয়ে উঠল। ওর হাতের তর্জনী মূর্তির দিকে। থরথর করে সে কাঁপছে।

মুহূর্তের মধ্যে মামা ঝাঁপিয়ে এসে কোলে তুলে নিলেন মৌসুমীকে। গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, কিচ্ছু না। কোনও ভয় নেই! ভূতটুত কিচ্ছু নেই।

দপ করে জ্বলে উঠল আলো। 'হাঁ' হয়ে দেখলাম, মূর্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা টুনি বালব লাগনো। টুনিগুলো জ্বলছে নিভছে।

মূর্তি ধরাচুড়ো খুলে ফেলল। কী কাণ্ড, শেষে সরোজশোভন! মুখের কাছ থেকে একটা কাঁসার বাটি খুলে নামিয়ে রাখলেন। হেসে বললেন,—এইটে দিয়েই অমন বেড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছিল। ডক্টর মুখার্জির পরিচালনায় অ্যাক্টিং করলাম, বলুন? একটু হাততালি অন্তত দিন।

মামা বললেন,—দেখলে তো মামনি, সবটাই মানুষের কাণ্ড!

মৌসুমী সজোরে মাথা ঝাঁকাল। কী আশ্চর্য, আচমকা ধাক্কাটা ঠিক ম্যাজিকের মতোই কাজ করেছে। বোবা মৌসুমী আবার আগের মতন! ছটফটে হাসিখুশি। চিৎপাত অনন্তবাবুর দিকে তাকিয়ে সে দু-হাতে তালি দিচ্ছে,—এমা, ভিতু! ভিতু, দুয়ো।

অনন্ত সরখেল কাঁচুমাচু মুখে উঠে বসেছেন।

ঠিক বলেছ মামণি।—মামা বললেন, রাম ভিতু। ওকে খুব ভয় দেখাতে হবে। বলো তো মামণি সেদিন রাতে কী হয়েছিল?

বুঝতে পেরেছি আঙ্কল, সেদিন না সন্ধেবেলায় আন্টির কাছে পড়া শেষ করে মোক্ষদা মাসিকে বলেছি দুধ আর রুটি দিতে, হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। আমি হ্যারিকেন চাইতে যেই না জানলার কাছে গেছি। দেখি বাইরে দিয়ে ঠিক এইরকম আলো জ্বলা একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে। আমি 'ভূত-ভূত' বলে চেঁচিয়ে উঠতে লোকটা ঘুরে এল আমার দিকে। ফিসফিস করে বলছে, ভয় পেয়ো না গো দিদিমণি! আমি গো আমি।

—লোকটার গলাটা কিন্তু খুব চেনা। আমি চেঁচিয়ে বলছি, না-না এসো না।! লোকটা শুনল না। জানলার কাছে এসে মুখ নাচাচ্ছিল আর বলছিল,—'ও দিদিমণি, আমি যে ব্রজহরি গো!' তারপর কিচ্ছু মনে নেই। যখন চোখ খুললাম, তখন আর কথা বলতে পারি না—শুধু ভয় আর ভয়!

মৌসুমী এক নিশ্বাসে বলে গেল। আমরা আগেই চুপ হয়ে গেছি।

মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—বজ্রহরিই যে এসব কাণ্ড ঘটিয়েছে, সেটা আমি আগেই বুঝে গেছিলাম। কারণ অকাট্য প্রমাণ—পায়ের ছাপ। হোটেল 'ইন্দ্রপ্রস্থ'-য় ছাপ, জীবেশের বাগানের ছাপ আর সেদিন দত্ত ম্যানসনে গ্লাস উলটে পড়া জলে ব্রজহরির পায়ের ছাপ তিনটেই হুবহু মিলে গেছে ও যে বাঁ-পা টেনে-টেনে হাঁটে, সেই প্রমাণও রয়েছে পায়ের ছাপে। আর রাতে জীবেশের বাড়িতে বা মৌসুমীকে যে গলায় সে কথা বলেছিল, সেটা হচ্ছে বলার সময় ধাতুর কোনও বস্তু মুখের সামনে লাগিয়ে রেখেছিল, সেটাই একটু আগে নকল করে দেখালেন সরোজবাবু। কিন্তু কাশির শব্দ বা বলার ভঙ্গি পালটাতে পারেনি। বদলাতে পারেনি কথায় মেদিনীপুরের টান। বারবার রেকর্ডেড ভয়েস শুনে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল। তবু মৌসুমীর এই কথাগুলো সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে জোরদার। তবে হ্যাঁ, আপনাদের এখনও অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে, জানি। তবে সেগুলোর জবাব দেওয়ার আগে ব্রজহরিকে সশরীরে ধরা দরকার।

পট্টনায়েক বললেন,—আমি বেরিয়ে পড়েছি। ডিসি নর্থ সুবীরকে ফোনে বলি, দত্ত ম্যানসনে এখনই ফোর্স পাঠাক।

জগুমামা বললেন,—হ্যাঁ, আরেকটা কথা। শিবশঙ্কর দত্ত প্যারালাইজড অবস্থায় মাঝে মাঝে বলছেন, 'জল...আ...জল'। পুরো কথাটা জ্বলন্ত, জলধর নয়!

৯

হাওড়ার গেটে এসে দাঁড়ালাম। টিটি বললেন,—বারো নম্বরে খড়গপুর লোকাল। হুইসল দিয়েছে।

পট্টনায়েক আর আমি প্রাণপ্রণে ছুটেছি, প্ল্যাটফরমে যখন এসে পৌঁছোলাম, ট্রেন তখন স্পিড তুলছে।

ছুটতে-ছুটতে কম্পার্টমেন্টের হাতলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর ঢুকে গেল ভিতরে। পট্টনায়েকও উঠে পড়েছেন।

দরদর করে ঘামছি। কি বিশ্রী ঝুঁকি নিতে হল! উপায়ও ছিল না। এটাই ব্রজহরির পালাবার লাস্ট ট্রেন।

কিছুতেই ফোনে পাওয়া যায়নি কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সুবীর মুখার্জিকে।

দত্ত ম্যানসনে পৌঁছে শুনি, জয়ন্ত দত্ত খানিকটা আগে বেরিয়েছেন। ব্রজহরি একটু আগে বেরিয়ে গেছে। সম্ভবত দেশের দিকে।

সুতরাং তখনি জিপ নিয়ে ছুটেছি হাওড়ার দিকে। সবটাই আন্দাজ। পট্টনায়েক বলেছেন দিঘার কাছে দেশ বজ্রহরির, তাই হাওড়া দিয়ে খড়গপুর বা মেচেদা হয়ে যেতে পারে। দিঘার দিকের বাসগুলোও খুঁজেছি স্ট্যান্ডে গিয়ে। পাইনি।

গ্যালপিং ট্রেন। সব স্টেশনে থামে না। প্রথম স্টেশন সাঁতরাগাছি। ট্রেন থামতেই নেমে ছুটেছি। খুঁজেছি কামরায় কামরায়। চারটে কামরা দেখতে না দেখতে ট্রেন ছেড়ে দিল।

পরের স্টেশন আন্দুল। আবার খোঁজ-খোঁজ—চারটে শেষ হতে না হতে ট্রেন ছেড়ে দিল।

বোঁচকা নিয়ে মফসসলী একজন ট্রেনের মেঝেতে বসে ছিল। জিগ্যেস করলাম,—ভাই, এর পরের স্টেশন উলুবেড়ে?

ঠিক তখনই, ভেসে এল অস্পষ্ট হই-হল্লা। ট্রেনটা থেমে গেছে। দুপাশে ঘোর অন্ধকার, ধুধু প্রান্তর কী ব্যাপার?

আবার নেমে পড়ে দ্রুত এগোলাম ইঞ্জিনের দিকে।

বেশ কিছু লোকের জটলা। দুজনের কথাবার্তা কানে এল,—নলপুরের আগেই লাফ দিল?

—হ্যাঁ।

—আটকাতে পারলেন না?

—দূর মশাই, আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আমার তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া!

দ্বিতীয় লোকটাকে বললাম,—কী হয়েছিল?

আরে মশাই, পুরোপুরি ভৌতিক কাণ্ড!—ভদ্রলোক চোখ বড়-বড় করে বললেন, লোকটা আপাদমস্তক কম্বলমুড়ি দিয়ে সিটের এককোণে বসেছিল। মাঝে একবার আন্দুল আসতে উঠে বাইরের দরজার কাছেও গেছিল। কম্বল ঢাকা ছিল, ভেবেছিলাম, নেমে যাবে। কিন্তু ও ফিরে এসে আবার বসে পড়ল। নিজের মনে বিড়বিড় করছিল, 'ওরা এসে গেছে! ধরে ফেলবে'। তারপর ট্রেন আবাদা যেই ক্রশ করেছে, হঠাৎ উঠে ছুটে গেল দরজার দিকে। কম্বলটা হঠাৎ খসে পড়েছিল ওর গা থেকে। কী বলব মশাই,—ওরে বাপ! ও মানুষ নয়, নিঘঘাত ভূত! ওর সারা শরীর দিয়ে আলো জ্বলছিল, নিভছিল। তার পরেই হঠাৎ ঝাঁপ দিল অন্ধকারে। বাপরে! কী ভয়ানক!

তন্দ্রার মধ্যে কানে এল,—জয়ন্ত, এসে গেছিস। মৌসুমী স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমাদের মিটিং শুরু করছি। তোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

তাড়াতাড়ি চোখেমুখে জল দিয়ে ড্রইংরুমে গিয়ে বসলাম। সকাল দশটা বাজে।

ঘরের মধ্যে বড় সোফটায় জগুমামা। তাঁর চতুর্দিকে সরোজশোভন, জয়ন্ত দত্ত, সত্যসাধন পট্টনায়েক, অনন্ত সরখেল, পুলিশ অফিসার সুবীর মুখার্জি এবং জীবেশ সিংহ রায়।

জগুমামা সিগারেট ধরিয়ে সবার উপর দিয়ে চকিতে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। বোধহয় মন পড়ার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন,

আপনাদের এখানে ডেকে যে এনেছি, সে একরকম বাধ্য হয়ে। দু-দুটো অবাক-রহস্য আমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। প্রথমটা আলো-জ্বলা মারণ-মশা! যাদের কামড়ে প্রাণ গেছিল পাহাড়ি মানুষদের। দ্বিতীয়টা জয়ন্তর জ্যাঠামশাই শিবশঙ্কর দত্তের সেরিব্রাল স্ট্রোক এবং ভয় পেয়ে মৌসুমীর বোবা হয়ে যাওয়া! এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি দ্বিতীয় দুটো কীর্তিই যে ঘটিয়েছিলেন সেই ব্রজহরি পালাতে গিয়ে গতকাল রাতে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। মারাও গেছে। তার শরীর থেকেই আলো জ্বলছিল নিভছিল।

ডক্টর মুখার্জি, প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি। সরোজশোভন বললেন।

—উঁহু। এত অধৈর্য্য হবেন না। বিজ্ঞানটা বেশ জটিল। একটা ছোট্ট অনুরোধ করছি। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, রহস্যের সঙ্গে যে বা যারা জড়িত, তারা এখানেই আছেন। দয়া করে উত্তেজিত হবেন না। বাড়ির চারদিকে পুলিশ ঘিরে রয়েছে।...

প্রথমে বলা যাক, আলো জ্বালা মারণ-মশা আর গা দিয়ে আলো বেরোনো ব্রজহরির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। দুটোর সূত্র একই। জোনাকি পোকা আমরা সবাই দেখেছি। তাদের শরীরে আলো তৈরির মুখ্য ভূমিকা নেয় লুসিফেরিন নামে এক জটিল যৌগ আর লুসিফারেজ নামে এক এনজাইম। লুসিফেরিন বাতাসের সংস্পর্শে আসামাত্র লুসিফারেজ তাকে অক্সিডাইজড করিয়ে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে জোনাকি আলো ছড়াতে শুরু করে। একইসঙ্গে অন্য কয়েকটা যৌগের সঙ্গে প্রতিবর্ত বিক্রিয়ায় লুসিফেরিন আবার ফিরে পায় তার পুরোনো গঠন! এই ভাবে বিক্রিয়াটা চলতেই থাকে আর জোনাকি দপদপ করে আলো ছড়াতে থাকে।

প্রাণীদেহের কোষ সম্বন্ধে জানেন। যে-কোনও জীবের শরীর কোষ দিয়ে পরপর ইটের মতো গাঁথা। প্রতিটা কোষে আছে নিউক্লিয়াস, তার মধ্যে আছে ক্রোমোজোম নামে সুতোর মতো কয়েকটি জিনিস। এই ক্রোমেজোমেই আছে অজস্র 'জিন'! না, এ জিন কোনও ভূত-প্রেত নয়, এই জিন তৈরি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা ডিএনএ দিয়ে। এরা নিয়ন্ত্রণ করে জীবদের চরিত্র আচার আচরণ। এ জিনের অসীম ক্ষমতা।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, জোনাকির ডিএনএ-এর একটু অংশ তার আলো তৈরির কাজ করে। তা হলে যদি জোনাকির কোষ থেকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে ওই অংশটুকু তুলে নিয়ে অন্য জীবদেহের ক্রোমোজোমে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তা হলে কী ঘটবে? যদ্দূর মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে 'সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় এ বিষয়ে একটা লেখাও পড়েছিলাম। তাতে ছাপা হয়েছিল এক তামাক গাছের ছবি,

যার কোষে লুসিফেরিন—লুসিফারেজ জিন ইমপ্ল্যান্টে করা হয়েছে। গোটা তামাকগাছটাই অন্ধকারে আলো ছড়াচ্ছিল।

—তার মানে...তার মানে?

—হ্যাঁ, ব্রজহরি বা মশা দুই ক্ষেত্রেই এই কনসেপ্ট নেওয়া হয়েছে। মশা এবং ব্রজহরির কোষেও জিনটুকু জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

—দুটো কাজই কি একজন গবেষকই করেছেন? পট্টনায়েক বললেন।

ওই পর্যায়ে পরে আসছি।—মামা বললেন, আমার ধারণা আলোজ্বলা মশা তৈরির সময়ে কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না বিজ্ঞানীর। বরং তিনি চেয়েছিলেন, এই আলো জ্বলা মশা সৃষ্টি করতে পারলে মানুষ অন্ধকারে তাকে দেখতে পাবে। সহজেই মারতে পারবে। তারপর এই মশা প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করবে। এক সময় গোটা মশককূল হয়ে যাবে আলো-জ্বলা। কী যুগান্তকারী গবেষণা, ভাবুন। কিন্তু শিব হয়ে গেল শিবা, মশা হয়ে উঠল বিষাক্ত। তবে রক্ষে স্ত্রী-মশার বংশবৃদ্ধি ক্ষমতা ছিল না। ফলে পাহাড়ি মানুষদের মধ্যে আর মৃত্যু ছড়াতে পারেনি।

—কিন্তু এ মশা সেখানে ছাড়ল কে?

—একটু ধৈর্য ধরুন, সরোজবাবু। সব বলব। বিজনবাড়িতে রডরিক চা-বাগানের ম্যানেজার বলেছিলেন শিবশঙ্কর দত্তের সেক্রেটারি জলধর সেন ক'দিন আগে এসে পৌঁছেছিলেন। হপ্তাখানেক থেকেও ছিলেন। হিসেবপত্র বুঝতে। এর পরেই ঘটে যায় মৃত্যুর ঘটনা। শুধু তাই নয়, ক'দিন পরে জলধর সেনের ঘর থেকে পাওয়া কিছু কাগজ, তিনি আমায় পাঠান। আমি নি:সন্দেহ হয়ে যাই, জলধর সেন নিশ্চয়ই একজন বিজ্ঞানী। কারণ সেই কাগজপত্রে আছে মশা জোনাকি এবং তাদের কোষ ও জিন সম্পর্কিত কিছু গবেষণা, তথ্য। অখেয়ালে আমার বিশ্বাস, কোনওভাবে কাগজগুলো মূল ফাইল থেকে খুলে পড়েছিল। জলধর খেয়াল করেননি।

—কিন্তু ডক্টর মুখার্জি, জলধর সেন আসলে কে? সত্যিকারের জলধর তো মারা গেছে বছর দশেক আগে।

—আ:! বড় ডিস্টাব করেন সরোজবাবু। হোটেল ইন্দ্রপ্রস্থে নিরুদ্দেশ জলধরের ঘরে যখন অনুসন্ধান করছি, তখন চোখে পড়ে গেছিল জলধরের ফেলে যাওয়া একজোড়া সাদা নর্থস্টার জুতো। জুতোজোড়ার বাঁ-পায়েরটা একদম নতুন ডান পায়েরটা একটু পুরোনো। এর অর্থ, জলধরের দু-জোড়া আইডেন্টিক্যাল নর্থস্টার ছিল। নিরুদ্দেশ হওয়ার সময় তাড়াহুড়োয় দু-জোড়ার দুটো পরেছিল। বাগডোগরা থেকে প্লেনে ফেরার পথে আমার সঙ্গে যখন বন্ধুবর জীবেশের দেখা হয়, আমার চোখ গিয়ে পড়ে ওর পায়ের দিকে। সাদা নর্থস্টার।

ডান পায়েরটা নতুন বাঁ-পায়েরটা পুরোনো। শুধু কি তাই, নকল জলধরের আবির্ভাবে জীবেশ যখন আতঙ্কিত, রাতে ওর বাড়ি গিয়ে ল্যাবের র‍্যাক থেকে ওর হাতের লেখা কিছু কাগজ আমি গোপনে নিয়ে আসি, সেই হাতের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় বিজনবাড়িতে জলধর সেনের ঘর থেকে পাওয়া কাগজের হাতের লেখা।

ঘরের মধ্যে এখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। শুধু ঘনঘন নিশ্বাস আর একটা ফ্যান চলার সোঁ-সোঁ শব্দ! জীবেশ সিংহ রায় তাকিয়ে আছেন মেঝের দিকে।

সুবীর মুখার্জি বললেন,—এটাই যদি হয়, তা হলে ব্রজহরি জলধর সেজে জীবেশের বাড়িতে হানা দিল কেন?

মামা মাথা নাড়লেন,—গুড কোয়েশ্চেন। উত্তরটা হচ্ছে ব্রজহরিকে তার পরিচালক পাঠিয়েছিল জীবেশকে ভয় দেখিয়ে মারতে। জীবেশ মারা গেলে খুনের দায় জলধরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ত। সে জানত না, যার বাড়িতে পাঠাচ্ছে, সে নিজেই এতকাল জলধরের ভূমিকায় অভিনয় করে এসেছে।

আমরা এবার চলে আসি ব্রজহরি পর্যায়ে।—একটু থেমে জগুমামা বললেন, হোটেল ইন্দ্রপ্রস্থে ঘটনার পরদিন যে চিঠিটা পাওয়া যায়, সেটা সাদা কাগজে লেখা। পোস্ট অফিসের খাম ছিল না। সেই চিঠিতে লেখক ছাড়া আর কার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে জানেন? ব্রজহরির। আর তাকে পাঠিয়েছিল শিবশঙ্কর দত্তেরই ভাইপো জয়ন্ত দত্ত। এই ব্রজহরিকে জয়ন্তই নিয়ে আসে দিঘার রামনগর থেকে।

সবাই হতবাক।

কিন্তু,—পট্টনায়েক একটু পরে বললেন, এই ভয়ংকর অপরাধের মোটিভ কী?

—রাইট। অপরাধের মোটিভ এবার বিশ্লেষণ করা যাক। অ্যাডভোকেট বসন্ত মজুমদার, আমার এক প্রবাসী বন্ধু এবং যুক্তিযুক্ত কিছু অনুমান আমাকে এই সিদ্ধান্তে এনেছে।

আমার বন্ধু জয়ন্ত যখন বদসংসর্গে মিশে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, সেই সময় কলকাতাতে তার আলাপ হয় এক বিদেশি যুবতীর সঙ্গে। তার আলাপ দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়। যুবতীর সঙ্গে সে পাড়ি দেয় আমেরিকায়। ওখানে গিয়ে বিয়ে এবং মৌসুমীর জন্ম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, জয়ন্তর সঙ্গে মেমসায়েবের বনিবনা হল না। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের সময় উভয়পক্ষের সম্মতিতে মৌসুমীকে নিজের কাছেই রাখল জয়ন্ত।

এর মধ্যেই কিছু গোলমেলে কাজ করে জয়ন্ত বরখাস্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। নিরুপায় জয়ন্ত তখন দেশে ফিরবে ঠিক করে। জ্যাঠার অগাধ সম্পত্তি। মৌসুমীকে দেখলে বুড়ো ফিরিয়ে দিতে পারবে না!

জয়ন্ত বিদেশবাসী হওয়ার পর থেকে জীবেশ তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিল। গবেষণা সংক্রান্ত আদানপ্রদানও হত। জয়ন্ত জোনাকির আলো সংক্রান্ত ব্যাপার বিষয়েই গবেষণা করছিল। জীবেশও উৎসাহী

হয়। এবং গোপনে একই গবেষণা শুরু করে। দেশে ফিরে জয়ন্ত জানতে পারে। তখন ব্রজহরিকে জলধর সাজিয়ে পাঠায় প্রতিশোধ নিতে।

জয়ন্ত বাইরে থাকাকালীন জীবেশ সম্পর্ক রাখছিল শিবশঙ্কর দত্তের সঙ্গেও। মাঝেমধ্যে খোঁজখবর নেওয়া। জয়ন্ত তো ত্যাজ্য। তারও লোভ জয়ন্তর জ্যাঠার সম্পত্তি। ঠিক এইসময় ওই বাড়িতে থাকাকালীন তার হাতে সম্ভবত এসে পড়েছিল শচীন সেনের চিঠি। জ্যাঠাকে লিখেছেন তাঁর বন্ধুর ছেলের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে।

ব্যস! জীবেশের মাথায় দুর্বুদ্ধি খেলে গেল। চিঠিটা জ্যাঠার কাছে পৌঁছোলই না। পরিবর্তে বোম্বে থেকে 'জলধরকে পাঠাচ্ছি', এই মর্মে পাঠানোর চিঠি দিল নকল শচীন সেন! তারপর এই ক'বছর ধরে জীবেশ জলধরের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছিল। মেকআপ নিয়ে।

এই অবধি বলে মামা থামলেন।

সামনে রাখা জাগের জল খানিকা গলায় ঢেলে ফের শুরু করলেন, জলধরের মধুর ব্যবহারে দারুণ খুশি শিবশঙ্কর তাকে লিখে দিলেন সম্পত্তির সিংহভাগ। কিন্তু মুশকিল হল সকন্যা জয়ন্ত দেশে ফেরায়। ছোট্ট নাতনিকে পেয়ে মন ঘুরে গেল শিবশঙ্করের। তিনি জয়ন্তর কথা বিশ্বাস করলেন। পরপর দুবার উইল পালটে শেষে সম্পত্তির সিংহভাগ তিনি দিয়ে দিলেন মৌসুমীকে। ততদিনে গরীব ব্রজহরিকে প্রচুর টাকার টোপ দিয়ে জয়ন্ত তাকে রিসার্চের গিনিপিগ হতে রাজি করিয়ে ফেলেছে। রিসার্চ সফল হল! তাই শেষ উইল রেজিস্ট্রি হওয়ার পরপর জয়ন্ত ঠিক করে ফেলল, আর দেরি নয়! ব্রজহরিকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে জ্যাঠাকে শেষ করে দিতে হবে। বুড়োর মন যদি আবার ঘুরে যায়, তখন? এর পরই হোটেলে রাতে ঘটল ওই সেরিব্রাল স্ট্রোক। আতঙ্কে।

—কিন্তু জলধর নিখোঁজ হল কেন?

খুব স্বাভাবিক। জলধর বা জীবেশ ভাবল, জ্যাঠার সঙ্গে সে ছিল। সন্দেহ তার ঘাড়ে পড়তেও পারে। আবার তদন্তে যদি ফাঁস হয়ে যায়, সে আসল নয়, নকল, তখন? তার চেয়ে স্বনামে কিছুদিন চুপচাপ থাকা যাক, গা ঢাকা দিয়ে।

—বুঝলাম। জয়ন্তবাবু না হয় বেইমানির সাজা দিতে ব্রজহরিকে জলধর সাজিয়ে জীবেশবাবুর কাছে পাঠালেন! কিন্তু জীবেশবাবু ফের জলধর সেজে জয়ন্তবাবুর ওপর জিপ নিয়ে চড়াও হলেন কেন?

—ভেরি সিম্পল, পট্টনায়েক। জীবেশ জয়ন্ত ফিরে আসাতে তার উপর প্রচণ্ড খাপ্পা ছিল। সম্পত্তির অংশ কমে গেছে! তারপর যখন সে আঁচ করল জয়ন্তই তাকে ভয় দেখাতে পাঠিয়েছে ব্রজহরিকে, তখন সে কি ছেড়ে দেবে? আর জলধর সাজা তো তার পক্ষে সবচেয়ে সহজ!

—এক মিনিট মামা। ব্রজহরি মৌসুমীকে ভয় দেখাল কেন?

না-না! ভয় দেখাতে চায়নি। স্রেফ কোইনসিডেন্স। প্রবাদ আছে না, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আসলে ব্রজহরি তখন তৈরি হচ্ছিল জীবেশের বাড়িতে যাবে বলে। গায়ে তার কম্বলটা ছিল না। হঠাৎ লোডশেডিং। আর ঠিক সেই সময় বেচারি মৌসুমী মুখ বাড়িয়েছিল জানলায়। ব্যস, নিজের অস্ত্র বুমেরাং হয়ে এল জয়ন্তর কাছে। একমাত্র মেয়ে বোবা! মৌসুমী আমাদের এই তদন্তে বিরাট সাহায্য করেছে।

সরোজশোভন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—আমার কষ্ট হচ্ছে বেচারি ব্রজহরির জন্যে। ওর সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল, ও গরীব। তাই ওকে জয়ন্তবাবুর হাতে পুতুল হতে হয়েছিল। ধরা পড়ার ভয়ে প্রাণটাও গেল।

তাই তো চিরকাল হয় মশাই। রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।—সুবীর মুখার্জি বললেন।

অনন্ত সরখেল উসখুশ করছিলেন। ফাঁক পেতেই বলে উঠলেন,—আপনারা বলুন, আমার 'স্যার' কেমন দিলেন! সেই গানটা জানেন, 'তোমার উপমা তুমিই মামা, তোমার গুণের নেই কো শেষ।'

গানটা কার? সরোজশোভন ভ্রু কুঁচকে বললেন।

—এহেঁ, তাও জানেন না? ডি. এল. রায়ের। ভারতবর্ষ। অবশ্যি একটু চেঞ্জ করেছি।

শারদীয়া ১৯৮৮

মুখোশের আড়ালে

১

চল গলাটা একটু ভিজিয়ে আসি।

—চলো।

পাশের চায়ের দোকানের দিকে এগোলাম। বাস আসতে এখনও বেশ দেরি।

নেতারহাট থেকে যে সময় রওনা হয়েছিলাম, মাঝপথে বাসের টায়ার না ফাটলে আগের বাসটাই ধরা যেত।

মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে টানা তিনমাসের ছুটি। পিকলুর আবার গরমের ছুটির পরপরই সেকেন্ড টার্ম পরীক্ষা। বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে কোথাও যে বেড়িয়ে আসব, সে উপায় নেই।

কিন্তু জগুমামা, যাঁকে সকলে এক ডাকে চেনে ডক্টর মুখার্জি নামে, তিনি কিন্তু ঠিক মনে রেখেছিলেন তার ভাগ্নের কথা।

মাধ্যমিকের পরে সবে দিনদশেক কেটেছে, হঠাৎ একদিন বাড়িতে এসে হাজির হলেন মামা। বললেন, —চ টুকলু, কোথাও ঘুরে আসি।

এ যে মেঘ না চাইতে জল!—কোথায় মামা?

—বিহারে বিহার! অর্থাৎ বিহার* রাজ্যে বেড়ানো। আমাদের একেবারে পাশেই, আবার প্রচুর দেখার জায়গাও আছে। দিন পনেরোর একটা ছুটি পেয়েছি। তার মধ্যে যতটা পারি, ঘোরা যাবে।

সুতরাং চটপট লাগেজ গুছিয়ে পরদিনই রাঁচি এক্সপ্রেস ধরে রাঁচি। সেখানে অনন্ত সরখেলের সঙ্গে দেখা করে, অতিকষ্টে তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তার পরের দিন সোজা নেতারহাট।

প্রথমবার রাঁচি গিয়ে দেখা হয়নি বলে আপশোস ছিল। এবারে দেখে বুঝলাম, সেটা একদম যথার্থ। বনপাহাড় রাজ্যে ভারী চমৎকার জায়গা। গাঢ় সবুজ ঝাউ-পাইন-শিমূল-শিরীষের বন। দূরে অন্য পাহাড় চিরে কোয়েল নামছে রুপোলি ফিতের মতো। ছোট-ছোট ছড়ানো ছিটোনো বাংলো, আর সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত? অপূর্ব!

দেড়দিন ওখানে কাটিয়ে ভোর-ভোর চেপে বসেছি রাঁচিগামী বাসে। কুরুতে নেমে বাস বদল করে রওনা হতে হবে ডালটনগঞ্জের দিকে। সেখান থেকে 'বেতলা ন্যাশনাল পার্ক'। পাহাড় ছেড়ে এবার যাচ্ছি জঙ্গলে।

কিন্তু কপালে দুর্ভোগ। আমরা এখন বসে আছি কুরুর এক চায়ের দোকানে। বাসের অপেক্ষায়।

মামা বললেন,—পরের বাসটা ঠিকঠাক এলে হয়। যা অবস্থা হয়েছে, কোনওকিছুই ঠিকমতো চলছে না।

—চলবেটা কী করে? জানো মামা, কিছুদিন আগে কিশোর ভারতীতে একটা সম্পাদকীয় পড়েছিলাম। তার হেডিং ছিল, মস্তকে দংশেছে ফণী, তাগা বাঁধবি কোথা? দেশটার সবচেয়ে উপরমহলেই করাপসনের বিষ ঢুকে পড়েছে। সেখানে পুরো সিস্টেমটা...

বাসের গর্জন শোনা গেল।

লাফিয়ে এলাম বাইরে। হ্যাঁ, রাঁচির দিক থেকেই আসছে! ইয়েস! লেখা আছে ডালটনগঞ্জ!

আদৌ ট্যুরিস্ট বাস নয়। একেবারে সাধারণ মানুষদের বাস। দমচাপা ভিড়, গাঁ-গঞ্জের আদিবাসী মানুষজনে বোঝাই। এমনকী ছাদও খালি নেই, সেখানেও মানুষ।

ব্যাগ নিয়ে ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকেছি, উফ, কী ভ্যাপসা গরম! দরদর করে ঘামছি।

জগুমামা নির্বিকার। হেসে বললেন,—এতেই কষ্ট হচ্ছে রে? এই মানুষগুলোকে দ্যাখ। কোনও কষ্ট নেই। দিব্যি গপ্পো করতে-করতে চলেছে। আসলে কি জানিস, শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়!

মামা!—নীচু গলায় বললাম,—কোনাকুনি সিটের লোকটাকে দেখেছ? ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, গগলস।

—হু, দেখেছি।

বাসে চাপার একটু পর থেকে আমার চোখ চলে গেছিল লোকটার দিকে। কোনও 'বাবু' শ্রেণির লোক এ বাসে থাকলে অন্যদের ভিড়ে তাকে নজরে পড়বেই। তার উপর লোকটি আড়চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

কপালজোর, সামনের সিটদুটো ফাঁকা হয়ে গেল। চটপট বসে পড়লাম। সন্দেহজনক লোকটি ঠিক আমাদের পেছনে।

হঠাৎ লোকটি ঝুঁকে পড়ল আমাদের ঘাড়ের ওপর। গম্ভীরভাবে বলল,—যাচ্ছেন কোথায়?

—যাচ্ছি শেষ পর্যন্ত।—কিন্তু পট্টনায়েক হঠাৎ এই ছদ্মবেশে কেন?

—অ্যাঁ! চিনতে পেরেছেন? সাংঘাতিক চোখ তো আপনার। কিন্তু ডক্টর মুখার্জি অন্য কেউ চিনতে পারবে না তো?

—তা পারবে না। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—আপনি জানেন না? আমি তো ভাবলাম, আপনিও বোধহয় একই উদ্দেশ্যে—

—মোটেই না। আমরা এবারে স্রেফ বেড়াতে!

সিবিআইয়ের ইনস্পেক্টর জেনারেল এবং মামার বন্ধু সত্যসাধন পট্টনায়েকের ছদ্মবেশটা বেশ জবরদস্ত।

পট্টনায়েক কিছু ভাবলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন,—বুঝলেন ডক্টর মুখার্জি, বেতলা ফরেস্টে সম্প্রতি খুব ঝামেলা শুরু হয়েছে। কথা নেই, বার্তা নেই, বনের পশুরা সব নাকি খেপে উঠেছে। বিশেষত যারা মাংসাশী। তাদের হাত থেকে তৃণভোজী পশুরা তো বটেই, মানুষজনও রেহাই পাচ্ছে না। এর মধ্যেই বনবিশেষজ্ঞদের দু-দুটো দল বেতলা ট্যুর করে গেছেন। কিন্তু কোনও কারণ পাননি।

আপনি কী করতে যাচ্ছেন? গোয়েন্দাদের চোখ দিয়ে কারণ খুঁজতে?

—রাইট।

আমার ধারণা। বনের মধ্যে গোপন গাছকাটা বা চোরাশিকারিদের চক্র কাজ করছে। তার জন্যেই এই ভয়ানক অবস্থা। একটা কথা বলব স্যার?

—বলুন।

—আপনি একটু থাকুন না, প্লিজ—! আমি একা ঠিক—

—হুম! টুকলু, তাহলে—?

—চ—চলো।

বললাম বটে, তবে দীর্ঘনিশ্বাসটা জোরেই পড়ল। হয়ে গেল বেড়ানোর পিণ্ডি চটকানো!

২

বেতলা বনের রেঞ্জার জগমোহন লাল মানুষটি ভারী অমায়িক। তার বাংলোয় বসে কথা হচ্ছিল।

মামাকে সঙ্গে পাওয়ার পর থেকে পট্টনায়েক বেশ মেজাজে আছেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন,—বুঝলেন মিস্টার লাল, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়! ডক্টর মুখার্জিকে যখন পেয়ে গেছি তখন আর চিন্তা নেই। মিস্ট্রি একরকম সলভড হয়ে গেছে, ধরে নিতে পারেন।

—ক'দ্দিন আগে থেকে এই অভ্যেসটা হয়েছে পট্টনায়েক?

—কোনটা?

—এই পিঠ চুলকোনো? কথা নেই বার্তা নেই অকারণে চুলকাতে লেগেছেন?

হা: হা:—সশব্দে হেসে উঠলেন মি: লাল, পারফেক্ট! তবে শুনুন মুখার্জি স্যার, আপনার নাম কাজকর্ম সবই আমি কিছু-কিছু শুনেছি। সেদিক দিয়ে আই জি সাহেব কিছু বাড়িয়ে বলেননি।

যাকগে। ডক্টর মুখার্জির যখন ইচ্ছে নয়।—পট্টনায়েক বললেন, এদিকের খবর বলুন।

খবর খুব খারাপ!—লালের মুখে কালো ছায়া ঘনিয়ে এল। বললেন, বন্যজন্তুরা খেপে উঠেছে, যাকে তাকে আক্রমণ করছে, এ তো ঘটছেই। তার উপর গত পরশু থেকে বনের মধ্যে নিখোঁজ হয়েছে একজন জ্যুলজিস্ট!

—জ্যুলজিস্ট!

—হ্যাঁ! ভদ্রলোকের নাম কে সি ভেঙ্কটসুন্দরম। ম্যাড্রাস য়ুনিভার্সিটির জ্যুলজির অধ্যাপক। বন্যজন্তুর হাবভাব আচার ব্যবহার ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্যে গত দেড় মাস বেতলায় পড়ে ছিলেন। থাকতেন রেস্ট হাউসের একখানা ঘরে। রোজ ভোরবেলা ব্রেকফাস্ট করে একগাদা ঝোলাঝুলি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন। সারাদিন বনে কাটিয়ে ফিরতেন সন্ধের পর। কোনও কোনওদিন সাতটাও বেজে যেত।

আমরা রুদ্ধশ্বাস।

—গতকাল সারাদিন জঙ্গলে তন্নতন্ন করে তাঁকে খুঁজেছি। সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে বছর কুড়ির এক সাঁওতাল ছেলেকে জুটিয়ে ছিলেন। সারাদিন ছেলেটি থাকত ভেঙ্কটের সঙ্গে। গত পরশুও অন্য দিনের মতো কাজ সেরে সে নিজের বাড়ি ফিরে যায়। ভেঙ্কট রেস্ট হাউসের পথ ধরেছিলেন। অন্তত দুজন আলাদা হওয়ার আগে পর্যন্ত। সকালে ভেঙ্কটকে ডাকতে গিয়ে সে দেখে, বাবু নেই। তাকে নিয়ে আমরা সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেছি। কোথাও ট্রেস নেই!

আমার দুটো প্রশ্ন আছে।—জগুমামা বললেন, একনম্বর, বন্যজন্তুদের এরকম খ্যাপাটে স্বভাব কবে থেকে আপনাদের নজরে এসেছে? দুনম্বর, এরকম পরিস্থিতি হওয়ার পরেও আপনি ভেঙ্কটকে বনে ঢোকার পারমিশান দিলেন কেন?

ঠিকই বলেছেন।—লাল মাথা নেড়ে বললেন, ভুল আমারই। আমি ভেঙ্কটকে মানা করেছিলাম। উনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি জ্যুলজির লোক, পারলে আমিই পারব এর কারণ খুঁজে বের করতে। তা ছাড়া এরকম আনন্যাচারাল বিহেভিয়ার তো আমার রিসার্চের অন্যতম 'সাবজেক্ট'। আর আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল, কমবেশি তিন উইক জন্তুদের এই বিহেভিয়ার আমাদের নজরে এসেছে।

—হুঁ! ওই আদিবাসী ছেলেটিকে একবার ডাকা যাবে?

নিশ্চয়ই!—লাল চেঁচিয়ে উঠলেন, এই ছবিল, বীরুকে—

লালের কথা শেষ হল না, হঠাৎ বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্নস্বর এসে আছড়ে পড়ল,—বাবু অ রিনজারবাবু গ!

বীরুর গলা!—বলতে বলতে লাল দ্রুতপায়ে বেরলেন।

ছেলেটিও চলে এসেছে একেবারে সামনে। তার দু-চোখ বিস্ফারিত। হাঁফাতে-হাঁফাতে সে বলে উঠল,—সাব খুন হইছে। বনের মধ্যে লাশ!

শিউরে উঠলাম।

—চলুন পট্টনায়েক!

দ্রুত বাইরে দাঁড়ানো ফরেস্টের জিপে উঠে বসলাম। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বীরু।

প্রায় মাইল তিনেক চলার পর জিপ থামল। বন এখানে পাতলা। নামতে নামতে চোখে পড়ল, একটু দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু লোকজন। বেশির ভাগই আদিবাসী মানুষ।

গুঞ্জন উঠল, সাহাবরা সব আয়েসে, হটে যা, হটে যা সব।

—ঈস—স! এ কী!

আতঙ্কে কেঁপে উঠেছে শরীর। কী বীভৎস। মৃহদেহের মুখ চেনার উপায় নেই। কোনও হিংস্র জন্তু ভয়ংকর আক্রোশে কামড়ে কামড়ে তাকে ফালাফালা করে দিয়েছে। দেহের অন্য অংশেও হিংস্র কামড়ের দগদগে ক্ষত। প্যান্ট শার্ট ছিন্নভিন্ন।

বীরু অস্ফুটে বলে ওঠে,—চিনা যায় নাগ বাবু। আমি সাবের হার দেখে চিনলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে চোখ চলে গেছে গলার দিকে। সোনার চেনটি অক্ষত। তার লকেটে ইংরেজিতে মিনে করা তিনটি অক্ষর—কে সি ভি। ভেঙ্কটসুন্দরমের নামের আদ্যক্ষর।

জগুমামার চোখ শুধু মৃতদেহের ওপর নিবদ্ধ নয়, চারপাশে ঘুরছে। একটু দূর থেকে তিনি কুড়িয়ে আনলেন একটা গোল্ডফ্রেমের চশমা। সেটাও প্রায় অক্ষত।

চশমাটা দেখেই বীরু উত্তেজিত হয়ে উঠল, হাঁ বাবু। ইটি সাহাবের চশমা বটে। কুথায় লটকে পড়িছিল জানোয়ারের ঘায়ে।

জগুমামা বসে পড়েছেন মৃতদেহের পাশে। হারটা তুলে নেড়েচেড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছেন।

ক্লিক! ক্লিক! ক্যামেরার ফ্ল্যাশ! কোত্থেকে এক শহুরে ভদ্রলোক উদয় হয়ে ছবি তুলছেন।

পট্টনায়েক ঝাঁঝাল গলায় বললেন,—কী ব্যাপার? কে আপনি?

আমি রিপোর্টার।—বিনীত হাসিতে মুখ ভরিয়ে ভদ্রলোক পকেট থেকে কার্ড বার করে এগিয়ে দিলেন। পি কে থ্যাকারে, রিপোর্টার মগধ সমাচার ও বম্বে নিউজ।

রিপোর্টার এই জঙ্গলে হাজির হয়ে গেছে? বাপস!

পট্টনায়েকও বিষয়টা বোঝেন। তাই তাঁর গলা মুহূর্তে নরম হয়ে গেল,—মিস্টার থ্যাকারে, আমাদের কিন্তু একটা অনুরোধ আছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কিছু আনন্যাচারাল ইনসিডেন্সের জন্যে এই বন এখন প্রহিবিটেড করা হয়েছে। সেই ব্যাপারেই তদন্ত চলছে। আমরা চাই না, এ ব্যাপারে কোনও ছবি বা সংবাদ বেরোক।

ঠিক আছে!—থ্যাকারে হেসে বললেন, তবে একটা শর্ত তদন্তের রেজাল্ট সবার আগে যেন আমরা ছাপতে পারি। আমাদের পত্রিকার স্কুপ।

—নিশ্চয়ই। আপনাকে ফোন করে জানাব, কথা দিচ্ছি।

—থ্যাঙ্কিউ। আপনাদের পরিচয় জানতে পারি কি?

আমি একজন সরকারি বিজ্ঞানী।—পট্টনায়েক বললেন, এখানে এসেছি জন্তুজানোয়ারদের আনন্যাচারাল বিহেভিয়ারের কারণ খুঁজে বের করতে। আর এই দুজন হলেন রেঞ্জার মিস্টার লালের পুরোনো বন্ধু আর তাঁর ভাগ্নে। বেড়াতে এসেছিলেন। আটকে গেছেন।

—ওকে, ওকে । খুব ভালো লাগল, আলাপ করে। চলি নমস্কার।

কয়েকজন আদিবাসী বলে উঠল,—রিনজার সাব, ই বাবুটো কিন্তু পরথম সে ইখানে ছিলেন। আপনারা আসার আগেতক বারবার নেড়েচেড়ে দিখছিলেন লাশটা।

৩

মিনিট পাঁচেক হল ঘুম ভেঙে উঠেছি। এখন সকাল সাতটা, এর মধ্যেই পালমৌ অরণ্য পাখপাখালির কূজনে মুখরিত হয়ে উঠেছে। কিছুদূরেই নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হরিণের দল। শান্ত স্নিগ্ধ তপোবন।

বনবিভাগের রেস্ট হাউসের সামনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখছি সবুজ বনানী। এমন শান্ত সুন্দর জায়গাতে শুরু হল খুনোখুনি? পৃথিবীতে কি আর শান্তির নীড় থাকবে না কোথাও?

গতকাল ভেঙ্কটসুন্দরমের মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ফরেস্ট অফিসের রেজিস্টার থেকে বের করা হয়েছে ভেঙ্কটের মাদ্রাজের ঠিকানা। মাদ্রাজ রওনা হয়ে গেছেন পট্টনায়েক।

এই সবই হয়েছে জগুমামার কথামতো। আগামীকাল পট্টনায়েকের ফেরার কথা।

হঠাৎ পিঠে হাত। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, জগুমামা! বললাম,—কিছু বুঝছ?

এখনও নয়!—মামা বললেন, বেশ জটিল। বেড়াতে এসে কী ঝঞ্ঝাট বল তো! তোর বেড়ানোটাই মাটি হল।

—ধ্যুৎ!—বেড়ানো কি পালিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু মামা, নিখোঁজ হবার দুদিন পরে বন্যজন্তুদের হাতে ভেঙ্কট মারা পড়লেন কেন? মানে বলছি, উনি এ দুদিন কোথায় ছিলেন?

হুঁ—ভেঙ্কট! —মামা আচ্ছন্নের মতো বললেন, এটা মৃত্যু—খুন...! মানুষের হাতে হয়েছে।

—মানুষের হাতে!

—হ্যাঁ। আমি একশোভাগ নিশ্চিত।

—তা হলে তো সবচেয়ে আগে আমাদের দরকার ভেঙ্কটসুন্দরমের পুরো বায়োডাটা?

—নিশ্চয়ই। তার জন্যেই ওয়েট করছি। টুকলু, চটপট রেডি হয়ে নে। বনে একবার চক্কর মারতে যাব। বুঝলি, এই খুনের রহস্য সবটাই লুকিয়ে আছে বনের গভীরে। আর—

—আর?

—আর বনের জানোয়ারদের খেপে ওঠার সঙ্গে খুনের স্পষ্ট লিঙ্ক আছে। সেই লিঙ্ক খুঁজে বের করতে হবে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। জগুমামা জিপ চালাচ্ছেন, পাশে আমি। জঙ্গল ক্রমেই গভীর হচ্ছে। মাঝে-মাঝে ফাঁকা-ফাঁকা ঘাসবন, ঠিক যেন ছোট-ছোট দ্বীপ। সেখানে গাওর বা বুনো মোষের পাল চরে বেড়াচ্ছে।

ছমছম করছে শরীর। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। আজকেই কিছু একটা ঘটে যাবে না তো?

'ফ্যা-চ' শব্দ করে একটা বনবিড়াল রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। আমাদের জিপ আস্তে-আস্তে বন চিরে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ মামা স্টার্ট বন্ধ করে দিলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন,—শুনতে পাচ্ছিস কিছু?

—হ্যাঁ, তাই তো! বনের ভিতর থেকে কিছু লোকের ক্ষীণ কথোপকথন ভেসে আসছে।

চট করে নেমে পড়লেন মামা। ছোট্ট রিভলভারটা পকেট থেকে মামার হাতে উঠে এসেছে। পা টিপে-টিপে এগোচ্ছি।

বন এখানে বেশ ঘন, ঠাসবুনোট গাছপালা। প্রখর রৌদ্রেও জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে। আমরা এগোচ্ছি। কণ্ঠস্বরও স্পষ্ট হচ্ছে। একজনের ভাষা শহুরে হিন্দি, অন্যদের আদিবাসী টান। শহুরে গলা কোথায় যেন শুনেছি?

আর একটু এগোতে সামনের বন ফাঁকা মাঠের মতন। তার পরেই থমকে দাঁড়িয়েছি। এ কী?

এখানে রিপোর্টার থ্যাকারে? তার সামনে কয়েকজন আদিবাসী যুবক।

থ্যাকারে বলছে,—তা হলে সব ঠিকঠাক, কেমন? ওই কথাই থাকল। তোমাদের একমাত্র কাজ বদমাশ আদমিটাকে খুঁজে বার করা। আমি সিওর, ওই শয়তানটা এই বনেই লুকিয়ে আছে। ফাঁক পেলেই আমায় খুন করবে। ওকে ধরতে পারলে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে। যা করার করব। হ্যাঁ, আরেকটা কথা। রেস্ট হাউসের নতুন যে তিনজন এসেছে, ওদের দিকেও নজর রাখবে।

গুড়ুম! গুড়ুম! সাঁ করে পরপর দুটো গুলি ছুটে এল বনের উত্তর দিক থেকে। থ্যাকারের কান ঘেঁসে দু-দুটোই গিয়ে বিঁধল পেছনের শালগাছে।

মুহূর্তে উপুড় হয়ে পড়ল গোটা দল। আমাদের বিস্ময়ের তখনও বাকি। দেখলাম, সাংবাদিক থ্যাকারের ঝোলাব্যাগ থেকেও বেরিয়ে এসেছে রিভলভার, শুয়ে থাকা অবস্থাতেই সে ফায়ারিং করল। উত্তর দিক থেকে আবার জবাব এল—গুড়ুম-গুড়ুম! থ হয়ে দেখছি, রিপোর্টারের বাহিনি গেরিলাদের মতো হামাগুড়ি মেরে এগোতে শুরু করেছে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঘনঘন গুলির লড়াই চলেছে। হঠাৎ পাশে তাকাতে শিরদাঁড়া দিয়ে বরফস্রোত নেমে গেল। মামা পাশে নেই।

কী করব? সারা শরীর ভয়ে কাঁপছে। আমি একা! মামা কোথায়?

প্রাণপণে সাহস এনে এদিক-ওদিক ব্যাকুল হয়ে দেখছি। আরে! ওই তো মামা, পা টিপে-টিপে উত্তর দিকেই এগোচ্ছেন। বন ঘুরে।

মামাকে দেখতে পেয়েই সাহস বেড়ে গেছে। মামার পেছনে-পেছনে এগোচ্ছি। মামা পেছন ঘুরে আমায় একবার দেখলেন।

অকস্মাৎ মামা আমাকে জাপটে ধরে বাঁ-দিকে হেলে পড়লেন। পরক্ষণেই বাতাসে 'হিস-স' শব্দ তুলে একটা তির এসে কাঁপতে থাকল আমাদের সামনের গাছটার গায়ে। তার মানে? এবার লক্ষ্য আমরা?

কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। ভয়ংকর হুংকার ছেড়ে মামা হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন ভূমি শয্যা ছেড়ে। বিদ্যুদ্বেগে ছুটতে শুরু করলেন এঁকেবেঁকে। সামনের দিকে। হাতের রিভলভার বারবার অগ্নিবর্ষণ করছে—গুড়ুম, গুড়ুম,...!

আমি কম্পমান দর্শক। দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোনও ক্ষমতা নেই। গাছের ফাঁক দিয়ে আমি দেখছি...মামা ছুটে চলেছেন...এঁকে-বেঁকে...একদল মানুষ ছুটে পালাচ্ছে...ঝোপঝাড়ে খসখস শব্দ...গোলা বা তিরবর্ষণ সব থেমে গেছে...

অনেকখানি দৌড়ে মামা থেমে গেলেন। অপরাধীরা পালিয়ে গেছে। বনরাজ্য আবার নিঝুম। দু-একটা পাখির 'টুঁই-টুঁই ছাড়া কোথায় শব্দ নেই।

সংবিত সাহস ফিরে এসেছে। মামার দিকে দৌড়তে যাচ্ছি, মামা হাত নেড়ে থামালেন। বললেন,—ওদিকে, ওদিকে চল থ্যাকারের দলকে হাতে পেলেও হবে।

বলতে-বলতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন পিছন দিকে। ধ্যুস! কোথায় কী? সব সুনসান। মাটিতে শুধু কিছু পায়ের ছাপ। আর কিছু নেই। বিবদমান দু-পক্ষ বনের গভীরে উধাও হয়ে গেছে।

৪

মাঝে একটা দিন পার হয়ে গেছে। পরশু রেস্ট হাউসে ফেরার পর থেকে মামা মৌনী মামা। কোনও প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। শুধু তাকিয়ে থাকছেন। মাঝে মাঝে নোটবইতে কীসব লেখালেখি—আঁক জোক করছেন। আবার একটু পরেই অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন আর নিজের মনে বলছেন,—তা হলে? তা হলে এটা হয় কী করে?

এই 'তা হলে' কী ব্যাপারটা যে কী, কারও পক্ষে বোঝার কথা নয়।

রেঞ্জার জগমোহন লাল যথারীতি আসছেন। আজ এখনও তাঁর আসার সময় হয়নি। গতকাল সকালে তিনি সবিনয়ে শুধু একবার জিগ্যেস করেছিলেন, স্যার কোনও সূত্র মিলেছে।

ব্যস! মামা খেপে লাল। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, মিস্টার লাল, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বনের সিকিউরিটি দেখে। এত উইক!

এখানে যে-কোনও সময় যা কিছু ঘটতে পারে। আমায় ছেড়ে আগে ওদিকটা ঠিক করুন গে, বুঝলেন।

লাল খুবই ঠান্ডা মানুষ। তাই এরপরও বিনীতভাবে বলেছেন,—স্যার, আমি বনের সংরক্ষিত অঞ্চলের ম্যাপটা নিয়ে আসছি। বনের কোথায়-কোথায় গার্ড পোস্টিং করব, যদি দয়া করে একটু দেখিয়ে দেন।

এরপর মামার মাথা ঠান্ডা হতে সময় লাগেনি। সরকারি ম্যাপটা হাতে নিয়ে বনের কোন কোন পয়েন্টে গার্ড পোস্টিং করতে হবে, মামা লালকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

তারপর থেকে বন এখনও শান্ত। কোনও খারাপ খবর আসেনি।

বাইরে জিপের শব্দ এবং হর্ন। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, জিপ থেকে নামছেন পট্টনায়েক। সেই একই ছদ্মবেশ। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, চোখে গগলস হাতে ব্রিফকেস।

পট্টনায়েককে দেখেই মামা চনমনে হয়ে উঠলেন। বললেন,—আরে, আসুন, আসুন! কী খবর? উফ! আমি যে কী উৎকণ্ঠায় আছি।

পট্টনায়েক ধীরেসুস্থে সোফায় বসলেন। বললেন,—খবর অনেক। কিন্তু সবার আগে এখন চাই গরম কফি।

ঝড়ের বেগে কিচেনে অর্ডার করে এলাম। মামা ইতিমধ্যে একটি সিগারেট এগিয়ে দিয়েছেন। পট্টনায়েক তাতে বুভুক্ষুর মতো টান দিচ্ছেন।

কফি এসে গেল। চুমুক দিয়ে পট্টনায়েক বললেন,—ডক্টর মুখার্জি গত দুদিন মাদ্রাজ শহরে ঘুরেছি চরকির মতো। ভেঙ্কটসুন্দরমের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী কাউকে জেরা করতে ছাড়িনি। তার সম্বন্ধে পাওয়া খবরগুলো এক জায়গায় পরপর নোট করেছি। তা ছাড়া এনেছি কয়েকটা ফোটোও। মনে হয় এতে আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে।

—বা: বা:! শুরু করুন প্লিজ।

পট্টনায়েক পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে বলতে শুরু করলেন।

এক—ভেঙ্কটসুন্দরম অবিবাহিত। দাদা-বউদি, বিবাহিতা বোন আছেন। বাবা-মা গত হয়েছেন। একা থাকতেন, আলাদা একটি বাসা ভাড়া করে। পেশায় য়ুনিভার্সিটির জ্যুলজির অধ্যাপক।

দুই—য়ুনিভার্সিটির ল্যাবরেটরি ছাড়াও ভেঙ্কট কাজ করতেন মাদ্রাজ শহর ছাড়িয়ে মফসসল এলাকায় একটি বাসা ভাড়া করে। সেখানে ভেঙ্কট একা নয়, তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে আরেক বিজ্ঞানীও কাজ করতেন। তিনি ভেঙ্কটের রিসার্চ পার্টনার। চমকে উঠবেন না, বিজ্ঞানীর নাম পি কে থ্যাকারে।

—এক সেকেন্ডে! তার মানে, আমাদের সঙ্গে যে রিপোর্টারের আলাপ হয়েছিল—

—হ্যাঁ ডক্টর মুখার্জি, একই লোক। আমি যে ফোটোগুলো জোগাড় করেছি, সেখানে ভেঙ্কটসুন্দরমের সঙ্গে তাকেই দেখা যাচ্ছে। দেখাচ্ছি। তার আগে, পুরো রিপোর্টটা শুনুন। চমকে ওঠার আরও অনেক কিছু আছে।

তিন—যদ্দুর জেনেছি, দুই বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয় ছিল প্রাণীদের মস্তিষ্ক। বিভিন্ন ধরনের জানোয়ারের ওপর তাঁরা গবেষণা চালাচ্ছিলেন। ওঁদের ল্যাবরেটরিতে গেছিলাম। সে এক চিড়িয়াখানা। কতরকমের জানোয়ার যে আছে।

চার—এদের সহকর্মী ও প্রতিবেশী বললেন, একদিন নাকি দুই বিজ্ঞানী বন্ধুর মধ্যে তীব্র মতভেদ হয়। সেটা শেষ পর্যন্ত এমনই চরমে ওঠে যে, হঠাৎ একদিন য়ুনির্ভার্সিটি থেকে দু-মাসের ছুটি নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান ভেঙ্কটসুন্দরম। কোথায় তিনি যাচ্ছেন, কাউকেই জানাননি। তার দু-একদিনের মধ্যে থ্যাকারে এসে হাজির হয় য়ুনিভার্সিটিতে। সে যখন শোনে যে ভেঙ্কট নেই, তখন সবার সামনেই গর্জন করে ওঠে, 'আই মাস্ট গেট হিম অ্যান্ড টিচ হিম আ গুড লেসন!'

মামা বলে ওঠেন,—তারপর?

—তারপর আর কি? তার পরের খবর সব এখানে।

—থ্যাকারের প্রফেশন কী ছিল?

—গভর্নমেন্ট স্পনসরড একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে থ্যাকারে যুক্ত ছিল। থ্যাকারেও ব্যাচেলার।

—তার দেখা নিশ্চয়ই পাননি?

—না:! তার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গেছিলাম। ওরা বলল, দিন পনেরোর ছুটি নিয়েছে থ্যাকারে। এখন কোথায় সে, ওরা জানে না।

—দারুণ! দুয়ে দুয়ে মিলে চার! সব ক্লিয়ার। মামা, পট্টনায়েক আঙ্কেল, চলুন, এখনই রিপোর্টার ওরফে সায়েন্টিস্ট থ্যাকারেকে অ্যারেস্ট করা হোক। থ্যাকারে যে ভেঙ্কটসুন্দরমের খুনি এতে নিশ্চয়ই ভুল নেই।

—তিষ্ঠ বৎস। অত লাফিও না। কেসটা খানিকটা খোলসা হল ঠিকই, তবে এত সরল নয় রে!

—কেন? কেন?

আশ্চর্য! পট্টনায়েক না হয় গত পরশুর ব্যাপারটা জানেন না, কিন্তু তুই? ব্যাপারটা যদি তাই হত, তবে থ্যাকারে সেদিন বনে আদিবাসীদের ট্রেনিং দিচ্ছিল কী উদ্দেশ্যে? প্রতিপক্ষ কে বা কারা? ভেঙ্কট খুন হয়ে গেলে সব তো চুকে যাওয়ার কথা।

তাই তো! এদিকটা ভাবিনি।

পট্টনায়েক বললেন,—বনে কী ঘটেছিল ডক্টর মুখার্জি?

সংক্ষেপে লোমহর্ষক সংঘর্ষের কথা পট্টনায়েককে জানালেন জগুমামা।

তারপর বললেন—এবার ফোটোগুলো দেখান তো!

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তোলা ছবি। ফ্যামিলির সঙ্গে। বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সঙ্গে। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভেঙ্কটসুন্দরম। একটা মাত্র ছবিতে ভেঙ্কট ও থ্যাকারে ল্যাবরেটরিতে পাশাপাশি কাজ করছেন।

৫

বেতলার মেইন গেটের সামনে জিপ দাঁড়িয়ে আছে। জিপের সামনে পায়চারি করছেন রেঞ্জার লাল।

জিপে সব গুছিয়ে উঠছি, লাল বলে উঠলেন,—আরে! ওটা কে ছুটে আসছে?

—হ্যাঁ, বন্দুক কাঁধে একজন ফরেস্ট গার্ড এদিকে ছুটে আসছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার বনের বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে বনরক্ষীদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জারি হয়েছে কড়া সতর্কতা।

লোকটা ছুটে আসছে কেন?

পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার জবাব পাওয়া গেল। একেবারে আমাদের সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। ঘনঘন শ্বাস ফেলছে।

—সাব, খুন!

—খুন! আবার খুন! কোথায়?

—সাব, হুই দিকে।

লোকটা আঙুল তুলে উত্তর-পশ্চিম কোণ দেখাল।

—চেনা কেউ?

—না সাব। বাইরের আদমি, জানোয়ার কেটেছে।

—কখন দেখলি?

—এই আধঘন্টা আগে। চৌকি দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, ঝোপের পাশে পড়ে আছে লাশটা।

—তারপর?

—সঙ্গে সাব সদানন্দ ছিল। ওকে পাহারায় রেখে ছুটে এসেছি।

মামা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার কঠিন গলায় বললেন,—মিস্টার লাল! স্পেশাল ফোর্স দিয়ে এখনই স্পটের চারদিকে অন্তত এক বর্গমাইল জায়গা ঘিরে ফেলুন। একটা মাছিও যেন গলতে না পারে। সেখানে নোবডি উইল বি অ্যালাউড।

লাল সঙ্গে-সঙ্গে নির্দেশ দিলেন ওয়াকি-টকিতে। তারপর গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম আমরা।

বীভৎস, পাশবিক, ভয়াল! অবিকল সেই একইরকম খুন! ভয়ংকর জিঘাংসায় কোনও জন্তু যেন মৃতের মুণ্ড নিয়ে গেন্ডুয়া খেলেছে। লাশের মুখ খাবলে খুবলে কামড়েছে। শরীরও ক্ষতবিক্ষত, জামাপ্যান্ট ছিঁড়ে ফালাফালা।

মৃতদেহের পাশে ছিটকে পড়েছে একটা ঝোলাব্যাগ। সেখান থেকে উঁকি মারছে ডায়েরি, কলম, কাগজ।

বনের এই জায়গায় শিমূল, শাল, পিয়াল গাছেরা একদম গায়ে-গায়ে। বড় বড় ঘাসের, লতাগুল্মের ঝোপ। ছায়া-ছায়া, ঠান্ডা, রোদ ঢুকতে পারছে না।

ঘাস মাড়িয়ে মানুষের পায়ের শব্দ। চমকে উঠেছি। মামা বললেন,—স্পেশাল ফোর্স। পজিশন নিচ্ছে।

মামা এগিয়ে গেছেন ঝোলাব্যাগের কাছে। ঝোলা উপুড় করলেন, বেরিয়ে এল টুকরো-টাকরা কাগজপত্র, একটা ডায়েরি আর কভার ফাইল। বিভিন্ন রঙের স্কেচপেন, পেনসিলও আছে।

মামা প্রথমেই তুলে নিয়েছেন ডায়েরিটা, ডায়েরির মলাট ওলটাতেই মাথা ঘুরে গেল। এটা কী করে সম্ভব?

ডায়েরির দ্বিতীয় ফোল্ডে আটকানো ছবিটা আর কারও নয়, যাকে আমরা খুনি মনে করেছি, সেই পি কে থ্যাকারের। তার মানে এই ডেডবডি থ্যাকারের?

মামা ডায়েরি বন্ধ করে কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু ভাবছেন।

তারপর ঝোলার মধ্যে কাগজপত্র সব ঢুকিয়ে ফেললেন। ঝোলা এগিয়ে দিলেন পট্টনায়েকের দিকে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মৃতদেহের পাশে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছেন। হঠাৎ হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন মৃতদেহের প্যান্টের ডান পকেটে। ইসস—রক্তমাংস মাখামাখি! মামার একেবারে ঘেন্নাপিত্তি নেই।

পকেট থেকে দলাপাকানো কাগজপত্র, খুচরো পয়সা উঠে এল। বাঁ-পকেটে একটা সাদা রুমাল। উলটেপালটে দেখে মামা সবসুদ্ধ ফেললেন নিজের বুকপকেটে।

মামার চোখ চরকির মতো ঘুরছে। কী খুঁজছেন? হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘাসঝোপের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঝোপের মধ্যে সাদামতন ওটা কী পড়ে আছে?

আর একটা ডায়েরি, এটা ছোট, পকেট সাইজের। উলটেপালটে দেখলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর ওটাও ঢুকে গেল মামার প্যান্টের পকেটে।

মামা বললেন,—আমার কাজ শেষ। জগুমামা এখন অনেকটা শান্ত। ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, লাশ পোস্ট মর্টেমে পাঠান। আচ্ছা, আগের পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা কি এসেছে?

লাল বললেন,—আজই আসার কথা স্যার। আশা করছি, দপ্তরে ফিরে গিয়ে পাব।

গুড। একটা কাজ করুন। আপনি লাশ নিয়ে ফিরে যান, আমরা একটু পরে আসছি। আর হ্যাঁ—

বলতে-বলতে তাঁর গলার স্বর নেমে এল।—ফোর্স এখন থাকবে। আমি না বলা পর্যন্ত উইথড্র করবেন না।

চলুন পট্টনায়েক, এখন একটু জঙ্গলের বিউটি এনজয় করা যাক।

এনজয়! মামাকে চিনি না! আমি সিওর, মামা এখন বনের মধ্যে আরও কিছু সূত্র পাওয়ার আশা করছেন।

বনের মধ্যে ঘুরছি। নানান ধরনের গাছপালা। মামা চিনিয়ে দিচ্ছেন মাঝে-মাঝে,—এটা শাল, এটা কেঁদ। আর এটা বুঝালি, মহুয়া। এর ফুল থেকে আদিবাসীরা রস বের করে, সে ভীষণ নেশার জিনিস। তার নামও মহুয়া। মাঝে-মাঝেই মহুয়া টেনে—

বলতে বলতে থেমে গেলেন। তিরগতিতে এগিয়ে গেলেন সামনের একটা ঝোপের দিকে।

ওটা কী? ছোট্ট একটা তাঁবুর মতো। লতাপাতা গাছপালা দিয়ে নিপুণভাবে আড়াল করা। কোনও কুশলী মানুষ নিশ্চয়ই তৈরি করেছে গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করতে।

মামা চট করে ঢুকে গেছেন তাঁবুটার ভিতর। কয়েক মুহূর্ত সাড়া নেই। তার পরেই ভিতর থেকে ভেসে এল উল্লসিত গলা,—পেয়েছি! পেয়েছি!

৬

রাত ঝিমঝিম করছে। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা চরাচর। একটানা শুধু ঝিঁঝির ডাক। মাঝে-মাঝে কর্কশকণ্ঠে ডেকে উঠছে কোনও রাতচরা পাখি। কখনও বা বন্য শ্বাপদের চাপা গর্জন।

সময় বয়ে চলেছে ধীরে, অতি ধীরে। কাটতে চাইছে না। কতক্ষণ, আর কতক্ষণ? কেউ কি সত্যিই আসবে?

জগুমামা বলেছেন, আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। অপরাধী বুঝে গেছে, এই তাঁবু খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চোখে পড়বে। তাই এর মধ্যেকার যা কিছু গোপন জরুরি, পারলে আজই সরিয়ে ফেলতে চাইবে।

তার আসাকে স্বাগত জানাতে তাই সমস্ত বনরক্ষীদের বিকেলের পর থেকে উইথড্র করা হয়েছে। বন এখন অবাধ।

সকালে রেস্ট হাউসে ফেরার পথে মামা বলে দিয়েছেন, আজই এ রহস্যের কিনারা হবে। তাই পুরোপুরি তৈরি হয়ে রাত কাটাতে হবে এই ছোট্ট তাঁবুতে।

রেস্ট হাউসে ফিরে মামা বসে গেছিলেন স্পট থেকে পাওয়া কাগজপত্র নিয়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলো দেখছিলেন। উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল জগুমামার মুখ।

জিগ্যেস করলে মুচকি হেসে বলেছেন,—আর ক'ঘণ্টার তো ব্যাপার!

এই ফাঁকে কয়েকটা কথা বলার আছে। প্রথম খুনের পোস্ট মর্টেম রিপোট পাওয়া গেছে। তাতে বলা হয়েছে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারা হয়েছে, কোনও জন্তুর আক্রমণে মৃত্যু নয়। দ্বিতীয় মৃত্যুর ক্ষেত্রেও যে এক রিপোর্ট আসবে, এটা এখনই বলে দেওয়া যায়। গোপন তাঁবু থেকে পাওয়া গেছে মাথার দুপাশ দিয়ে দুই কানে লাগাবার হেডফোনের মতো কয়েকটা যন্ত্র। পাওয়া গেছে গাড়ির বড় স্টোরেজ ব্যাটারি। আর ছিল ফাইল, কাগজ, তার, ব্যাগ, সকেট এই সব একগাদা জিনিস।

সন্ধে নেমে যাওয়ার পরেই আমরা চুপিচুপি ঢুকেছি বনে। কিছুটা পথ জিপে, বাকিটা পথ হেঁটে এসে ঢুকেছি তাঁবুতে। মামা, পট্টনায়েক ও আমি।

সেই থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু অপেক্ষা করা। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বেচারি পট্টনায়েকের সিগারেট ছাড়া যার এক মুর্হূত চলে না, তিনি এখন ধোঁয়া হীন।

—মামা ক'টা বাজে?

—ন'টা, মনে হচ্ছে, তার আসার সময় হয়ে গেছে। আর কথা—

শ-শ-শ! চু-প।—পট্টনায়েক ফিসফিসিয়ে বললেন।

নিথর অরণ্যের বুকে সহসা বেজে উঠেছে কারও গোপন পদচারণার শব্দ। খস-খস-খস। ঘাসপাতা মাড়িয়ে সে এদিকেই আসছে।

কোনও শ্বাপদ নয় তো? এই জঙ্গলে তাদের সংখ্যাও কম নয়।

বাকি দুজনের হাতে রিভলভার। তারার আলোয় চিকচিক করছে। পট্টনায়েকের বাঁ-হাতে লম্বা একখানা টর্চ।

শব্দটা কাছে এগিয়ে আসছে।

উঁহু! একটা তো নয়। পাশাপাশি পা ফেলার দুটো শব্দ। অর্থাৎ আগন্তুক একজন নয়—দুজন।

আমরা তৈরি। তাঁবুতে ঢোকার এককোণ ঘেঁষে পট্টনায়েক, অন্যকোণে মামা ও আমি। আমার হাতে একটা লম্বা লাঠি।

এবার দুজনের আলাপ শোনা যাচ্ছে,—বীরু, আমি ঢুকছি। ঢুকব আর বেরুব। মালগুলো নিয়ে। তুই বাইরে রেডি থাকিস। কারুর কোনও সাড়া পেলেই কুইক শিস দিবি আর তির চালিয়ে দিবি। কেমন?

—ঠিক আছে, সাব।

ধীরু! এ কোন বীরু? সেই বীরু, না অন্য কেউ? কিন্তু দুটো গলাই আগে শুনেছি!

এর পরেই তাঁবুর পরদা সন্তর্পণে সরে গেল। বাইরে আবছা জ্যোৎস্না। এক ছায়ামূর্তি ঢুকছে তাঁবুর ভেতরে। হাতে টর্চ জ্বালিয়েছে। আলোর বৃত্ত কাঁপছে তাঁবুর কাপড়ে।

ও-উ-ফ! পট্টনায়েকের বাড়ানো পায়ের অব্যর্থ কাঁচি! অস্ফুট আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ছায়ামূর্তি!

আর তৎক্ষণাৎ পট্টনায়েক ছিটকে চলে গেছেন বাইরে। ভেসে এল তাঁর হুংকার,—হ্যান্ডস আপ! হাত উঠাও!

ততক্ষণে ছায়ামূর্তির ঘাড়ের ওপর চেপে বসে তার কানে রিভলভার ঠেকিয়ে দিয়েছেন জগুমামা।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেছে কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে।

৭

সবাই বেশ ফুরফুরে মেজাজে। সামনে আলোকিত সকাল। ব্যালকনিতে বেতের চেয়ারে বসেছি চারজনে। জগুমামা, পট্টনায়েক, জগমোহন লাল ও আমি।

বলা বাহুল্য, কাল রাতের দুই অতিথিকেই সোজা সদর শহর ডালটনগঞ্জ থানায় চালান করে দেওয়া হয়েছে।

চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে লাল বললেন,—এবার নিশ্চয়ই বলবেন স্যার, কোন পথে এই অদ্ভুত রহস্যের ফয়সালা করলেন?

—অবশ্যই ডক্টর মুখার্জি। গুছিয়ে বলতে হবে।

নিশ্চয়ই বলব। এখন কোথাও ধোঁয়াশা নেই। চায়ে লম্বা চুমুক মেরে জগুমামা বললেন, তবে যেহেতু এই খুনোখুনি করেছে বিজ্ঞানী নামের কলঙ্ক দুই শয়তান, তাই তাদের বুদ্ধির দৌড়টাও ছিল সাধারণ মাপের চেয়ে অনেক বেশি।

গোড়াতেই বরং অল্প করে বলে নিই দুজনের গবেষণা বিষয়বস্তুটা। তাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধে হবে। কী বলেন?

—যেটা আপনার সুবিধে। আমরা বুঝতে চাই।

—হুঁ শুনুন। তবে—থ্যাকারে এবং ভেঙ্কটসুন্দরমের গবেষণা বিষয় ছিল প্রাণীদের মস্তিষ্ক নিয়ে। আরও স্পেসিফিক বললে, ব্রেনের মধ্যভাগ বা মিড-ব্রেনের লিমবিক সিস্টেমের একটা ছোট্ট অংশ অ্যামিগডালা নিয়ে।

এই অ্যামিগডালা এক অদ্ভুত বস্তু। প্রাণীজগতের হাসি-কান্না-রাগ-আতঙ্ক-ভয় ইত্যাদির নানান অনুভূতিকে কন্ট্রোল করে মগজের ছোট্ট ওই অংশটা। গবেষণায় দেখা গেছে, অ্যামিগডালায় ইলেকট্রিক শক দিলে প্রাণীর স্বভাবচরিত্রে অদ্ভুত-অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনটা অবশ্য কিছুক্ষণের জন্যে। বিজ্ঞান বলছে, লো ভোল্টেজ শক দিলে যে-কোনও হিংস্র জানোয়ার অতি নিরীহ গোবেচারা হয়ে যায়, মিডিয়াম ভোল্টেজ দিলে হয়ে ওঠে আরও বহুগুণ হিংস্র এবং খ্যাপা। আবার হাই ভোল্টেজ শক দিলে জন্তুটি হয়ে পড়ে আতঙ্কগ্রস্ত।

অর্থাৎ অ্যামিগডালার ওপর ইলেকট্রিক শকের কমবেশিতে জানোয়ারের স্বভাবের বিরাট পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। শুনে অবাক হয়ে যাবেন, অ্যামিগডালাকে যদি ব্রেন থেকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, যে-কোনও হিংস্র জন্তুও হয়ে যায় নিপাট নিরীহ।

মামা থামলেন। সকলের গোল-গোল চোখমুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন,—কী, আপনাদের বোধগম্য হচ্ছে কী?

যেটুকু হচ্ছে, ওতেই হবে। তুমি বলো মামা।

—হ্যাঁ, মামা আবার বলতে শুরু করলেন, থ্যাকারে ভেঙ্কটসুন্দরমের জয়েন্ট রিসার্চের সাবজেক্ট ছিল ব্রেনের অ্যামিগডালার ওপর ইলেকট্রিক শকের তারতম্য ঘটিয়ে কীভাবে হিংস্র জানোয়ারকে নিরীহ করে তোলা যায়। সেটা তার অন্যান্য স্বাভাবিক গুণগুলো বজায় রেখে। কারণ, অতীতের রিসার্চে জানা গেছে, জন্তুকে হিংসাহীন করে তোলা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাবের অন্যান্য দরকারি গুণগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে। জানোয়ারটি হয়ে পড়ছে জরদগব স্বভাবের।

—দুজনের গুরত্বপূর্ণ গবেষণা যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে, ঠিক সে সময় দুই বন্ধুতে বাধল ভয়ানক ঝগড়া। আর সেটা এতটাই কুৎসিত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ভেঙ্কটসুন্দরম একদিন চুপিসাড়ে গা ঢাকা দিল সব কাগজপত্র গোপনে সরিয়ে। আসলে তার গোপন ইচ্ছে ছিল, এই জয়েন্ট রিসার্চের কৃতিত্ব সে একাই ভোগ করবে।

ভারতের এখানে-সেখানে ঘুরতে-ঘুরতে এই জঙ্গল মনে ধরে যায় ভেঙ্কটের। ঘাপটি মেরে নি:শব্দে গবেষণা চালিয়ে যায়। কিন্তু থ্যাকারে ছাড়বে কেন? বর্গী রক্ত তার শরীরে। প্রতিশোধের আগুন তার মনে তখন চব্বিশ ঘণ্টা দাউ-দাউ করছে। শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে-শুঁকে একদিন সে ঠিক হাজির হল এখানে। অবশ্যই সাংবাদিকের ছদ্মবেশে।

তারপর?—মি: লাল রীতিমতো ছটফট করছেন।

—তার পরের ঘটনাগুলো তো আমাদের চোখের সামনেই ঘটে গেল। বলতে লজ্জা নেই, আমার বিচারবুদ্ধিও গুলিয়ে গেছিল।

জগুমামা একটু থামলেন। টেবিলে ঢাকা দেওয়া গ্লাস থেকে জল খেলেন। তারপর ফের শুরু করলেন।

ভেঙ্কটসুন্দরম দেখল, তার শমন উপস্থিত। সামনে দুটো রাস্তা খোলা। হয় সাময়িক বাঁচতে আবার পালানো, নতুবা নতুন কোনও ফন্দি এঁটে থ্যাকারেকে পুরো কনফিউজ করে দেওয়া।

দ্বিতীয় পথটা বেছে নিল ভেঙ্কট। সে ইতিমধ্যেই প্রচুর টাকাপয়সা ছড়িয়ে শুধু বীরু নয়, আদিবাসীদের একটা দলকে কবজা করেছিল। তাদের সাহায্যে বানিয়েছিল বনের মধ্যে গোপন তাঁবু। তারাই ভেঙ্কটের রিসার্চের জন্যে নিয়মিত জন্তু সাপ্লাই দিত। আর এর ফলেই বেতলায় শুরু হয়ে গেছিল জন্তুদের খ্যাপামি।

সর্বক্ষণের সঙ্গী বীরুর সাহায্যে এরপর ভেঙ্কট জোগাড় করে এক আদিবাসী মানুষকে। লোকটি মাঝবয়েসি, তিনকূলে কেউ নেই। তার দেহের গড়ন ও গায়ের রং ভেঙ্কটসুন্দরমের কাছাকাছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামা বললেন,—তারপর গভীর রাতে ওই লোকটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জঙ্গলে নিয়ে এসে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। মৃতদেহকে নিজের জামা-প্যান্ট, গলায় নিজের চেন পরিয়ে, চোখের চশমা পাশে ফেলে রেখে ভেঙ্কট গা ঢাকা দেয় আদিবাসী পল্লিতে।

এতে দুদিক দিয়েই সুবিধে হল ভেঙ্কটসুন্দরমের। থ্যাকারের কাছে নিজেকে একবার মৃত প্রমাণ করতে পারলে ওর হাতে মরার ভয় নেই। আবার তাদের পুরোনো ঝগড়ার কথা যদি গোয়েন্দারা জেনেও যায়, তাতেও লাভ। পুলিশ খুঁজে-খুঁজে খুনি হিসেবে থ্যাকারেকেই ধরবে।

সেদিন ভেঙ্কটসুন্দরমের মৃত্যুর খবর নিয়ে আসার সময় বা স্পটে গিয়ে অশিক্ষিত বীরু মুর্মু যে অভিনয় করেছিল, তা অনবদ্য। আমাকেও ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল। কিন্তু দুটো চিহ্ন দেখে আমি অন্যরকম ভাবতে শুরু করি।

—চিহ্ন!

—হ্যাঁ। কোনও লোক যদি নিয়মিত চশমা পরে বা গলায় চেন পরে, তবে চোখে ও তার নাকের ওপরে এবং গলায় সূক্ষ্ম দাগ থাকবে। গায়ের রং কালো হলে এটা আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে। মৃতদেহে এরকম

কোনও দাগ ছিল না। আরেকটা ব্যাপার হল যারা প্যান্ট-শার্ট পরে, তাদের শরীরের ঢাকা অংশের রং অবশ্যই উজ্জ্বল হবে। লাশে সেই তফাত ছিল না। তখন খুঁটিয়ে দেখি ছিন্নভিন্ন প্যান্টের ফাঁক দিয়ে হাঁটু অবধি কাপড় পরার দাগ রয়েছে।

মার্ভেলাস! জবাব নেই!—চেঁচিয়ে উঠলেন সত্যসাধন পট্টনায়েক, শুধু-শুধু কি আপনার পিঠে চুলকোই, ডক্টর মুখার্জি?

—পরে চুলকোবেন। এখন আমায় শেষ করতে দিন। এই অসংলগ্নতা লক্ষ্য করেছিল থ্যাকারেও। আমাদের স্পটে পৌঁছোবার আগে পর্যন্ত সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছিল লাশকে। অতএব তারপরই সে নেমে পড়ে কাজে। টাকাপয়সা দিয়ে নতুন একদল আদিবাসীকে নিজের দলে টেনে সে শক্তি বাড়াচ্ছিল। হ্যাঁ, সেদিন এই বেতলার জঙ্গলের মধ্যে টুকলু আর আমার চোখের সামনে।

কিন্তু ভেঙ্কটও বুঝে ফেলল, থ্যাকারের চোখে তার চালাকি ধরা পড়ে গেছে। সে তখন মরিয়া। দলবল নিয়ে সেইদিনই সে অ্যাটাক করল থ্যাকারের দলকে। আমরা তার সাক্ষী। প্রায় দশ মিনিট ধরে চলেছিল দু-পক্ষের তির-বন্দুকের অ্যাকশন।

কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি ভেঙ্কট। যে বীরু মুর্মু ছিল ভেঙ্কটের প্রধান সেনাপতি তাকেই থ্যাকারে আরও টাকাকড়ি দিয়ে কিনে ফেলল। বীরু তাকে জানিয়ে দিয়েছিল ভেঙ্কটের গোপন ডেরার হদিস। আর তাই দু-একদিনের মধ্যেই...

—দ্বিতীয় খুন হল। ঝোপের মধ্যে পড়ে ছিল থ্যাকারের বেশে ভেঙ্কটের লাশ!

সাব্বাশ!—জগুমামা আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, তোর বুদ্ধি খুলে গেছে। আসলে ভেঙ্কটের ট্রিকস দিয়েই ওকে মেরে নিজেকে বাঁচানোর ফন্দি এঁটেছিল থ্যাকারে। দুজনেই কাছাকাছি রাজ্যের মানুষ। হাইট, কমপ্লেকসন কাছাকাছি। মুখটা চেনা না গেলে আইডেন্টিফাই করা বেশ কঠিন।

—তবে আমি এবার মনে মনে তৈরি ছিলাম। তাই যতই মৃতদেহের পাশে থ্যাকারের ঝোলাপত্তর পড়ে থাক, আমি খুঁজছিলাম চারপাশে। পেয়ে গেলাম ভেঙ্কটের বুকপকেট থেকে পড়ে যাওয়া ছোট্ট ডায়েরিকে। শুধু তাই নয়, খুনের পরে ভেঙ্কটের প্যান্টের পকেট থেকে সব কাগজপত্র বের করে নিলেও পকেটের একেবারে নীচের দিকে লেপটে ছিল দু-একটা কাগজ। বডি সার্চিং-এর সময় চলে আসে আমার হাতে। কাগজের মধ্যে একখানা চিঠিও ছিল। চিঠিটা আর কারও নয়, ভেঙ্কটকে লেখা থ্যাকারের লাভ-লেটার। বেতলায় পৌঁছে সে দিয়েছিল ভেঙ্কটকে।

—চিঠিতে কী ছিল?

—ছিল কয়েকটা মাত্র শব্দ। ইংরেজিতে 'দোস্ত, এবার তোমাকে পেয়েছি, আর ছাড়ছি না! থ্যাকারে।'

—মামা, তাঁবুর মধ্যে যে হেডফোনগুলো ছিল, ওগুলোই কি জন্তুদের ব্রেনে ইলেকট্রিক শক দেবার যন্ত্র?

—হ্যাঁ। বিশেষ ধরনের ইলেকট্রোড। জন্তুদের ধরে এনে কিছুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান করে দেওয়া হত। তারপর তাদের মাথায় ওই হেডফোন লাগিয়ে, বিদ্যুতের শক দেওয়া হত। বিদ্যুতের মাত্রার তারতম্যে, আগেই বলেছি, বিহেভিয়ার পালটে-পালটে যেত। শান্ত বুনো মোষ খ্যাপা বাঘের মতো আচরণ করত। বা চিতাবাঘ বেড়ালের মতো মিউমিউ করত। সবটাই ব্রেনের অ্যামিগডালার প্রতিক্রিয়া। তাঁবুতে স্টোরেজ বড় ব্যাটারি রাখা ছিল, ইলেকট্রিক কারেন্ট সাপ্লাইয়ের জন্যে।

একটানা বলে জগুমামা থামলেন। আমরাও চুপ। শুধু ভাবছি, দুই প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর মর্মান্তিক পরিণতি।

জগমোহন লাল একটু পরে বললেন,—স্যার, এবার বেতলা ঠান্ডা হবে তো? মানে জন্তুরা স্বাভাবিক হবে তো?

তা হবে, মামা ম্লান হেসে বললেন, অ্যামিগডালার প্রতিক্রিয়া টেম্পোরারি। কিন্তু একটা কথা কি জানেন, যে সব সাদাসিধে আদিবাসী মানুষদের ওই দুটো লোক নিজেদের নোংরা কাজে ব্যবহার করেছে, তাদের টাকার লোভ দেখিয়ে মন বিষিয়ে দিয়েছে, সেটা তো প্রায় পার্মানেন্ট। তারা কি তাদের সাদা মন আর ফিরে পাবে?

বলতে-বলতে ফিরলেন আমার দিকে। বললেন,—তোর সেই কথাটাই আবার মনে পড়ছে রে। 'মস্তকে দংশেছে ফণী'। দেশের সবচেয়ে সম্মানীয়, বলা চলে ক্রিম অব দ্য সোসাইটি, বিজ্ঞানী মহলে যেখানে দুর্নীতির কালসাপ বাসা বেঁধেছে, সেখানে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা দাঁড়াবে? দুর্নীতির বিষে গোটা দেশটাই ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে!

বৈশাখ ১৯৮৮

---

* এই উপন্যাস রচনার সময়ে ঝাড়খন্ড রাজ্য তৈরি হয়নি ।

রুকটুকার পাড়ে

১

টুঁ...ই...টুঁই...টুঁই...

তাকালাম। জানলার পাল্লার উপর বসে ছোট্ট একটা পাখি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর গলা ফুলিয়ে শিস দিয়ে উঠছে, টুঁই...টুঁই...টুঁই...টুঁই...

উজ্জ্বল সবুজ রং, ঘাড়ের কাছে লালচে আভা, লেজটা লম্বা। চন্দনা? কে জানে।

ভোর হয়ে গেছে। উঠে বসে বাইরে তাকাতেই মন ভরে উঠল।

সামনে সবুজ মাঠ, তার পরেই ঘন জঙ্গল। দিগন্ত ছুঁয়েছে। আকাশের গায়ে আবছা পাহাড়। পুবদিগন্তের হালকা কমলা ছড়িয়ে পড়েছে চরাচরে। এ জন্যেই মাঝে-মাঝে মন-কেমন করে উঠলেও এই উত্তর বাংলাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

আমার তিন রুম পার্টনার এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। প্রচুর ঘুমোয়। টেবিলের ওপর কাল রাতের চিঠি দু-খানা, আমারই লেখা একটা বাবা-মাকে, অন্যটা জগুমামাকে। আজ পোস্ট করব।

—অর্ণব, রেডি?

শৌভিক ঘরে ঢুকল।

আমি দ্রুত শর্টস আর গেঞ্জি গলাতে শুরু করলাম।

হোস্টেল থেকে বেরিয়ে দুজনে সবুজ মাঠে। আস্তে-আস্তে দৌড় শুরু করেছি।

কী রে, আজ কোনদিকে? শৌভিক বলল।

—তুই তো জানিস। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে রুকটুকার পাড়।

বাঁ-দিকের পথে নিস্তব্ধতার বুকে শুধু পাখপাখালির অবিশ্রান্ত কিচিরমিচির।

আমাদের এই একনম্বর হোস্টেল থেকে রুকটুকার দূরত্ব খুব কম নয়। প্রায় এক কিলোমিটার।

পূবদিগন্তের ওপর সূর্য। রাতের শিশির এখন বাতাসে উড়ছে। ঝলকে উঠছে রামধনু রং। আমরা দুই বন্ধু নি:শব্দে ছুটে চলেছি। প্রতিদিনের রুটিন।

ওই যে দূ-রে রুকটুকা। রুপোলি ফিতে। তার একেবারে গা-ঘেঁষে রেললাইন। ডুয়ার্স চিরে আসাম অবধি চলে গেছে। আরও কিছুটা উত্তরে দেখা যায় জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, স্টেশন ঘর।

রুকটুকার পাশে আধঘণ্টা আরাম করব। তারপর আবার ফিরতি ছুট। ছুটবার গতি বেড়ে গেল। ক্রমশ সবকিছু স্পষ্ট। রুকটুকার পাড়ে নুড়িপাথর, বোল্ডার, ছোট্ট রেলব্রিজ, একটা কাঠের পরিত্যক্ত বাড়ি।

—অর্ণব, ও-ওটা কী রে?

হঠাৎ শৌভিক থমকে দাঁড়াল। তার গলা কাঁপছে।

—ক-কী? এ কী?

একটা মানুষের শরীর। প্যান্ট-শার্ট পরা। দু-হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রেলব্রিজের ঠিক নীচে।

আমরা ছুটতে-ছুটতে দেহটার কাছে পৌঁছে গেছি। সামনে যে মানুষটা পড়ে আছে, তার শরীরে প্রাণের লক্ষণ নেই।

শৌভিক প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। আমার হাত চেপে ধরে বলল,—অর্ণব! পালিয়ে যাই। পুলিশের খপ্পরে পড়লে জান কয়লা করে দেবে।

—চুপ কর তো। ভিতুর ডিম!

আমারও গলা কিন্তু কেঁপে গেল। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। কী করব? জনহীন এই পাহাড়, জঙ্গল, নদীর পাশে টাটকা মানুষের লাশ!

—অর্ণব, ভালো কথা বলছি, পালিয়ে চ। প্লিজ!

—তুই কী বল তো? চোখের সামনে একটা ডেডবডি পড়ে থাকতে দেখেও আমরা পালিয়ে যাব?...শোন, আমি এখানে ওয়েট করছি। তুই সোজা থানায় গিয়ে রিপোর্ট কর। আ: যা বলছি শোন—!

ওর আতঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললাম,—বলছি তো, সব হ্যাপা আমি সামলাব। শোন, আসার সময় আমার রুম থেকে ছোট ক্যামেরাটা নিয়ে আসিস। শিগগির যা!

শৌভিক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। মনে হল, হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

আমার সামনে মায়াময় পৃথিবী। নতুন দিন আসছে। দূরে ডুয়ার্সের গভীর সবুজ অরণ্য। আকাশের গায়ে নীল পাহাড়। নদী আর রেললাইন দুটোই হারিয়ে গেছে তার মাঝে। পায়ের সামনে একজন অজানা-অচেনা মানুষের মৃতদেহ!

দ্রুত ভাবতে শুরু করেছি—কেন মরল মানুষটা? রাতে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে? কেন?

পুলিশ না আসা পর্যন্ত মৃতদেহ ছোঁয়া উচিত নয়। তবু দোনামনা করতে-করতে আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। এর আগে জগুমামার সঙ্গে বেশ কয়েকটা রহস্য-উদ্ধারের সঙ্গী হয়েছি। আজ আমার পরীক্ষা হয়ে যাক।

মানুষটার প্যান্টের হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগ আর কয়েকটা কাগজ উঁকি মারছে। ঝুঁকে আলতো করে টেনে নিলাম। কাগজ নয়, কার্ড। কার্ডগুলোয় কিছু লেখা নেই। বিলকুল সাদা। এতগুলো সাদা কার্ড পকেটে রেখে দিয়েছে? পাগল?

মুখ না দেখেও আন্দাজ করা যাচ্ছে, মানুষটা মাঝবয়েসি। হাতে ঘড়ি নেই। অথচ বাঁ-কবজিতে ঘড়ি পরার হালকা দাগ। তবে? ঘড়ি খুলে রেখে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে? এত ভেবেচিন্তে সুইসাইড করেছে?

শরীরটা আড়াআড়ি পড়ে আছে। মাথা দক্ষিণের দিকে পা উত্তরমুখো। অর্থাৎ যে ট্রেন থেকে লোকটা ঝাঁপ দিয়েছে—

ইঞ্জিনের আওয়াজ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি। পুলিশের জিপ।

সামনের সিট থেকে দুজন পুলিশ অফিসার নামলেন। দুজনই ইয়ং। এঁদের মধ্যে লম্বা হ্যান্ডসাম ভদ্রলোকই যে থানার বড়বাবু, সেটা তাঁর চালচলনেই স্পষ্ট। পিছনের সিট থেকে নামলেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্যার, শৌভিক, দুজন সেপাই আর গলায় স্টেথো ঝোলানো একজন ডাক্তার।

ওসি সোজা এগিয়ে এসে আমার পিঠে আলতো চাপড় দিলেন। বললেন,—তুমিই অর্ণব! ভেরি গুড। ইউ আর রিয়েলি আ স্ট্রং বয়।

—থ্যাঙ্কিউ স্যার। সত্যি কথাটা হচ্ছে, আগে আমার মামার সঙ্গে কয়েকটা কেস সলভ করতে গেছি। তাই মৃত্যু বেশ কয়েকটা দেখতে হয়েছে।

—রিয়্যালি? তোমার মামা? পুলিশে?

—না স্যার। জানি না, নাম শুনেছেন কিনা। ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি। রিনাউনড সায়েন্টিস্ট। সিবিআই-এর পট্টনায়েকের রিকোয়েস্টে বেশ কিছু মিস্ট্রি সলভ—কিছু পিকিউলিয়ার কেস—

—ও, ইয়েস। কাগজে বেরিয়েছিল। পড়েছি। তুমি তা হলে মুখার্জি সায়েবের—

—ভাগ্নে। আমার ডাক নাম টুকলু।

—বাব্বা! তুমি তাহলে সিজনড—

—স্যার, বডিটা?

—সিওর। ডক্টর দত্ত, চেকআপ করে নিন।

ডা: দত্ত মৃতদেহের পাশে বসে পড়লেন। ওসি আমাদের প্রিন্সিপ্যালকে বললেন,—স্যার, আপনি বোধহয় জানেন না আপনার এই স্টুডেন্টের অন্য পরিচয়। ইন্ডিয়ান পুলিশ জার্নালে সায়েন্টিস্ট মুখার্জি আর 'টুকলু' নামে এদের কয়েকটা কেস রির্পোট বেরিয়েছিল। উই আর লাকি, টুকলু আই মিন অর্ণব এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছে। প্রয়োজনে ওকে ডাকতে হতে পারে। একটু অ্যালাও করবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ঘাড় নাড়লেন।

ডা: দত্ত বললেন,—স্যার, আমার চেকআপ হয়ে গেছে।

—কখন মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়?

—প্রোবাবলি দুটোর পরে, চারটের মধ্যে। সবে রাইগর মর্টিস সেট-ইন হচ্ছে।

—তবে তো এটা সুইসাইড কেস নয়।

কেন? ওসি ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন।

—খুব সোজা। মানুষটি যদি ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে থাকে, তবে ট্রেনের গতি যে-মুখো, মাথাটা সেদিকেই থাকবে। অর্থাৎ যে ভাবে দেহটা পড়ে আছে, তাতে ধরে নিতে হবে, যে-কোনও ডাউন ট্রেন থেকে মানুষটি ঝাঁপ দিয়েছে। অথচ রাত দশটার পর এই লাইন দিয়ে একটাই ট্রেন পাস করে। তিনসুকিয়া মেল। আপ ট্রেন।

ও-গুড! ভেরি গুড!...কালাচাঁদ, লাশকো জিপমে উঠাও। টুকলু এগেইন কনগ্রাটস।

—এক মিনিট স্যার। কয়েকটা ছুবি তুলে নেব।

২

এসো বোসো। ওসি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন,—তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট। গতকাল রাত বারোটার পর কোনও ডাউন ট্রেন এই লাইন দিয়ে পাস করেনি। সো ইটস প্রুভড—

—এটা আত্মহত্যা নয়, খুন।

—হ্যাঁ। তবে মুশকিল হচ্ছে, লোকটার কোনও পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। মুখটা এমন বিকৃত হয়ে গেছে যে লোকাল কেউই আইডেন্টিফাই করতে পারছে না।

—পারবেও না। কারণ মৃত এই এলাকার নন। নয়ানগুড়ির।

—স্ট্রেঞ্জ! ত-তুমি লোকটার পরিচয়ও পেয়ে গেছ?

—হ্যাঁ স্যার। এই দেখুন।

—একখানা কার্ড বের করে বললাম,—এই রকমই একগুচ্ছ ভিজিটিং কার্ড ছিল ডেডবডির প্যান্টের হিপ পকেটে। সব সাদা। কিচ্ছু লেখা নেই। হোস্টেলে ফিরে যতবার কার্ডগুলো দেখছি, খচখচ করছিল। লোকটা শুধু-শুধু না-ছাপা, না-লেখা নেম-কার্ড সঙ্গে রাখতে যাবে কেন? তা হলে কি মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল লোকটার? কার্ডের মধ্যেই নিজের পরিচয় লুকিয়ে রেখেছে?

ঘটনাটা তাই-ই ঘটেছিল।—একটু থেমে বললাম,—খুন করার পর আততায়ীরা মৃতের ঘড়ি চশমা, টাকাপয়সা সবকিছুই সরিয়ে ফেলেছিল। উদ্দেশ্য, কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। বেওয়ারিশ লাশ হিসাবে মর্গে পচবে। কোনও তদন্ত হবে না। কিন্তু সাদা কার্ড দেখে ওরা আর হাত দেয়নি।

—তারপর?

তারপর ম্যাজিক। ভ্যানিশিং ইঙ্ক ধরনের বিশেষ কালিতে লেখা। কিচেনের উনুনের গায়ে ঠেকাতেই গরম হয়ে লেখাগুলো ফুটে বেরুল।

ওসি অবাক হয়ে গেছেন। ধীরে-ধীরে ওঁর চোখ নামল ইংরেজিতে লেখা কার্ডের ওপর।

ড. রণজিৎ সিংহ

এম. এসসি. ডি. ফিল (লন্ডন)

নয়ানগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

—উনি তো দেখছি,...বেশ বড়মাপের,...

—হ্যাঁ। এখনই কলকাতায় একটা মেসেজ পাঠাতে চাই।

—কাকে পাঠাবে? তোমার মামাকে?

—হ্যাঁ।

—উনি কি আসবেন?

—মনে হয় আসবেন। একজন বিজ্ঞানী খুন হয়েছেন। আপনি নয়ানগুড়ি জায়গাটা চেনেন?

—হ্যাঁ। ময়নাগুড়ি যাওয়ার পথে পড়ে।

—আরেকট কথা স্যার। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কবে পাওয়া যাবে?

পরশু। বলেই ওসি ভ্রু কুঁচকে বললেন,—টুকলু, তোমার মুখে 'স্যার-স্যার শুনতে যাচ্ছে তাই লাগছে। আমার নাম বিনোদ দাশগুপ্ত, তুমি বিনোদদা বা বাবু, যা খুশি ডাকতে পারো। শুধু 'স্যার' বোলো না।

৩

আজ শুক্রবার। সকাল থেকে আমাদের কলেজে ওয়ার্কশপ চলছে। যাইনি, সত্যি কথা বলতে, গত পরশু থেকে আমার লেখাপড়া মাথায় উঠেছে। সারাক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছে রনজিৎ সিংহ খুন হলেন কেন?

কেবলই মনে হচ্ছে, অন্যরকম কোনও রহস্য ভিতরে লুকিয়ে আছে।

হোস্টেলের ঘরে রেডি হয়ে বসে আছি। ঠিক দশটায় গাড়ি নিয়ে বিনোদ দাশগুপ্ত আসবেন। আমরা দুজনে যাব নয়ানগুড়ি।

পিঁ...পিঁ...পিঁ...পিঁ...গাড়ির হর্ন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে আমাদের অ্যাম্বাসাডার ছুটল।

দু-ধারে সবুজ প্রান্তর, পাটের খেত, ছোট-ছোট কুঁড়ে। দু-একজন মানুষ চাষের কাজ করছে। দিগন্ত জুড়ে ঝাপসা বন।

সামনে জলপাইগুড়ি শহরের মোড়। তারপর ধরব ময়নাগুড়ির পথ।

হু-হু করে উথালপাথাল হাওয়া। গাড়ি ছুটছে। প্রকৃতিকে দুচোখ মেলে গিলছি।

শুনশান হাইওয়ের ওদিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসছে। বিনোদদা স্লো করলেন পাশ কাটাতে। ট্যাক্সিও গতি কমিয়েছে।

—অ্যাই টুকলু! টুকলু!

ট্যাক্সি থেকে চিৎকার।

দুটো গাড়িই থেমে গেছে। ওদিক থেকে এগিয়ে এলেন জগুমামা। পিছনে মূর্তিমান 'ফেভিকল' অনন্ত সরখেল।

—তোর হোস্টেলেই যাচ্ছিলাম রে।

—কী ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল!

—হ্যাঁ। আরেকটু হলেই মিস করতাম। সোজা বাগডোগরা থেকে আসছি। পরশু বিকেলে তোর মেসেজ পেয়েছি।

অনন্তবাবু তোমার সঙ্গে সাঁটলেন কীভাবে?

অ্যায় টুকলু, খবরদার!—অনন্ত সরখেল তেড়ে উঠলেন,—সত্যি তোমার মতো অকৃতজ্ঞ ছোকরা দুটো নেই। আমি কোথায় এলুম তোমায় ভরসা দিতে!

—ভরসা? আপনি? তবে তো সব ফরসা।

—উফ, তোরা থামবি! দাঁড়া আগে ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিই। কিন্তু...ইনি—এনাকে তো ঠিক...

—সরি। আগেই আলাপ করানো উচিত ছিল। বিনোদ দাশগুপ্ত দাঙ্গুয়াঝাড় থানার ওসি। আর ইনি হচ্ছেন —

—তোমায় বলতে হবে না।

চারজন বসলাম। গাড়ি স্টার্ট দিল।

—এবার বল দেখি, কী কী ঘটেছে।

আমি পরপর সব ঘটনা বলে গেলাম। মামা বললেন,—বা:! বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছিস।

হেঁ-হেঁ, যা বলেছেন, স্যার। অনন্তবাবু খ্যাকখ্যাক করে হাসলেন,—আমাদের ট্রেনিংয়ে বেশ পেকে উঠেছে।

'আমাদের' ট্রেনিং! বুড়োটার কথা শুনে গা-পিত্তি জ্বলে যায়।

মামা বললেন,—কার্ডটা দেখি।

রণজিৎ সিংহ! রণজিৎ সিংহ।—মামা নিজের মনে বললেন,—হ্যাঁ। একজনকে মনে পড়েছে। পুরোনো রাজফ্যামিলির ছেলে...বেনারস সায়েন্স কংগ্রেসে আলাপ হয়েছিল। চুপচাপ প্রকৃতির। হ্যাঁ, এই অঞ্চলেরই লোক। কেমন দেখতে বল তো?

—নাক-মুখ-চোখ থেঁতলে গেছে। মুখের আদল কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

—হুঁ! বাকি সাদা কার্ডগুলো রেখেছিস? ওগুলোতেও কি ওর নাম-ঠিকানা লেখা?

—তাই হবে। আমি আর দেখিনি। একটাকেই আগুনে সেঁকেছিলাম। তাতে নাম-ঠিকানা বেরোল।

—বাকিগুলো কাছে আছে?

—হ্যাঁ।

—একবার দে তো।

সাদা কার্ডগুলো হাতে নিয়ে মামা ফস করে লাইটার জ্বাললেন। একটার পর একটা ধরতে লাগলেন, আগুনের শিখার ওপর

আর সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের স্তম্ভিত করে ওদের গায়ে ফুটে উঠতে লাগল আশ্চর্য সব রাসায়নিক ফর্মুলা।

$CO+3H_2$®CH_4 $+H_2O$

ethylenics + CO + ROH®acids

$CO + H_2O$®$CO_2 + H_2$...এইরকম সব।

মামা দেখছেন আর আপনমনে বলে চলেছেন,—মিথেনাইজেশন, কার্বনাইজেশন, শিফট রি-অ্যাকশন...

অনন্ত সরখেলের রি-অ্যাকশনও চলছে! এক চোখ ছোট করে ঠোঁট মুচড়ে উনিও বলে চলেছেন,—শিশু! শিশু! বেবি ফুড চাইল্ড। টুকলু শেখো, শেখো, অ্যায়...অ্যায় হলেন স্যার...। কত্তবার তোমায় বলেছি 'যেখানে দেখবি ভাই, উড়াইয়া দ্যাখো ছাই...'

বিনোদ দাশগুপ্ত গড়ির গতি কমিয়ে দিলেন, হাইওয়ের ওপর ডিরেকশন সাইন, নয়ানগুড়ি।

|| ৪ ||

ছোট জনপদ। ছবির মতো সুন্দর। গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়।

একটু এগোতেই একটা মোড়। দু-তিনটে ছোটখাটো দোকান স্থানীয় মানুষদের জটলা।

জগুমামা নেমে এগিয়ে গেলেন। আড্ডা থামিয়ে যুবকরা মামাকে দেখছে কৌতূহলী চোখে। মামা বললেন, —ভাই রণজিৎ সিংহের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

যুবকরা কয়েক মুহূর্ত মুখ চাওয়াচায়ি করল। একজন বলল,—কোন রণজিৎ সিংহ? রাজ ফ্যামিলির?

—সেটা জানি না। তবে খুব শিক্ষিত। সায়েন্সের লোক।

—বুঝেছি। ওই যে তিনতলা। এখানকার রাজবাড়ি। উনি রাজ ফ্যামিলির বড় ভাই। রাজাবাবু।

—তাই নাকি?...থ্যাঙ্কিউ।

—আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

—কলকাতা থেকে।

—কী ব্যাপার?

—একটা সায়েন্স সেমিনারে নেমতন্ন করব।

—মনে হয় পাবেন না।

—পাব না? কেন?

—দুদিন হল ওনাকে দেখছি না, বাড়ির খবর শুনলাম। উনি বাইরে গেছেন।

—কোথায় গেছেন জানেন?

—না। রাজাবাবু বিজ্ঞানী লোক, এখানে থাকলে সারাদিন বাড়িতেই থাকেন। লেখাপড়া আর কীসব পরীক্ষা-টরীক্ষা করেন। সায়েন্সের কাজে মাঝে-মাঝে বাইরে যান। একসপ্তা-দশদিন পর ফিরে আসেন।

—বাড়িতে আর কেউ নেই?

হ্যাঁ। রাজাবাবু বিয়ে করেননি। ছোটভাই অজিত সিংহ বিবাহিত। রানিমা আর ছেলে! আর থাকে ওদের ধাইমা।

—ধাইমা! মানে আয়া?

—কাগজে-কলমে তাই। কিন্তু বুড়ি ওদের মায়ের মতো। খুব সম্মান করেন। ছোটবেলায় মা মারা গেছিলেন। ধাইমা দুজনকে বুকে করে মানুষ করেছে।

—দু-ভাই একসঙ্গে থাকেন?

—নিশ্চয়ই। দাদা-ভাইয়ের খুব মিল। তা ছাড়া রাজাবাবুর অবর্তমানে সবকিছু তো ছোটরাজাবাবুর একমাত্র ছেলেই পাবেন।

—অজিত সিংহ এখন বাড়িতে আছেন? তা হলে তাকেই কার্ডটা দিয়ে আসি। কথা বলে আসি।

—সে করতে পারেন। তবে অজিত সিংহ সুস্থ নন। কয়েকদিন নার্সিংহোমে ছিলেন। কাল সন্ধেবেলা ফিরেছেন।

*

যাই বলুন স্যার, মরা হাতি লাখ টাকা। অনন্ত সরখেল বলে উঠলেন। তাঁর চোখ গোল-গোল।

—সে কী! হাতি মরল কোথায়?

—আ: টুকলু, সব কথায় খোঁচা দিও না তো! বলছিলুম স্যার, ঘরের দেওয়ালের কারুকাজ, ফার্নিচার, ঝাড়লণ্ঠন সব দেখে বেশ গা-ছমছম করে, ঠিক যেন রাজবাড়ি।

রাজবাড়িই তো।—জগুমামা বললেন,—এক কালে এরা এই তল্লাটের রাজা ছিলেন। শুনলেন না? এখনও যা বিষয়সম্পত্তি আছে। খুব কম হবে না। তবে—

মামার কথা থেমে গেল। দীর্ঘকায় সুদর্শন এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকছেন। আদ্দির ফিনফিনে পাঞ্জাবি, বাঁহাতে মিহি ধুতির কোঁচা। নিশ্চয়ই ছোট রাজাবাবু অজিত সিংহ।

—নমস্কার। আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন? কিন্তু দাদা যে বাড়ি নেই।

—হ্যাঁ পাড়ায় শুনেছি।—জগুমামা বললেন,—আপনার দাদা আমাদের সায়েন্স সোসাইটির পুরোনো মেম্বার। মাঝে যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু দিন পনেরো আগে উনি চিঠি দিয়ে আমাদের ইনভাইট করেন। ওঁর নতুন রিসার্চ নিয়ে আলোচনার জন্য।

তাই? আচ্ছা!—অজিত সিংহ বললেন,—কিন্তু আমি তো দাদার রিসার্চের ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানি না।

—ডক্টর সিংহ কবে ফিরছেন?

—বলা মুশকিল। দাদা মাঝে-মাঝেই হুটহাট নিরুদ্দেশ হয়ে যান। সায়েন্সের কাজেই যান। দু-চারদিন পর আবার ফিরে আসেন। তা ছাড়া—

একটু থেমে বললেন,—এবার আমি নিজেই হসপিটালাইজড ছিলাম। এক উইক। কাল সন্ধেয় ছাড়া পেয়েছি। এসে শুনলাম, দাদা পরশু ভোর থেকে আবার নিরুদ্দেশ।

—সরি, মিস্টার সিংহ। আপনি অসুস্থ মানুষ, আপনাকে ডিস্টার্ব করছি।

—না-না, তেমন বড় কিছু নয়। ক'দিন ধরে পেটে একটা পেন হচ্ছিল। তাই জলপাইগুড়ির হিলভিউ নার্সিংহোমে চেকআপ করাতে ভরতি হয়েছিলাম।

এক ঝলক তাকালাম জগুমামার দিকে। রাতারাতি একখানা স্টোরি বানিয়ে ফেলেছেন।

কয়েক মুহূর্ত কথাহীন। ওয়াল ক্লকের শব্দ, টিক...টিক...।

হঠাৎ ঘরে বোমা ফাটল। মামা বললেন,—মিস্টার সিংহ, আপনি কি জানেন, আপনার দাদা বেঁচে নেই?

—ক-কী? কী বলছেন আপনি!

—হ্যাঁ, রণজিৎ সিংহকে কেউ বা কারা খুন করেছে। তাঁর ডেডবডি পাওয়া গেছে এখান থেকে মাইল কুড়ি দূরে। ছোট্ট একটা নদীর পাড়ে।

—দাদা-দাদাকে—

খ-খুন...! উ:...দাদা...দাদা...। রামবিলাস—! বউদিকে...একটু...উ:...! বিলাপ করতে করতে বুকে হাত দিয়ে অজিত সিংহ সোফায় এলিয়ে পড়লেন।

সর্বনাশ! ভদ্রলোক এত নরম প্রকৃতির! মামা তাড়াতাড়ি ওঁর কবজি টিপে ধরলেন। অজিত সিংহ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

কাজের লোক রামবিলাস, এক অভিজাত ভদ্রমহিলার আর বছর দশেকের একটি সুন্দর ছেলে ভেতর থেকে ছুটে এসেছে। আধবোজা চোখে মহিলার দিকে তাকিয়ে অজিত সিংহ থেমে-থেমে বললেন,—সুরমা...শুনছ? এনারা...এনারা খবর এনেছেন, আমার দাদা...দাদা...নাকি বেঁচে নেই।

সুরমা বিদ্যুৎপৃষ্ট হলেন। মুহূর্তে সুন্দর মুখ জুড়ে ব্যথা-ভয়-আতঙ্ক ছেয়ে ফেলল।

কয়েক মুহূর্ত। তার পরই সোজা আমাদের দিকে তীব্রচোখে তাকালে। বললেন,—আপনারা...আপনারা খবর এনেছেন? কে আপনারা? কোত্থেকে পেলেন? মিথ্যে কথা।

জগুমামা বললেন,—বলছি। একটু শান্ত হন। যিনি গেছেন তাঁকে ফিরে পাবেন না। বরং আমরা চেষ্টা করব যারা ওনাকে খুন করেছে, তাদের কঠিন শাস্তি দিতে।

একটু থেমে ফের বললেন,—অজিতবাবু, আমি একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাকে একটু আগে আমাদের সম্পর্কে যা-যা বলেছি, সেটা সবটা সত্যি নয়। হ্যাঁ, আমি নিজে বিজ্ঞানী। এ আমার ভাগ্নে টুকলু, এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে। ইনি দাঙ্গুয়াঝাড় থানার ওসি। ওর থানার এলাকাতে রণজিৎবাবুর বডি পাওয়া গেছে। আর আমাদের এক বন্ধু অনন্ত সরখেল।

এরপর মামা পুরো ঘটনা বলে গেলেন। সংক্ষেপে। তবে মৃত মানুষটিই রণজিৎ সিংহ, এটা কীভাবে নিশ্চিত হলেন, সরমা প্রশ্ন তুলতে পকেটে নাম লেখা কার্ড ছিল।

আবার ঘর জুড়ে নিস্তব্ধতা। সুরমা মুখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, বালকটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে, আর অজিত ভাঙাচোরা হয়ে পড়ে আছেন সোফায়।

বিনোদ নীচু গলায় বললেন,—মামাবাবু, এবার উঠবেন?

—আর একটু।...মিস্টার সিংহ, আপনার দাদার ল্যাবরেটরিটা একটু দেখতে চাই।

দাদার...? ও হ্যাঁ...নিশ্চয়ই! অজিত নির্জীব স্বরে বললেন,—রামবিলাস, বাবুদের দাদার ঘরে নিয়ে যাও। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড আমি যাচ্ছি না।

—অজিত! বাড়ি আছ?

গমগমে কণ্ঠস্বর। চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পড়লেন। চুস্ত পাজামা, ফিনফিনে সিল্কের পাঞ্জাবি, ভরাট মাংসল মুখ, গলায় সোনার চেন, আঙুলে তিন-চারটে হিরের আংটি।

আচমকা এতজনকে দেখে ভদ্রলোক একটু থমকে গেলেন। বললেন,—ও : তোমরা ব্যস্ত। আচ্ছা, চলি।

—না পদম, না। সর্বনাশ হয়ে গেছে। এ-ই-মা-ত্র শুনলাম, দাদা নেই। আমার একটা মাত্র দাদা! আমার গার্জিয়ান, বন্ধু!

অজিত ফুঁপিয়ে উঠলেন।

—কী বলছ?

—হ্যাঁ। পরশু সকালে। লাইনের পাশে ডেডবডি পাওয়া গেছে। কী করব, জানি না।...হ্যাঁ, পদম আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জাতে মাড়োয়ারি হলেও প্রায় দশ পুরুষ এখানে পুরোপুরি বাঙালি। জলপাইগুড়ি টাউনে ওর ব্যাবসা।

৫

প্রাসাদের দক্ষিণে দোতলার ছাদের ওপর বিশাল ঘর। দেখলেই বোঝা যায়, হালফিল বানানো হয়েছে। পুরোটা কাচের চারকোণে শুধু চারটে পিলার আর মাথার ওপর কাঠের ছাদ।

মনে হবে, খোলা প্রকৃতির বুকে বসে আছি। চারিদিকে প্রচুর গাছপালা। সবুজ আর সবুজ।

ঘরের এককোণে সিঙ্গল বেড খাট। ছিমছাম বেডকভার। বাকি জায়গা জুড়ে বিচিত্র চেহারার যন্ত্রপাতি। খাদের একপাশে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, চেয়ার। পাশে বই বোঝাই আলমারি। টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা কাগজপত্র, জার্নাল, রিসার্চ পেপার। পেনস্ট্যান্ডে গোটা পাঁচেক কলম।

ঘরের বাঁ-দিকে বন্ধ দরজা। বিনোদবাবু ছিটকিনি খুললেন। অ্যাটাচড বাথরুম।

মামা টেবিলে বসে পড়লেন। আলমারি থেকে বই নামাচ্ছেন, কাগজপত্র ওলটাচ্ছেন।

রামবিলাস ঘরের এককোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার চাউনি ঠিক নয়। ওসি লক্ষ্য করেছেন। কড়াগলায় বললেন,—ব্যাপার কী রামবিলাস? তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাবুকে বলো, আমরা পরে যাচ্ছি।

—দে মা আমায় পাগল করে...

অনন্ত সরখেল। খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ বোজা।

—আহা, মাকে ডাকার দরকার কী? আপনি এমনিতেই তো 'ইয়ে' আছেন।

এ...হে...হে। অনন্তবাবু খ্যাঁচ করে উঠলেন,—দিলে তো বারোটা বাজিয়ে। সবে ভাবটা এসে গেছিল। আহা, কী কথা—দে মা আমায় পাগল করে...নইলে মরব তোরই তরে...বিনোদবাবু বললেন, দাদা গানটা কার লেখা? আগে তো শুনিনি।

—হুঁ-হুঁ, শুনবেন কী করে? অরিজিন্যাল রামপ্রসাদী!

যে প্রসাদী হোক, এবার থামুন।—মামা মুখ না তুলে বললেন, মনে রাখবেন এটা শোকের বাড়ি।

—মামা! এদিকে একবার এসো! এই কার্নিশটা দেখেছ?

—হুঁ! একেবারে টাটকা ভেঙেছে।

মামা খোলা জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন নীচের দিকে। কিছু একটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে চট করে ভরে ফেললেন। বললেন,—এবার একটু...বোঝা যাচ্ছে। চল নীচে যাই। রণজিৎ সিংহ আবার কবিতাও লিখতেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। এই দ্যাখ।

পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করলেন। বেশ কাঁচা একটা কবিতা।

এসব নিয়ে খেলা যদি করবে
আগুনে পুড়ে নিশ্চয়ই মরবে।
যেথা দিয়ে গন্ধ ওড়ে
সেখানেই আছে পড়ে
আমার বুকের ধন
প্রাণ থাকতে দেব নাকো
এইটি আমার পণ।

ওসি বললেন,—মামাবাবু, এটা কি কবিতা? না ধাঁধা?

—ধাঁধা? হ্যাঁ, হতে পারে। কারণ রাজরাজড়ারা আগেকার কালে ছড়া-পদ্যে হেঁয়ালি লিখে যেতেন গুপ্তধন লুকিয়ে রাখার সময়। রণজিৎ বিজ্ঞানী হয়েও সেই পিতৃপুরুষের অভ্যেস হয়তো ছাড়তে পারেনি।

অজিত সিংহ ম্লানমুখে একা বসেছিলেন। শূন্যদৃষ্টি। মামা বললেন,—আপনার বন্ধু?

—পদম? ওর তাড়া ছিল। চলে গেল। দাদার ল্যাবরেটরি দেখলেন? উ: দাদা নেই, ভাবতে পারছি না।

—মেনে নিতে হবে অজিতবাবু। নিয়তি। আমরা একবার বাইরেটা ঘুরে দেখব। তারপর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলব। একটু থাকতে বলবেন।

বাড়ির সামনে বাগান। বেশ উঁচু পাঁচিল ঘেরা। আম, কাঁঠাল, জামরুল গাছ যেমন আছে, খানিকটা জায়গা জুড়ে কেয়ারি ঘাস, আর নানান ফুলগাছ। আমরা এসে দাঁড়িয়েছি কাচঘরের ঠিক নীচের ঘাসজমিতে।

নরম মাটিতে অস্পষ্ট কিছু ছাপ। ছড়িয়ে আছে, চুন-সুরকি-বালির টুকরো।

মামা মাথা নাড়লেন,—খুনের চরিত্র পরিষ্কার। ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, এই আঘাতে মৃত্যু ঘটেছে, না তার আগেই—

কে? কে ওখানে? আমি তাকাতেই একজন সাঁৎ করে সরে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটেছি।

—বিশ্বাস করুন বাবু, আমি এমনই দাঁড়িয়েছিলাম।

হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে রামবিলাস কাঁপছে। টানতে-টানতে ওকে নিয়ে এলাম। বললাম,—এই যে ইনি। আড়িপেতে শুনছিলেন।

মামা কয়েক পলক রামবিলাসকে মাপলেন। বললেন,—খবরদার রামবিলাস লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি।

আমরা আবার ড্রইংরুমে এসে বসেছি। অজিত সিংহের সঙ্গে কথা শুরু হল।

—আপনি খুনের ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন।

—নাহ। দাদার কোনও শত্রু ছিল না। দাদা, দাদা নেই, এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। ডক্টর মুখার্জি।

—ডক্টর সিংহ উইল করেছিলেন?

—হ্যাঁ। আমার একমাত্র ছেলে ওয়ারিশান।

—আপনার সঙ্গে দাদার এরমধ্যে কোন সমস্যা হয়েছিল।

—প্রশ্নই ওঠে না। দাদা ভগবানতুল্য।

—রিসার্চের ব্যাপারে ওনার কেমন খরচ হত?

—কম নয়।

—ওই বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?

—সত্যি কথা বলব? আমি সায়েন্সের কিছু বুঝি না। মাঝে-মাঝে মনে হত, দাদা রিসার্চের পেছনে অকারণ টাকা নষ্ট করছেন। তবে মুখে তাকে কোনওদিন কিছু বলিনি। দাদাকে আমরা সবাই অসম্ভব ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম।

—ধন্যবাদ অজিতবাবু। আপনি দয়া করে সুরমা দেবীকে পাঠিয়ে দিন।

কিন্তু সুরমা দেবী এসে কাঁদতে-কাঁদতে শুধু বললেন, দেবতুল্য ভাসুরের মৃত্যুতে তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। এখন কিছু বলতে পারবেন না।

রাজফ্যামিলির তৃতীয়জনকে ডাকা হল। সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। একমাত্র উত্তরাধিকারী। অজিত-সুরমার বাচ্চা ছেলে।

—তোমার নাম?

—সঞ্জিত সিংহ।

—তুমি জ্যাঠাকে ভালোবাসতে?

—খু-উ-ব। জেঠুও আমাকে ভীষণ ভালোবাসত।

—ওঁর রিসার্চ নিয়ে তোমায় কিছু বলতেন?

—হ্যাঁ। বলতেন, উনি যে কাজ করছেন, তা সত্যি হলে চারদিকে দারুণ হইচই হবে। এমন কোনওদিন কেউ ভাবেনি। বলতেন, তখন সব মানুষ খেতে পারবে, পরতে পারবে।

—কীভাবে হবে, তুমি জিগ্যেস করোনি?

—হ্যাঁ। করেছিলাম। জেঠু বলতেন, বাতাস থেকে উনি সব সৃষ্টি করবেন। আমি বিশ্বাস করিনি। বলুন কাকু, এ কী সম্ভব? তাই ভাবতাম মজা করছেন।

—আর কিছু বলেছেন?

সঞ্জিত একটু ভাবল, তারপর বলল,—কয়েকদিন হল জেঠু বলতেন, আমার ভয় করছে! যত কাজটা শেষ হয়ে আসছে, তত একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। বলতেন, যদি আমার কিছু হয়ে যায়, কাগজপত্র এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব, সহজে কেউ খুঁজে পাবে না। তুই আমাদের একমাত্র শিবরাত্রির সলতে। বড় হয়ে বাকিটা শেষ করবি।

—মঙ্গলবার রাতে তোমার সঙ্গে জেঠুর দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। রাতে শোবার আগে রোজকার মতো খানিকক্ষণ গল্প করে এসেছিলাম।

চতুর্থ জন 'সিংহ এস্টেট'-এর ম্যানেজার সফিউল ইসলাম। পঞ্চাশের ওপরে বয়স। রোগা, কালো ছোটখাটো চেহারা। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, মানুষটি বুদ্ধিমান।

কতদিন আছেন?

—তা বছর পঁয়ত্রিশ হল। দুই ভাই তখন ছোট। বড়রাজা সর্বজিৎ সিংহ আমায় কলকাতা থেকে নিয়ে আসেন। এস্টেটের দেখাশোনা করতে। আর ফেরা হয়নি। জড়িয়ে গেছি এনাদের সঙ্গে।

—এখন এস্টেটের অবস্থা কেমন!

—চলে যাচ্ছে। আয় বলতে জমিজমার চাষবাস থেকে। খাজনাটাজনা কবেই তো উঠে আছে।

—দু-ভাইয়ের খরচ কি একসঙ্গে উইথড্রয়াল হত?

—হ্যাঁ। তবে—

—বলুন।

—ছোটবাবু মাঝে-মাঝে হাজার, দু-হাজার আলাদা তুলতেন।

—বড়বাবু জানতেন?

—হ্যাঁ।

—ভাইকে কিছু বলতেন না?

—একটু বকাবকি করতেন, 'এরকম আর কোরো না' ব্যস ওই পর্যন্ত। প্রচণ্ড ভালোবাসতেন ভাইকে।

—বড়বাবু নিজের জন্য আলাদা টাকাপয়সা—

—না। কোনওদিন তোলেননি। ওনার খরচ কিছুই ছিল না। রিসার্চের খরচ বোধহয় সরকার থেকে পেতেন।

—নিশ্চয়ই শুনেছেন, রণজিৎ সিংহ খুন হয়েছেন।

—হ্যাঁ, একটু আগে শুনেছি।

—আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?

সফিউল মাথা নাড়লেন,—নাহ। খুব ক্ষতি হয়ে গেল। আমি বিশ্বাস করি, আকাশের গায়ে থুতু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে।

গেটের দারোয়ান মনিলালকে এরপর ডাকা হল।

—তুমি মঙ্গলবার রাতে গেট পাহারায় ছিলে?

—আজ্ঞে না বাবু। ওদিন দয়ারামের ডিপটি ছিল। একদিন ও একদিন আমি, এইভাবে পালা করে রাতডিপটি হয়।

—দয়ারাম? সে কোথায়?

—নেই বাবু। বুধবার সকালে দেশে গেছে।

—দেশে? কোথায়?

—কুচবিহার চাংড়াবান্ধায় বাবু। দু-চারদিনের মধ্যে এসে পড়বে।

বুড়ি ধাইমা থাকেন একতলাতে। বৈঠকখানার পাশে। তবে কথা বলা গেল না। বৃদ্ধা ঘুমোচ্ছেন।

এরপর রান্নার ঠাকুর, কাজের দুই মহিলা এদের সঙ্গে মামা কথা বললেন।

ফেরার পথে মামা বললেন,—বিনোদ। জলপাইগুড়ি শহরে আমাদের থাকতে হবে। থাকার মতো একটা হোটেল দেখে দাও।

৬

ডিবিসি রোডের ওপর 'রুক্মিনী' হোটেল। চলনসই। তারই একটা বড় ঘরে আমরা তিনজন।

পড়ার বেশ ক্ষতি হচ্ছে। ওয়ার্কশপ গুলোয় থাকতে পারছি না। কিন্তু উপায় নেই। অবশ্য প্রিন্সিপ্যাল মামাকে আশ্বস্ত করেছেন, আমার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করবেন। সেই ভরসাতেই আছি।

তিনটে নাগাদ শৌভিক এসেছিল। মামার সঙ্গে আলাপ করে ও থ্রিলড। কলেজেও নাকি আমাকে নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে।

অনন্তবাবু একটানা নাক ডেকে চলেছেন। মামা টেবিলের সামনে রণজিৎ সিংহের আলমারি থেকে টানা একগাদা কাগজ, বই, ম্যাগাজিন ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, নোট দিচ্ছেন।

—বুঝলি টুকলু, রনজিৎ ইন্টারেস্টিং রিসার্চ করছিলেন।

—বিষয়টা কী?

—শুনলি না। সঞ্জিত বলল, বাতাস থেকে জেঠু সবকিছু বানাবেন বলছিলেন।

—ধ্যুৎ! এটা আবার সত্যি নাকি?

—হ্যাঁরে, হান্ড্রেড পার্সেন্ট। ভদ্রলোক বায়ুমণ্ডল থেকে মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরির করার কাজই করছিলেন।

—সেটা কি আদৌ সম্ভব?

—হ্যাঁ। নয় কেন?

মামা কয়েক পৃষ্ঠা জেরক্স কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন,—দ্যাখ, কী লেখা আছে? 'ন্যাচারাল গ্যাস-এর মেটিরিয়াল ফর ফিউচার'। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে কীভাবে কোন-কোন সিরিজ রিঅ্যাকশনে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওয়া যেতে পারে, তার সূত্র দেওয়া আছে। এই সূত্রগুলো কয়েকটা পেয়েছিলাম রণজিৎ সিংহের পকেটের কার্ডে।

একটু থেমে বললেন,—তবে এটা সূত্র থিয়োরি। রিসার্চ করে এই থিয়োরিকে ইমপ্লিমেন্ট করবেন বিজ্ঞানী। রণজিৎ সেটাই করছিলেন। মনে হয়, সাকসেসফুল হয়েছিলেন।

—তাই? কাগজপত্র কিছু পেয়েছ?

—পাব কীভাবে? রণজিতের খুন হওয়ার কারণ তার রিসার্চ পেপার। তবে একটা চান্স আছে। ওর লেখা ওই কবিতার আড়ালে যদি কোনও হেঁয়ালি থাকে, তার মানে আসল কাগজপত্র লুকোনো আছে। আততায়ী ভুল কাগজ পেয়েছে।

—বাঁচা গেল!

—মোটেই না। ছড়াটা মনে করে দ্যাখ, এসব নিয়ে খেলা করলে আগুনে মরতে হবে। এর মানে যদি এই হয়, নকল কাগজ নিয়ে রিসার্চ চালালে—

—আগুন ধরে যাবে।

রাইট। আমরা অপরাধীদের জীবন্ত ধরতে চাই। আর আগুন জ্বললে শুধু তারা মরবে না, মরবে নিরীহ মানুষও। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

—কিছু বুঝছ?

—হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি। একটা জায়গা শুধু ঝাপসা।

কলিংবেল।

বিনোদ দাশগুপ্ত ঢুকে পড়লেন। উত্তেজিতভাবে বললেন,—মামাবাবু, গলা টিপে খুন! এই যে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট।

—যাক, মিলে গেল।

ক-কী? কী মিলে গেল স্যার?—অনন্ত সরখেল ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন।

—আপনি। এমন অমাইক নাক আপনার! কখন উঠবেন, ভাবছিলাম।

জগুমামা পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন। বললেন,—বেরোতে হবে। বিনোদ, তুমি আমাদের হিলভিউ নার্সিংহোমে নামিয়ে দিয়ে নয়ানগুড়ি থানায় যাবে। ওসি-কে বলবে রাজবাড়ির সবাইকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, খুনের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির কেউ বাইরে যেতে পারবে না। আর সাদা পোশাকের পুলিশ পোস্টিং থাকবে।

সন্ধে পেরিয়ে গেছে। আমরা এখন হিলভিউ নার্সিংহোমে। ঝকঝকে-তকতকে করিডোর পেরিয়ে সুপারের চেম্বার।

অনন্ত সরখেল বাইরে, ওঁর নাকি হাসপাতালে ঢুকলে 'মড়া-মড়া' গন্ধ লাগে। রাস্তায় ঘুরপাক খাচ্ছেন।

জগুমামা পরিচয় দিতেই উঠে দাঁড়ালেন সুপার,—বসুন প্লিজ।

—অ্যাডমিশন রেজিস্টারটা একটু দেখতে চাই।

নিশ্চয়ই।—সুপার ফোন তুলে বললেন,—অমল, ভরতির খাতাটা পাঠাও। মেট্রনকেও আসতে বোলো।

তারপর বললেন,—কী জানতে চান, বলুন।

নয়ানগুড়ি রাজফ্যামিলির অজিত সিংহ কি এখানে ভরতি ছিলেন?

—অ-জি-ত সিং? হ্যাঁ-হ্যাঁ।

—কতদিন ছিলেন?

—মনে হয়, সাতদিন। চেক করে নিচ্ছি।

—কবে রিলিজ হয়েছেন?

—কাল বিকেলে।

—কী হয়েছিল?

—ওনার পেটে একটা পেন হচ্ছিল। থরো চেকআপ করালেন। কিছুই অবশ্য পাওয়া যায়নি। গ্যাসস্ট্রিকের পেন হতে পারে।

—অজিতবাবু মাঝে বাড়ি গেছিলেন?

বাড়ি? না!...এই যে সুধাদি,—এসে দাঁড়ানো মেট্রনের দিকে তাকিয়ে বললেন,—নয়ানগুড়ির অজিত সিংহ এখানে ভরতি হওয়ার পরে মাঝে বাড়ি গেছিলেন?

প্রশ্নই ওঠে না।—মেট্রন বললেন,—আমাদের এখানে ভরতি হয়ে গেলে ডিসচার্জ না হওয়া পর্যন্ত কোনও পেশেন্টকেই নার্সিংহোমের বাইরে যেতে অ্যালাও করা হয় না।

বলতে-বলতে রেজিস্টার খুলে ধরলেন,—দেখে নিন। অজিত সিংহের জন্যে এমনকী চব্বিশঘণ্টা নার্স ছিল।

রেজিস্টারে অজিত সিংহের নাম-ঠিকানা লেখা। ডিসচার্জের সময়, তারিখ, এবং পেশেন্টের সই রয়েছে।

একজন সিস্টার ঘরে ঢুকলেন, বললেন,—স্যার, চব্বিশ নম্বরের দুজন ভিজিটার দেখা করতে চাইছে। ভিজিটিং আওয়ার শেষ। বলছে খুব দরকার।

—খাতায় লিখিয়ে নাও। তবে পাঁচ মিনিটের বেশি নয়।

সিস্টার বেরিয়ে গেলেন। মামা বললেন,—আপনারা কি ভিজিটরস রেজিস্টার মেনটেন করেন?

—হ্যাঁ। ভিজিটিং আওয়ারেও পেশেন্টের কাছে যেতে হলে ওই খাতায় নাম লিখে যেতে হয়।

—বা:! চমৎকার নিয়ম।

—আজকাল নর্থবেঙ্গলে দুমদাম সব ঘটনা ঘটছে। তাই এই সিস্টেম চালু করেছি।

—গুড। খাতাটা একবার আনবেন?

—নিশ্চয়ই।

মিনিট খানেকের মধ্যে জাবদা খাতা এসে গেল।

দ্রুত পাতা উলটে যাচ্ছে, মামার চোখ নামছে ওপর থেকে নীচে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে মামা থেমে গেলেন। একটা নামের জায়গায় তর্জনি ঠেকিয়ে বললেন,—বি সিনহা! ইনি কে?

মামা হঠাৎ উত্তেজিত।

—ইনি কে স্যার, সেটা কী করে বলব? রোজই তো গাদা-গাদা ভিজিটর আসছে।

—নো! প্লিজ, দায়িত্ব এড়াবেন না। পারটিকুলারলি এই ভিজিটরের পরিচয় আমায় জানতেই হবে। ইনি এসেছিলেন এগারো তারিখ, মানে মঙ্গলবার বিকেলে। ওইদিন পেশেন্টের অ্যাটেন্ডিং নার্স কে ছিলেন? আমি

কথা বলব।

—আমি দেখছি স্যার।

সুধা দেবী বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই একজন অল্পবয়েসি সিস্টারকে নিয়ে ঢুকলেন।

—বিনতা, স্যার এগারো তারিখ অজিত সিংহের কাছে বিকেলে যে ভিজিটররা এসেছিলেন তাদের সম্বন্ধে জানতে চান। তুমি তো সেদিন ডিউটিতে ছিলে।

মামা বললেন,—খাতায় দেখছি, সেদিন মাত্র একজন ভিজিটর এসেছিলেন।

—হ্যাঁ স্যার।

—আপনি তখন রুমে ছিলেন?

—হ্যাঁ। ওনাকে ড্রেস-আপ করাচ্ছিলাম। ভদ্রলোক এসে করিডরে বসে ছিলেন। ড্রেসিং শেষ হতে মিস্টার সিংহ আমায় বললেন, ভিজিটরের সঙ্গে ওনার কিছু পার্সোনাল কথা আছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। ওই ভদ্রলোক রুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

—তারপর?

—প্রায় আধঘণ্টা পরে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক দরজা খুলে দিয়েছিলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলাম মিস্টার সিংহ বালিশে হেলান দিয়ে আছেন। ভিজিটর এরপর আরও বিশ-পঁচিশ মিনিট ছিলেন। দুজনে কথাবার্তা বলছিলেন।

—ভিজিটর ভদ্রলোক কি বৃদ্ধ?

—হ্যাঁ। সত্তরের ওপর বয়স তো হবেই। রবীন্দ্রনাথের মতো বুক অবধি সাদা দাড়ি। মাথায় টুপি। চোখে চশমা। হাতে একটা সুন্দর লাঠি।

—হুঁ। আপনি তো রাত আটটা অবধি ডিউটিতে ছিলেন। এরপর পেশেন্ট কী করলেন?

কী করলেন?—একটু ভাবলেন বিনতা। তারপর বললেন,—কী আবার করবেন? এমনিতে তো সুস্থ লোক। মাঝে-মাঝে শুধু করিডরে পায়চারি করছিলেন, বারবার নিজেই জাগ থেকে ঢেলে জল খাচ্ছিলেন। ভিজিটর আসার পরে ওনার মধ্যে একটু যেন অস্থিরতা দেখেছিলাম।

—ঠিক আছে। আপনার ঠিকানাটা দিন। হয়তো প্রয়োজনে যেতে পারি।

করিডর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে লক্ষ্য করলাম, মামা অন্যমনস্ক।

কিন্তু 'ফেভিকল' গেল কোথায়? কোনও দিকেই অনন্ত সরখেলের টিকি দেখতে পাচ্ছি না।

মামা গুরুত্ব দিলেন না। বললেন,—যেখানে যায়, যাকগে।

বাস ছুটে চলেছে ঝড়ের গতিতে। ময়নাগুড়ি পেরিয়ে এসেছি। মসৃণ ন্যাশনাল হাইওয়ে।

চাংড়াবান্ধায় যাচ্ছি। ওসি বিনোদ দাশগুপ্ত আর আমি।

মনমেজাজ ভালো নয়। অনন্ত সরখেল কাল রাতে ফেরেননি। কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মামা অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন। তবু মনটা মাঝে-মাঝে খচখচ করছে।

মাঝে-মাঝেই নিবিড় জঙ্গল, আবার খোলা মাঠ, ধানের খেত।

ওসি চোখ বুজে। আমি ঘটনাগুলোকে পরপর সাজিয়ে ফেলার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

—ছ্যাংড়াবান্দা! ছ্যাংড়াবান্দা...!

কন্ডাক্টরের বিকট চেঁচামেচিতে ধড়মড়িয়ে উঠলেন বিনোদবাবু,—টুকলু, এসে গেছি।

—সরি। আমি জেগে আছি।

—নেমে পড়েছি। তীব্র হর্ন বাজাতে-বাজাতে বাসটা চলে গেল লাস্ট স্টপ হ্যামিল্টনগঞ্জের দিকে।

অল্প কিছুটা জায়গা জুড়ে বাজার। রাস্তার দু-দিকে দোকান পসার। চতুর্দিকে গণ্ডগ্রাম।

চাংড়াবান্ধা ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার অঞ্চল। বাঁ-দিকে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের পাকাপোক্ত ক্যাম্প।

ওই তো সীমান্ত! ছোট-ছোট খয়েরি পাথর বসানো।

পাথরের ওপারে বিদেশ—অন্য রাষ্ট্র। বাংলাদেশ।

অদ্ভুত একটা আবেগ জেগে উঠল। এক জাতি, এক ভাষা, এক সাহিত্য-সংস্কৃতি, এক অনুভূতি, এক জীবনযাপন, ভালোমন্দ। তবুও মিথ্যে ধর্মের দোহাই দিয়ে উনিশশো সাতচল্লিশে চিরে দেওয়া হল একটা শরীরকে। তার আগে ভয়ংকর দাঙ্গা, মন্বন্তর। এক জাতিকে শেষ করার সবরকম চক্রান্ত। তারপরেও কত আলোড়ন...! ভাষার অধিকার নিয়ে কত রক্ত ঝরল...বাংলা ভাষাকে বুকে নিয়েই ওপার বাংলার মানুষ ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতা। বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র জন্ম নিল। মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠেছে, গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা...

আর কত ভাগ হব আমরা? আবার সেই সাতচল্লিশের আত্মধ্বংসী খেলা শুরু হয়ে গেছে। আগুন জ্বলছে দেশের কোণে-কোণে। এই দেশটার জন্যে কি একটুও ভাববে না নেতারা? শুধুই বুদ্ধু বানাবে?

টুকলু, তোমার হলটা কী? বিনোদবাবু কাধে চাপড় দিয়ে বললেন,—চলো খোঁজ নিই।

সামনের বুকস্টলে বসা কিশোরকেই বললেন,—ভাই, দয়ারাম বলে কাউকে চেনো? নয়ানগুড়ির রাজবাড়ির দারোয়ান।

—না। আপনি বরং ওই মুদির দোকানে গিয়ে খোঁজ করুন।

মুদির দোকানের প্রৌঢ়র কাছে গিয়েও একই প্রশ্ন করলেন। প্রৌঢ় বললেন,—দয়ারাম? হ্যাঁ চিনি। দিনদুয়েক আগেই বাড়ি এল। কাল বিকেলে আমার দোকানে এসেছিল। ওই যে গ্রামের ভিতর ঘরগুলো

দেখছেন, ওখানেই বাড়ি। এই রাস্তা বরাবর একটু হেঁটে গেলেই মোড় পড়বে। বাঁ-দিকে ঘুরে প্রথম বাড়ি।

হঠাৎ মোটর গাড়ির শব্দ।

একটা ঝকঝকে সাদা অ্যাম্বাসাডার সাঁ করে চলে গেল ময়নাগুড়ির দিকে। নম্বর—এসকেএন ২০০০।

কিন্তু গাড়িতে কে বসে? চেনা মুখ? জানলার ওপর রাখা আঙুলগুলো থেকে রোদ্দুর ঠিকরে উঠছিল?

টুকলু, টায়ারের দাগ দেখেছ।

—অ্যাম্বাসাডারটা হয়তো ঢুকেছিল।

ঠিক তখনই কানে আছড়ে পড়ল কান্নার ধ্বনি। সামনের মাটির ঘরগুলো থেকে ভেসে আসছে।

সেদিকে একটু এগিয়েছি। আমাদের পা মাটিতে গেঁথে গেল।

রাস্তার ওপরে চিত হয়ে পড়ে আছে একটি মানুষের শরীর। চারপাশে রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

নিস্পন্দ মানুষটিকে ঘিরে নানাবয়সের মেয়ে পুরুষ। তারাই কাঁদছে।

দয়ারাম!—বিনোদ দাশগুপ্ত অস্ফুটে বললেন।

প্রায় পৌনে ছ'টা। সন্ধে পেরিয়ে গেছে। জলপাইগুড়ি পৌঁছোলাম।

আজ সারাটা দিন গেছে বটে। চাংড়াবান্ধা থানায় রিপোর্ট করা, দয়ারামের মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমে পাঠানো, ওর আত্মীয়দের সান্ত্বনা দেওয়া...।

আমাদের অনুমান পুরোপুরি মিলে গেছে।

অ্যাম্বাসাডার চেপে যে এসেছিল, সে দয়ারামের অতি পরিচিত। ডাক শুনে দয়ারাম শশব্যস্তে এগিয়ে গেছিল। ঠিক তখনই পরপর তিনটি গুলি। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো ছিল। আওয়াজ হয়নি। আততায়ী যেমন এসেছিল, তেমনি দ্রুত চলে যায়।

মামাকে এখনই জানানো দরকার। মামা নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন।

হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছি, থমকে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে মিশে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

বিনোদবাবু মুহূর্তে রিভলভার বের করলেন,—কে? কে ওখানে?

—বাবু, আমি।

আবার রামবিলাস। আমি দৌড়ে গিয়ে খপ করে ওর কলার চেপে ধরলাম,—আবার? আবার আমাদের পিছনে? বল বল, কী জন্যে দাঁড়িয়ে আছিস?

—না, মানে....সায়েব চলে গেছেন। আপনাদের সেই খবরটা দিতে...

সায়েব মানে জগুমামা? চলে গেছেন? সেটাও দেখেছে। পুরো খোঁচড়!

—খবরটা দিতে? ন্যাকা শয়তান। কে বলেছে? বিনোদবাবু হোটেলে খোঁজ নিন তো!

বিনোদ হোটেলে ঢুকে গেলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে কনুইয়ের বেমক্কা ধাক্কায় আমি গড়িয়ে পড়েছি। রামবিলাস হাওয়া।

—টুকলু! মামাবাবু সত্যিই চলে গেছেন। উনি একটা চিঠি...একী! বিনোদবাবু দৌড়ে এলেন। ওঁর হাতে একখণ্ড কাগজ।

—নচ্ছারটা আচমকা ধাক্কা মেরে পালাল। মামার চিঠিটা দেখি।

টুকলু,

জরুরি কাজে কলকাতায় যাচ্ছি, এবার বোধহয় জটটা খুলতে পারব। আজ ধাইমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। একটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিসও করব।

পরশু সকালেই ফিরছি। চিন্তা করিস না। দয়ারামের কাছ থেকে কিছু জানতে পারলি?

বিনোদ যেন তোর সঙ্গে হোটেলেই থাকে। খুব সাবধান।

জগুমামা।

৮

—আপনাকে ধরে ফেলেছি। আর দুটো পয়েন্ট পেলেই—য-যা! গোল হয়ে গেল।

বিনোদ দাশগুপ্ত হাসলেন,—চেষ্টা করো বৎস। ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এগেন।

আজ সোমবার। যে-কোনও সময় মামা চলে আসছেন। তার পরেই শুরু হয়ে যাবে তদন্তের শেষ অধ্যায়। তাই মনকে তাজা রাখতে সকাল থেকে দুজনে মেতে আছি মজার 'ভিডিয়ো ফুটবল' নিয়ে। পকেট ক্যালকুলেটরের সাইজ। তার মধ্যেই ছোট্ট স্ক্রিন। বিদেশি বস্তু। ওসি-কে এক বন্ধু প্রেজেন্ট করেছেন।

এই সময় বেল বেজে উঠল।

হ্যাঁ, জগুমামা। কিন্তু আর কিছু বলব কি, আমরা 'হাঁ' হয়ে গেছি।

জগুমামার পিছন-পিছন ঘরে ঢুকছেন স্বয়ং অজিত সিংহ, আজ তাঁর পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবি নয়, প্যান্ট-শার্ট। চুলটাও অন্য কায়দায় আঁচড়েছেন।

কী রে, অবাক হয়ে গেলি?—জগুমামা হাসিমুখে। বললেন—এত অল্পে অবাক হলে চলবে? বসুন মিস্টার সিংহ, আমাদের এখনই বেরোতে হবে। বিনোদ, দয়ারামের সঙ্গে দেখা হল?

—হয়েছে। তবে কথা বলার সুযোগ হয়নি। কারণ, আমরা পৌঁছোবার ঠিক আগেই গাড়িতে এসে আততায়ী গুলি করে মারে। গাড়িটাকেও দেখতে পেয়েছিলাম, কাজ সেরে ফিরে যাচ্ছিল।

—প্যাথেটিক। এই ভয়টাই করছিলাম। প্রতিপক্ষ অসম্ভব হিংস্র।

জগুমামার হাসি মুছে গেছে। মুখে বিষাদের ছায়া। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন,—মনে হয় আমাদের প্রমাণের কোনও অসুবিধে হবে না।

—হবে না?

—না।

—মামা অনন্তবাবুর খোঁজ কিন্তু এখনও পাওয়া যায়নি।

—ওকে কিডন্যাপ করেছে। তবে চিন্তা নেই। ওকে ছাড়িয়ে আনার লোক লাগানো হয়েছে। ফিরে আসবে।

—আরেকটা ইনফর্মেশন। পরশুদিন সন্ধেবেলায় রামবিলাস হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। চেপে ধরতে আমায় ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেল।

—সে যাকগে! চটপট রেডি হয়ে নে। বেরোব। আমরা ততক্ষণে লাউঞ্জে একটু চা খেয়ে নিই। চলুন, মিস্টার সিংহ।

বিনোদ বললেন,—মামাবাবু, কোন দিকে?

—আপাতত নয়ানগুড়ির রাস্তাই ধরো। বিনোদ, একমিনিট! ওই গাড়িটাই তো সেদিন দেখেছিলে?

মুহূর্তে শরীরে ঢেউ খেলে গেল। সেই সাদা অ্যাম্বাসাডার, এসকেএন ২০০০। একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইটাই।

—আমাদের ফলো করবে বলে কেমন রেডি হয়ে আছে দেখেছ? আরে বাবা, তোমাদের ঘাঁটিতেই যাচ্ছি।

আমাদের অ্যাম্বাসাডর স্পিড তুলেছে। সবাই চুপচাপ। মামা শুধু একবার বলেছেন,—বিনোদ, বি কসাস।

পিছনের অ্যাম্বাসাডারটাও ছুটে আসছে। মামার অনুমান নির্ভুল।

জলপাইগুড়ি শহর ছাড়িয়ে এসেছি। ময়নাগুড়ির সড়ক হয়ে এখন নয়ানগুড়ির দিকে।...

প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেছে। ইঞ্জিনের টানা শব্দ।

—বিনোদ! শিবমন্দিরের মাথাটা দেখেছ? ওর পাশ দিয়ে ঢুকব।

সামান্য গতি কমিয়ে একটু সরু রাস্তায় ঢুকে পড়েছি। অনুসরণকারীরাও তাই।

হঠাৎ অ্যাম্বাসাডারটা গতি বাড়িয়ে দিল। দ্রুত চলে আসছে কাছাকাছি।

বিনোদবাবুও সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাকাসিলেটরে চাপ দিয়েছে। কিন্তু পাল্লা দিয়ে পারছেন না! প্রচণ্ড বেগে গাড়িটা তেড়ে আসছে।

কাছে...আরও কাছে...আমাদের ওভারটেক করবে? একেবারে পাশাপাশি এসে গেছে...কী চায়?

মামা বললেন,—কুইক! সবাই মাথা নীচু করো।

একটা হাত জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে উদ্যত রিভলভার, আঙুলে অনেকগুলো আংটি।

পরপর শব্দ। নাহ! চলন্ত চাকায় বুলেট বেঁধাতে পারেনি। পরমুহূর্তে ছিটকে সামনে চলে গেল অ্যাম্বাসাডার। স্পিড তুলে দূরে...আরও দূরে। এক সময় মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

—বিনোদ, বিপদ এখনও কাটেনি কিন্তু।

এক মিনিটও কাটেনি, ক্যাঁ,—চ-চ! হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তে সামলে নিয়েছি। ব্রেক কষেছেন বিনোদবাবু।

—সাংঘাতিক। আরেকটু হলেই সবক'টা টায়ার যেত।

মামা মৃদু হেসে বললেন,—দিস ওয়জ এক্সপেক্টেড!

মিনিট কয়েকের মধ্যেই কাচের টুকরোগুলো পা দিয়ে সরিয়ে ফেললাম। রাস্তা ক্লিয়ার। গাড়ি আবার ছুটে চলল।

—এসে গেছি।

গাছপালা দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা বাংলো বাড়ি। ওই সাদা অ্যাম্বাসাডারটাও আছে।

জগুমামা বললেন,—আপনি গাড়িতেই বসুন মিস্টার সিংহ।

মামার কথা শেষ হওয়ার আগেই পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল—হ্যাঁ, রামবিলাস। মুখে তার সেই বোকা-বোকা হাসি।

রামবিলাস!—মামা হেসে বললেন,—এসে গেছ। গুড। আমাদের কত্তা কই? তাকে ছাড়িয়েছ?

আমরা হতভম্ব।

স্যার, এই যে আমি।—ঝোপের আড়াল থেকে এবার উঠে দাঁড়ালেন অনন্ত সরখেল। ঝড়ে পড়া কাকের মতো চেহারা হয়েছে।

—অনন্তবাবু! কেমন আছেন?

বেঁচে আছি ভাই। —অনন্ত সরখেল চিঁ-চিঁ করে বললেন।

—আপনিও গাড়িতে থাকুন।...রামবিলাস, নজর রেখো, চলো বিনোদ।

গ্রিল গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। জগুমামা চেঁচিয়ে বললেন,—পবনবাবু, পবনবাবু! বেরিয়ে আসুন। সব ফাঁস হয়ে গেছে।

কোনও সাড়া নেই। মামা আরও জোরে বললেন,—মিস্টার জ্যাজোদিয়া, অযথা হয়রানি করবেন না। ফল খারাপ হবে। আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট আর্মড ফোর্স আছে।

দরজা খুলে গেল। বাইরে এসে দাঁড়ালেন পবন জ্যাজোদিয়া। মাংসল মুখের ভাঁজে-ভাঁজে শয়তানি হাসি।

—কার খারাপ ফল হবে, বিজ্ঞানীবাবু? আমার বাড়ি অ্যাটাক করলে, আপনাদের ওই পাগলটার কী হবে? সে কি বাঁচবে? শোনেন, এক্সপেরিমেন্ট লাস্ট স্টেজে। এখনই ফাইনাল রিঅ্যাকশন শুরু করবে আমরা সায়েন্টিস্টরা। এখন ডিসটার্ব করবেন না।

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে পবন দরজা দিয়ে ঢুকছে। জানে না, অনন্ত সরখেল আর ওর কবজায় নেই।

মামা বললেন,—জ্যাজোদিয়া, শুনুন-শুনুন। এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করুন। ওটা ভুল রিঅ্যাকশন। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ধ্যুস!—পবন জ্যাজোদিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে বলল,—ফালতু ঢপ দেবেন না! আরে মোশই, কত্ত লোককে 'ধুর' বানালাম, আর আপনি এসেছেন আমায় 'ধুর' বানাতে! যান, যান।

বাংলোর দরজা বন্ধ করে দিল।

—মামাবাবু, ভিতরে ঢুকবেন তো? ফোর্সকে ডাকি?

—কিচ্ছু না! সময় হলে বলব।

বলে অনেক্ষণ পরে জগুমামা একটা সিগারেট ধরালেন।

আশ্চর্য ব্যাপার। ভেতরে জলজ্যান্ত ক্রিমিন্যাল সদলবলে বসে আছে, অথচ মামা নির্লিপ্ত। সিগারেট টানছে।

বুম...! বুম...! বুম...! আচমকা আকাশ ফাটানো আওয়াজ! কয়েক মাইল জুড়ে থরথর করে কেঁপে উঠল।

—কী ভয়ংকর দৃশ্য! সুন্দর বাংলোটা বিস্ফোরণে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে...ছিটকে উঠছে কড়ি,...বরগা...সিমেন্ট, বালির গুঁড়ো...দাউ-দাউ করে জ্বলছে বাংলো।

কথা শুনল না। কী করব? মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নিজে তো মরল, কজন রিসার্চ স্কলারকেও মারল। চলো বিনোদ, ফেরা যাক।

রাজবাড়ির ড্রইংরুম। তবে আজকের পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্য। সোফাগুলি ভরতি। নয়ানগুড়ির ওসি, জলপাইগুড়ির ওসি, বিনোদ দাশগুপ্ত ছাড়াও রয়েছে ডিআইজি, জলপাইগুড়ির এসপি, ডিএসপি এবং অন্যান্য পুলিশের কর্তারা। সুদৃশ্য সব চেয়ারে জগুমামা, অনন্তবাবু, আমি এবং হ্যাঁ—দুই অজিত সিংহ। একজন প্যান্ট-শার্ট, অন্যজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। প্রথম অজিত সিংহের ছেলে সঞ্জিত দরজার আড়ালে।

ডিআইজি জগুমামার দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, আপনার কথা আগে শুনেছি। এবার পরিচয় পেলাম। আপনি যদি পুরো বিষয়টা একটু বুঝিয়ে দেন।

সিওর।—সিগারেট ধরিয়ে মামা ধোঁয়া ছাড়লেন।

তারপর বলতে শুরু করলেন, বিজ্ঞানী রণজিৎ সিংহের মৃত্যুকে আমি কয়েকটা অংশে ভাগ করে বলছি। তা হলে বুঝতে সুবিধে হবে।

প্রথম অংশ—মৃতদেহটা কার? সুইসাইড, না মার্ডার? আমার ভাগ্নে টুকলু, আই মিন অর্ণব এই রহস্যের সমাধান করে। সে প্রমাণ করে, এটা মার্ডার। পুলিশ যাতে ভাবে সুইসাইড, সেজন্যেই ডেডবডিকে নয়ানগুড়ি থেকে রুকটুকা নদীর পাড়ে রেল ব্রিজের নীচে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, মৃতদেহটি নামগোত্রহীন করার উদ্দেশ্যে আততায়ী তার সব পরিচয় লোপাট করে দেয়। কেবল হিপ পকেটে ব্ল্যাঙ্ক কার্ড দেখে ছেড়ে দিয়েছিল। অথচ ওই কার্ডে ছিল বিজ্ঞানীর পরিচয়। আগুনে সেঁকতেই লেখাগুলো ফুটে ওঠে। এতে বোঝা যায়, মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভ্যানিশিং ইঙ্ক দিয়ে লিখেছিলেন রণজিৎ সিংহ।

তবে এ ক্ষেত্রে টুকলু একটু ভুল করেছিল। একটা কার্ডে রণজিৎবাবুর পরিচয় পেয়ে ভেবেছিল, সবক'টা কার্ডেই একই লেখা। আসলে সেটা নয়। ভ্যানিশিং ইঙ্ক দিয়ে একেকটা কার্ডে একেকটা অদ্ভুত ইকুয়েশন লেখা ছিল।

আমি পড়ে নি:সন্দেহ হলাম, বিজ্ঞানী কোনও বিশেষ গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন।

এবার দ্বিতীয় অংশ। কেন খুন হলেন রণজিৎ সিংহ? এর মূল কারণ—তাঁর গবেষণা। ওঁর ঘরের টেবিলে কাগজপত্র, আলমারি, বইপত্র দেখে এটা বুঝলাম, উনি এক অদ্ভুত রিসার্চ করছিলেন। আমার অনুমান সত্যি হল অজিত সিংহের ছেলে সঞ্জিতের কথায়। জেঠুর সঙ্গে তার সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব ছিল। জেঠু তাকে বলেছিলেন, বাতাস থেকে কাজ তিনি করছেন। জেঠু এও বলেছিলেন, তাঁর ভয় হচ্ছে। বিপদের আশঙ্কা করছেন।

সঞ্জিতের সঙ্গে কথা বলার কিছু আগে আরেকটা বস্তু পাই বিজ্ঞানীর টেবিল থেকে। তাঁর নিজের লেখা অদ্ভুত একটা ছড়া। আসলে সেটা ছড়া নয়, একটা হেঁয়ালি। উনি জানাতে চেয়েছিলেন, আসল কাগজ তিনি

এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন, যেখানে অপরাধীরা খুঁজতে যাবে না। সামনে যা আছে, সেগুলো নকল। সেসব নিয়ে খেলা করলে আগুনে পুড়ে মরতে হবে। শেষ অবধি ঘটলও তাই।

রণজিতের খুন হওয়ার আর একটা কারণ, ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য। উপর-উপর সেটা বোঝা যেত না। অকর্মণ্য ভাইকে তিনি প্রায়ই বকাঝকা করতেন। কখনও-কখনও হুমকিও দিতেন, উইল পালটে তিনি কোনও সেবা প্রতিষ্ঠানে তাঁর ভাগের সম্পত্তি দিয়ে যাবেন।

ব্যাপারটা প্রথম আন্দাজ করি এস্টেটের পুরোনো ম্যানেজার সফিউল সাহেবের কথায়। আর বাকিটা জানতে পারি রামবিলাসের সঙ্গে কথা বলে। খুনি তাকে নিজের লোক ভাবত, মাঝেমধ্যে দু-চার টাকা বকশিশ দিত। রামবিলাসকে ছেলেবেলায় কলকাতার ফুটপাত থেকে কুড়িয়ে মানুষ করেছিলেন রণজিৎ। রামবিলাম বেইমানি করেনি, কোনওদিনই খুনির লোক হয়নি।

তৃতীয় অংশ, রণজিৎ সিংহকে কীভাবে খুন করা হল? চেনা দারোয়ান দয়ারামকে দিয়ে ফটক খুলিয়ে গভীর রাতে খুনি বাড়ি ঢোকে। বিজ্ঞানীর কাচঘরে গিয়ে পিছন থেকে অ্যাটাক করে। টিপে ধরে গলা। রণজিৎ দুর্বল ছিলেন না। শুরু হয় ঝটাপটি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেন না বিজ্ঞানী। এক সময় তিনি যখন নেতিয়ে পড়েন, খুনি তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় খোলা জানলা দিয়ে।...

এর প্রমাণ রয়েছে। কার্নিস কিছুটা ভেঙে পড়েছে। ঠিক তার নীচের জমিতেও অস্পষ্ট দাগ ছিল।

নাউ দ্য লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল পার্ট, খুনি কে?

রামবিলাস এবং সফিউল সাহেবের সঙ্গে আলাদা-আলাদা কথা বলার পর যে কোনও অনুসন্ধানীর আঙুল উঠবে অজিত সিংহের দিকে। শুধু তাই নয়, রামবিলাস, পবন ও অজিতবাবুর গোপন আলোচনা শুনে ফেলে। এবং জানায়, অনন্তবাবুকে পবন তুলে নিয়ে গেছে। আমরা যাতে নিরস্ত হই, আর না এগোই। আমার পরামর্শ অনুযায়ী সে-ই আবার কৌশল করে পবনবাবুর ডেরা থেকে অনন্তবাবুকে উদ্ধার করে।

—কিন্তু—

—বলছি, তুই যেটা ভাবছিস, টুকলু, আমিও সেটাই ভাবছিলাম। অজিত সিংহ খুন করবেন কী করে? তিনি খুনের চার-পাঁচদিন আগে থেকে হিলভিউ নার্সিংহোমে ভরতি। নার্সিংহোম জানিয়েছে, পেশেন্টকে বাইরে যেতে তারা অ্যালাও করে না। তা হলে? এটাও ঘটনা, খুনি যদি বাড়ির লোক না হত, দয়ারাম কখনও রাতে মেইন গেট খুলত না। আমার ধারণা খুনের পর দয়ারামকে নিয়েই খুনি লাশ বইয়ে নিয়ে গেছিল বাইরে। দয়ারামকে তারপর মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে ছুটিতে পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত খুনি দয়ারামের

ওপর ভরসা রাখতে পারেনি। অশিক্ষিত বোকাসোকা লোক! যদি জেরায় সব ফাঁস করে দেয়? তাই দয়ারামকে মরতে হল।

এইসব যুক্তি সাজিয়ে আমি যখন হিমসিম খাচ্ছি, সেই সময় আমায় উদ্ধার করলেন এ বাড়ির সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। বুড়ি ধাই-মা। দুই ভাইকে বুকেপিঠে করে মানুষ করেছেন। তাঁকে যখন এ-কথা ও-কথার পর জিগ্যেস করি, এরা কি কেবল দুভাই? আর কেউ নেই? তখন বুড়িমা মুখ খুললেন। শোনালেন এক গোপন কাহিনি।

এদের বাবাব সর্বজিৎ সিংহ প্রায় কলকাতা যেতেন শেয়ার কেনাবেচা করতে। স্ত্রী বিয়োগের পরে সেখানেই তিনি এক বিধবা ভদ্রমহিলাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। আত্মীয়স্বজন লোকলজ্জার ভয়ে ঘটনাটি তিনি গোপন রেখেছিলেন।

একমাত্র জানত সর্বক্ষণের দেহরক্ষী সদানন্দ। ওই সদানন্দর কাছ থেকেই জানতে পারেন ধাইমা। পরে তিনি শুনলেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি ছেলেও হয়েছে। নাম রাখা হয়েছে বিজিত সিংহ। তবে মা-ছেলে কোনও দিনই এখানে আসেনি। সম্পত্তির এক কপর্দকও দাবি করেনি। সর্বজিৎ তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে গেছিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথায় একটা আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। আগের দিন নার্সিংহোমের রেজিস্টারে দেখেছি, অজিতের সঙ্গে দেখা করতে কোনও এক বি সিংহ এসেছিলেন! বিজিত সিংহ? কিন্তু তিনি তো বৃদ্ধ। কে এই বি সিংহ? ইনি চলে যাওয়ার পর অজিত সিংহের ব্যবহার পালটে গেছিল কেন?

ছুটে গেলাম কলকাতায়। বৃদ্ধার কাছ থেকে যেটুকু ডিরেকশন পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে লালবাজারকে কাজে লাগিয়ে বের করে ফেললাম এঁদের বাড়ি।

পাশে প্যান্ট-শার্ট পরা দ্বিতীয় অজিত সিংহকে দেখিয়ে মামা বললেন।

সবাই নিশ্চুপ। একটু থেমে মামা আবার বলতে থাকেন, বাড়ি ঢুকে এঁকে দেখে তো আমি থ। বৈমাত্রেয় ভাই অথচ কার্বন কপি। ঠিক যেন যমজ। তফাত শুধু চুলের স্টাইলে।

শুরু করলাম জেরা। কলকাতার পুলিশ কমিশনারও সঙ্গে ছিলেন। বিজিত যখন জানতে পারলেন, ওকে কাজে লাগিয়ে কী নৃশংস কাণ্ড করা হয়েছে, তখন ভেঙে পড়লেন। সব স্বীকার করলেন। বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। ওকে অজিত সিংহ বলেছিলেন, জরুরি একটু কাজে একটু সাহায্য করতে। উনি রাজি হয়েছিলেন।

সব শুনে চলে এলেন আমার সঙ্গে। সাক্ষী দিতে। বুঝতেই পারছেন, বিজিতবাবু খুবই অনুতপ্ত।

আসল ঘটনা হল, কিছুকাল আগে অজিত সিংহ কোনওভাবে জেনে গেছিলেন কলকাতায় তাঁর এক বৈমাত্রেয় ভাই আছে। তাকে ঠিক খুঁজে বের করেন। তারপর নিজের চেহারার সঙ্গে ভাইয়ের চেহারার অদ্ভুত মিল দেখে তখনই ঠিক করে ফেললেন, দাদাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ছক।

তারপর পবন জ্যাজোদিয়ার সঙ্গে বসে দিনক্ষণ ঠিক হল। পবনের ইন্টারেস্ট, রণজিতের রিসার্চ থেকে কোটি-কোটি টাকা কামানো। অজিতের উদ্দেশ্য, পুরো সম্পত্তি হাতানো, বিজিত সিংহকে জলপাইগুড়ি নিয়ে আসা হল। অজিত সিংহ রোগের ছুতোয় নার্সিংসহামে ভরতি হলেন। প্ল্যান অনুযায়ী বৃদ্ধ সেজে বিজিত নার্সিংহোমে ঢুকলেন। পোশাক বদল হল। বিজিত অজিত হয়ে রাত কাটালেন নার্সিংহোমে। অজিত বৃদ্ধ সেজে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে গেল।

এরপর কী ঘটে, কী ভাবে ঘটে, সেটা জেনে গেছি।

কিন্তু খুনির প্রমাণে?—ডিআইজি বললেন।

প্রমাণ?—জগুমামা হেসে বললেন,—সবচেয়ে বড় প্রমাণ বা সাক্ষী যাই বলুন, ইনি, বিজিত সিংহ। আরেকটি প্রমাণও অবশ্য আছে। রণজিতের সঙ্গে আততায়ীর ধস্তাধস্তির সময় রণজিৎ তার চুল খামচে ধরেন। একগুচ্ছ চুল পড়েছিল ঘরের জানালার সামনে। ঘরে অনুসন্ধানের সময়ে পেয়ে যাই। পরশু সকালে একটা ছুতো করে অজিত সিংহের দুটো চুল আমি ছিঁড়ে নিয়ে গেছিলাম। অজিতবাবু, মনে আছে, মাথায় নোংরা লেগেছে বলে আলগোছে আপনার চুলে টান মেরে ছিলাম? ডিএনএ রিপোর্ট জানাচ্ছে, রণজিৎ সিংহের ঘরে পড়ে থাকা চুল আর এই মাথার চুল একই লোকের।

একটানা বলে গিয়ে জগুমামা চুপ করলেন। নিস্তব্ধ ঘর। অজিত সিংহ মুখ নীচু করে বসে।

হঠাৎ কান্নার শব্দ ভেসে এল ভিতর থেকে। সুরমা দেবীও সব শুনেছেন।

মামা বললেন,—ডিআইজি সায়েব! বাকি কাজ আপনাদের। আমরা ততক্ষণে রণজিৎ সিংহের রিসার্চের আসল কাগজপত্র বের করে নিয়ে আসি।

—কোথায় আছে, আপনি...জানেন?

এ আর এমন কী!—জগুমামা হেসে বললেন,—বল তো টুকলু, কোথায় আছে? ছড়াটা মনে করো। যেথা দিয়ে গন্ধ ওড়ে, সেখানেই আছে পড়ে...কোথা দিয়ে গন্ধ ওড়ে?

—গন্ধ? গন্ধ আবার ওড়ে নাকি?

—নিশ্চয়ই ওড়ে। বাতাসে ভাসে। এটা খুব ন্যাচারাল, রিসার্চ পেপার কখনওই উনি দূরে কোথাও রাখবেন না। ঘর বা ঘরের পাশেই রাখবেন। ওঁর ঘরের অ্যাটাচড টয়লেট। টয়লেটে গন্ধ দূর করার কি ব্যবস্থা থাকে?

—বুঝেছি! হাওয়া পাইপ?

—বা: ভাগ্নে! বুদ্ধি খুলেছে! রাইট। এয়ার পাইপ দিয়েই গন্ধ ওড়ে। সেই এয়ার পাইপের মাথায় খাপেই উনি সাবধানে রেখে দিয়েছিলেন 'বুকের ধন।' ওনার গবেষণার ফসল। পাইপের পজিশনটা এমন, জানলা দিয়ে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। চল, নিয়ে আসি।...

শারদীয়া ১৯৯১

বড় পায়ের খোঁজে

১

কলিংবেল টিপলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলে গেল। পিকলু চেঁচিয়ে উঠল,— মা, ওমা! দাদা এসে গেছে।

চিঠিতে লিখেছিলাম, আমি বাড়ি আসছি। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে।

তবে আমার জন্যে যে এমন প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ' অপেক্ষা করে ছিল, ভাবতে পারিনি। ড্রইংরুমে পা দিতেই হৃদপিণ্ড তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

সামনের সোফায় বসে মুচকি-মুচকি হাসছেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি, আমার একান্ত জগুমামা।

তীব্র উল্লাস তাই ছিটকে বেরোল,—আরিব্বাস! কবে এলে?

—বোস-বোস। ওঁকে দেখেছিস?

ততক্ষণে উলটো দিকের সোফায় বসা ভদ্রলোক মেজাজি গলায় ডেকে উঠেছেন,—হ্যাল্লো টুকলু!

সরোজশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাব্বা, তারকা সমাবেশ! সুইজারল্যান্ডের সেরা সম্মানে ভূষিত প্রকৃতিবিদও এতকাল পরে।

—হ্যাল্লো। কেমন আছেন? কখন এসেছেন?

—ফাইন। কিছুক্ষণ হল এসেছি। ডক্টর মুখার্জির সঙ্গে ডিসকাস করতে। সিরিয়াস ব্যাপার। অনেকদিন ওনার সঙ্গে দেখা হয় না। যখন উনি থাকেন, আমি থাকি না। আজ লাকিলি ওনাকে পেয়েছি।

—আর বলিস না। ব্যানার্জিসাহেব একেবারে নাছোড়বান্দা। 'ইয়েতি' যে আছে, আমাকে বিশ্বাস করিয়েই ছাড়বেন।

নো-নো ডক্টর মুখার্জি, ডোন্ট টেক ইট লাইটলি,—সরোজশোভন রীতিমতো জোর দিয়ে বললেন, সায়েন্সে এখনও সো মেনি কোশ্চেনস, টিল নাও আনরিপ্লাইড। এই অধমের বনবাদাড়ে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরতে-ঘুরতে এমন সব হরিবল এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, যার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। একবার রাতে জয়ন্তী হিলসের মাথায় এক নির্জন বাংলোতে—

—আহা চোটে যাচ্ছেন কেন? বিজ্ঞান তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। আজ যেটা অলৌকিক, কাল বিজ্ঞানের আলোয় সেটা বাস্তব। তবে আপনার ওই ইয়েতির অস্তিত্ব যে পাহাড়ি আদিবাসীদের কুসংস্কার, সেটা অলরেডি প্রুভড। পাহাড়িরা বরফের উপর হিমালয়ের ভালুকের পায়ের ছাপকেই অতিমানবের পদচিহ্ন বলে ভুল করেছে। ও নিয়ে নতুন করে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না।

আমি বলছি 'হয়'।—সরোজশোভন চেঁচিয়ে বললেন, ইয়েতি-টিয়েতি জানি না, তবে মানুষের পূর্বপুরুষ এখনও রয়ে গেছে হিমালয়ের ভিতরে।

—কী করে বুঝলেন?

—প্রমাণ দেখে। এলাকার মানুষ তাকে চর্মচক্ষে দেখেছে। এমনকী কিছু ট্যুরিস্ট তার ফুট প্রিন্টের ফোটোও তুলেছে। এই দেখুন।

শার্টের বুকপকেট থেকে একগোছা রঙিন ছবি বের করে সেন্টার টেবিলে ফেললেন সরোজশোভন। কিঞ্চিৎ শ্লেষের সুরে বললেন,—দেখুন ডক্টর মুখার্জি, ভালোভাবে দেখুন। ফুটপ্রিন্ট সম্বন্ধে আমারও একটু-আধটু জ্ঞানগম্যি, নলেজ আছে। এ কোন জন্তুর পায়ের ছাপ বলতে পারেন?

মামা ছবিগুলো হাতে তুলে নিলেন। ওঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, কপালে ফুটে উঠল কয়েকটা ভাঁজ।

আমার মাতৃদেবী দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ঝংকার দিয়ে উঠলেন,—টুকলু, তোর ব্যাপারটা কী বল তো? সারাটা রাত ট্রেনে এসেছিস, মামা কি পালিয়ে যাচ্ছে? ওঠ, ওঠ চল!

অতএব গভীর অনিচ্ছাসত্বেও উঠতে হল। শোওয়ার ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে কানে এল, —মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি গাড়ি নিয়ে এসেছেন তো? একটু বেরোব।

—টুকলু, একটা বাজে। খাবি না?

মামার ডাকে উঠে বসলাম,—কখন ফিরলে?

—এই আধ ঘণ্টা হল।...আয়, খেতে বসে সব বলছি।

পিকলু ইস্কুলে গেছে, বাবা অফিসে। খাবার টেবিলে আমরা তিনজন।

মামা ধীরেসুস্থে ভাত মাখলেন, একগ্রাস মুখে তুলে তাকালেন। তারপর বললেন,—বুঝলে দিদি, আমি আর বড় ভাগ্নে থাকা মানেই 'ভয়ংকর যোগ'!

—মানে?

মানে আর কি! কোনও জব্বর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া। কোথাও না কোথাও ছোটা।

—বুঝেছি। তোমার মতলব হচ্ছে—শোন জগু...

—আহা, না শুনেই উত্তেজিত হচ্ছ কেন? ইচ্ছে করে কি কেউ ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নেয়! পুরোটা আগে শোনো।

মামা বললেন,—সকালে সরোজশোভনকে নিয়ে সোজা গেলাম বিনোদের কাছে। বিনোদ কাক্কার। জ্যুওলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর। পায়ের ছাপের ফোটোগুলো দেখে বিনোদও রীতিমতো অবাক। বইপত্তর ঘাঁটাঘাটি করে সে কী বলল জানো? বলল, এই পায়ের ছাপ একমাত্র হোমো সেপিয়ানস-এর পূর্বপুরুষের হওয়া সম্ভব।

—হোমো সেপিয়ানস! সে আবার কোন জন্তু?

—এই পৃথিবীর এক এবং অদ্বিতীয় দ্বিপদ জন্তু!—মামা মুখ টিপে হাসলেন, আমরা সব্বাই ওই জাতের।

ধ্যুৎ!—মা লজ্জা পেয়ে বললেন, তারপর?

—তারপর নিরুপায় হয়ে সরোজশোভনকে বললাম, বাগডোগরা ফ্লাইটের টিকিট কাটতে। ফুটপ্রিন্ট পাওয়া গেছে সিকিমের জনমানবহীন এলাকায়। রাবাংলা থেকে আরও এগিয়ে মৈনান পাহাড়ের জঙ্গলে।

—বলিস কী! তোরা সেখানে যাচ্ছিস নাকি? সবে ছেলেটা এল, তুই যে বলেছিলি...

—কী করি বলো! আমাকে যেতেই হবে। এরকম রহস্যের শেষ না দেখে ছাড়া যায় না। তবে টুকলু যদি না যেতে চায়, যাবে না।

—কী আবোলতাবোল বকছ! মামা যাবে, ভাগ্নে যাবে না, এ কখনও হতে পারে! আমরা কবে স্টার্ট করছি?

—পরশু সকালে! এখন একবার দিল্লিতে পট্টনায়েককে ধরতে হবে। পাশেই চিন বর্ডার। ওখানে যেতে হলে স্পেশাল পারমিট লাগতে পারে।

২

ফ্লাইট ঘণ্টাখানেক লেট ছিল। লাউঞ্জে এসে সরোজশোভন হতাশভাবে বললেন,—না:, নেই। মনে হয় দেরি দেখে, ফিরে গেছে। চলুন, এগোনো যাক।

এয়ার পোর্টের বাইরে পা রেখেছি, ঠিক তখনই বাঁ-দিক থেকে একটা উচ্ছ্বাসধ্বনি ভেসে এল,—এসো, এসো, এদিকে।

সরোজশোভন ঘুরলেন, সঙ্গে আমরাও। 'কার পাকিং প্লেস' থেকে দ্রুত হেঁটে আসা একজন ভদ্রলোককে দেখা গেল।

গোলগাল ছোটখাটো চেহারা, মাথায় চকচকে টাক, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। গোঁফ-দাড়ি কামানো, গায়ে ট্যুইডের জ্যাকেট। গালভরা হাসি।

সরোজ শোভন বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, আমার বাল্যবন্ধু অনিমেষ মণ্ডল। দার্জিলিং গভর্মেন্ট কলেজে জ্যুওলজি পড়ার। ও আমায় মিস্টিরিয়াস ফুটপ্রিন্টের ফোটোগুলো পাঠিয়েছিল।

মামা দু-হাত জড়ো করলেন,—নমস্কার।

নমস্কার, নমস্কার।—অনিমেষ মণ্ডল বিগলিত, আপনার মতো ওর্য়াল্ড ফেমাস পার্সেনালিটির সঙ্গে কোনওদিন আলাপ হবে, বুঝলেন কিনা...হেঁ...হেঁ...

—এখন আমরা?

—এখান থেকে সোজা প্রাইভেট কারে রাবাংলা। তার পরেই বুঝলেন কিনা, পাহাড় আর বন। সেখানে, বুঝলেন কিনা—

—বুঝেছি—মামা গম্ভীরভাবে বললেন।

এ যে দেখছি অনন্ত সরখেলের 'বুঝলেন কিনা' সংস্করণ!

সাদা মারুতি ভ্যানে লাগেজ চাপানো হল। গাড়ি স্টার্ট দিল। অনিমেষ বাবু সামনে, পিছনে আমরা তিনজন।

মামা বললেন,—মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার নামটা বড্ড লম্বা। যদি অনিমেষ বাবুর ওই শটকার্ট নামে ডাকি, আপনার আপত্তি নেই তো?

—ও নোও।...অনি, ডক্টর মুখার্জিকে পুরো কেস ব্রিফ কর।

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে মারুতি ছুটে চলেছে। দুদিকে এখনও সমতল ভূমি। বেশ রোদ উঠে গেছে। তবুও ধু-ধু মাঠের মাঝে-মাঝে কুয়াশা দলা পাকিয়ে আছে।

অনিমেষ বললেন,—ট্রেকিং-এ যাওয়া, বুঝলেন কিনা, ইয়ং এজ থেকে আমার একটা নেশায় বাড়িতে বলে বলেও ছাড়াতে পারেনি। বুঝলেন কিনা, হিমালয়ের স্বাদ যে একবার পেয়েছে—

—বুঝেছি। একটু সংক্ষেপে বলুন। টু বি প্রিসাইজ।

—হেঁ...হেঁ, বটেই তো। মানে...বুঝলেন কিনা, এবার সেই ট্রেকিং—আমরা গেছিলুম রাবাংলা থেকে মৈনান পাহাড়ের দিকে।...বুঝলেন কিনা, সে একেবারে 'ফ্যানাটিক' প্লেস।

—ফ্যানাটিক?

—সরি...সরি...ফ্যান্টাস্টিক। সেখানে গিয়ে শুনলুম, আর কিছুটা এগোলে 'দেওরালি' বলে একটা জায়গা পড়ে। নেপালি ভাষায় দেওরালি মানে দেবতার স্থান। দেওরালির পরেই মৈনান পর্বতের গভীর জঙ্গল, পায়ে হাঁটার পথ নেই। এদিকে দলের সকলে আড় হয়ে পড়ল, ওখানেই যাবে।

—ওখানে মানে?

—ওখানে মানে ওই জঙ্গলে। জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ে উঠবে। বেশ একটা এক্সপিডিশনও হবে। সবাই মিলে রওনা হলুম। ও: বুঝলেন কিনা, সে কী কষ্ট! ঘন জঙ্গল, তার উপর খাড়াই ওঠা। মৈনানের আদ্ধেক উঠতেই প্রায় সারাটা দিন লেগে গেল। বুঝলেন কিনা, সন্ধে হতে আমরা হল্ট করে টেন্ট পেতে ফেললুম। ঠিক হল, পরদিন মাথায় উঠব।

সরোজশোভন বললেন,—ওই জঙ্গলের মধ্যে টেন্ট পাতার জায়গা পেলি?

—ফাঁকা ছিল। তার মধ্যেই বুঝলি কিনা...সিনিক বিউটি ভাবা যায় না। কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ একেবারে হাতের মুঠোয়। আহা, ঠিক যেন সেই 'জ্ঞানগম্ভীর এই যে পাহাড়...।'

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর'।—মামা বললেন, যাকগে, বলুন, বলে যান।

তার পরেই তো ঘটল ভয়ানক ব্যাপারটা।—অনিমেষ গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন, ঝটপট নাকেমুখে গুঁজে ঢুকে পড়লুম সবাই স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে। বুঝলেন কিনা, ঢুকতেই একদম মড়া। সারাটা দিন যা ধকল গেছে! হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ভীষণ একটা আওয়াজে!...

অনিমেষ থামলেন। মারুতি এখন বাঘপুল পেরুচ্ছে। তুলনাহীন নিসর্গ। নীচে ফেনিল তিস্তা, গাঢ় সবুজ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বাঁক খাওয়া রাস্তা, যেদিকে তাকাও শুধুও হিমালয়। রোদ লুকোচুরি খেলছে পাহাড়ের গায়ে, কোথাও আলো কোথাও ছায়া।

অনিমেষবাবু শুরু করলেন,—আমাদের তাঁবুর বাইরে ধপ-ধপ-ধপ-ধপ! কাদের ভারী পায়ের শব্দ। তাঁবুর পাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। বুঝলেন কিনা, ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া। এ অঞ্চলে 'হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার' থাকে বলে শুনিনি। এরা তবে কারা? কান খাড়া করে রয়েছি, আর টর্চ বাগিয়ে ধরেছি। কোনও অপদেবতা নাকি?...বুঝলেন কিনা, আমাদের দলের নীলকণ্ঠের আবার বেশি সাহস। ও আস্তে-আস্তে তাঁবুর বাইরের দিকে এল। হামাগুড়ি দিয়ে। তারপর...

—তারপর?

—তারপর তাঁবুর পরদাটা সরিয়ে একবার মুখ বাড়িয়েই—ব্যস! সঙ্গে-সঙ্গে এলিয়ে পড়ল। স্ট্রেট ননসেন্স!

—ননসেন্স?

—সরি! সেন্সলেস। বুঝলেন কিনা, আর দেখার সাহস পাইনি। দম আটকে পড়ে ছিলুম। পরে আওয়াজগুলো আস্তে-আস্তে সরে গেল। তখন নীলকণ্ঠর চোখেমুখে, বুঝলেন কিনা, জল ছিটোলুম। জ্ঞান ফিরে কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, তারপর চোখ বুজল, এরপর যা থাকে কপালে ভেবে আমরাও ঘুমিয়ে পড়লুম।

—পরদিন সকালে?

—পরদিন আর কী, একদম তাঁবুটাবু উঠিয়ে নীচে পালিয়ে এলুম। নীলকণ্ঠ যা বলল, বুঝলেন কিনা, সে অবিশ্বাস্য! ও নাকি জোছনার আলোয় পষ্ট দেখেছে দু-দুটো ভয়ানক চেহারার লোমশ আদিম মানুষ দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। একজনের হাতে পাথরের একটা চাঁই, অন্যজনের হাতে আস্ত একটা ওক গাছের গুঁড়ি। তাঁবুর বাইরে তাদের পায়ের ছাপ পষ্ট দেখলুম। ছবিও তুলে নিলুম। এসএস তো আপনাকে দেখিয়েছে। গোদা-গোদা, বীভৎস।

—আশ্চর্য! নীলকণ্ঠবাবু দেখেছেন শুনেও আপনারা সব গুটিয়ে পালিয়ে এলেন? রহস্যটা কী, জানার চেষ্টা করলেন না?

মা-থা খারাপ!—অনিমেষের চোখ কপালে উঠেছে। বললেন, ওই কাণ্ডের পর আর এগোব? আমার নিজের মশাই, বুঝলেন কিনা, অপদেবতায় বেশ অ্যালার্জি আছে। কোনও রিস্ক নিই না। গত পুজোয়, আমাদের কলকাতার বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড।

—সেখানে আবার কী হয়েছিল?

অনিমেষ বললেন,—অষ্টমীর দিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ছেলে বায়না ধরল ছাতে যাব। বুঝলেন কিনা, ছেলের আবদারে যেতে হল। বাপ-বেটায় দুজনে মিলে বেশ ঘুরছি ছাদে। হঠাৎ ছেলে বলে উঠল, বাপি, ওই দ্যাখো! ওটা কী? ব্যস, সেদিকে তাকাতেই আমি, বুঝলেন কিনা, ফিনিশ! থান কাপড় পরা এক মহিলা ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে তার আঁচল উড়ছে। ত-তখন...ওফ কাকে যে সামলাই! নিজেকে না ছেলেকে? হাত-পা ঠকঠক। ওই অবস্থায় ছেলেকে পাঁজা কোলা করে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে লাফ মারলুম। তার পরেই বিছানায়।

—সে কী!!

—হ্যাঁ। গিন্নি যত বলে কী হয়েছে, আমার মুখ দিয়ে 'ভূ-ভূ-ভূ' ছাড়া কিছুই বেরোয় না। বিচ্ছিরি কাণ্ড।

—সত্যিই ভূত নাকি রে? পরে ব্যাপারটা দেখতে আর কেউ ছাদে ওঠেনি?

—ওঠেনি আবার! যাচ্ছেতাই ব্যাপার! বুঝলি কিনা, ছাদের কোণে একটা মই দাঁড় করানো ছিল। মায়ের থান কাপড়টা দড়ি থেকে বাতাসে উড়ে গিয়ে সেটার গায়ে লেপটে গিয়েছিল আর তাতেই—।

—হা: হা: হা:। তুই তো রামভিতু রে! কী বলেন মুখার্জি সায়েব?

কী আর বলব, বলুন! এরকম ভয়ংকর সাহস নিয়ে উনি যে পাহাড়ে ট্রেকিং করতে যান, এটা গিনেস বুক-এ ছেপে দেওয়া উচিত।

৩

নীলকণ্ঠ চমৎকার লোক। দেখতে-শুনতে স্মার্ট, তেমনই ফূর্তিবাজ। বয়স চল্লিশের আশে পাশে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে চব্বিশ-পঁচিশ চালিয়ে দেওয়া যায়।

রাবাংলায় পৌঁছোবার আগে আমরা জানতাম না, নীলকণ্ঠ ঘোষ এই পাহাড়ি জনবসতির একমাত্র স্টেট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

কোয়ার্টারটাও দারুণ। একটা টিলার মাথায়। চর্তুদিক কাচ দিয়ে ঢাকা বাংলো। সেখানেই সদলবলে এসে উঠেছি।

এখন সন্ধে সাতটা। এর মধ্যেই রাবাংলা নিঝুম। ড্রইংরুমে ফায়ারপ্লেস জ্বলছে। তাতেও হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। পেঁজা তুলোর মতো বরফ-বৃষ্টি হচ্ছে সেই বিকেল থেকে।

স্টিরিয়ো-তে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে। আমরা কম্বল-মুড়ি দিয়ে বসে আছি। জগুমামা একমনে একটা ইংরেজি থ্রিলার বই পড়ে যাচ্ছেন।

বই বন্ধ করে জগুমামা বললেন,—মিস্টার ঘোষ, আপনিই তো সেদিন প্রাণীদুটোকে দেখে ছিলেন?

—হ্যাঁ, ফুটফুটে জোছনা ছিল, পষ্ট দেখেছি।

—ঠিক কেমন দেখতে?

—একেবারে বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে। আদিম গুহামানবের যেমন ছবি আমরা দেখি, অবিকল তেমন। গোটা শরীর লোমে ভরতি, চোয়ালের হনু সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কুতকুতে গর্তে ঢোকা চোখ।

—মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ করছিল না?

কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন নীলকণ্ঠ। তারপর মাথা নাড়লেন,—উহুঁ। মাঝে-মাঝে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল।

—হাঁটছিল কি দুপায়েই?

—হ্যাঁ। তবে সামনের দিকে একটু কুঁজো হয়ে।

হঠাৎ কাচের দরজার ওপারে দুজন মানুষের চেহারা ভেসে উঠল। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বললেন,—আরে, আসুন, আসুন। কী ব্যাপার, এই অসময়ে? এনি প্রবলেম?

নেহি, নেহি। কুচ্ছু না।—আগন্তুক দুজন ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটল। একজন বললেন, শুনলম, কলকাত্তাসে হাপনার মেহমানরা আসিয়েছেন, তাই গপ করতে চালিয়ে এলম। আপনাদের ডিসটার্ব হইবে না তো?

কী যে বলেন! বসুন।—নীলকণ্ঠ বললেন, ডক্টর মুখার্জি, আমার এই দুই লোকাল ফ্রেন্ড। এরা রাবাংলার কিং বিজনেস ম্যাগনেট। এঁদের ব্যাবসা জড়িবুটি অর্থাৎ মেডিসিনাল হার্বস-এর। ইনি বীরেন্দ্র গুরুং, ইনি সুবোধ ভাণ্ডারি।

আলাপ-পরিচয় পর্ব শেষ হল। সুবোধ ভাণ্ডারি লম্বা গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট বাড়িয়ে বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, প্লিজ।

থ্যাঙ্কিউ।—মামা সিগারেট তুলে নিয়ে বললেন, সিএম আপনার কীরকম রিলেটিভ?

মুহূর্তে সুবোধের চোখ বড় হয়ে উঠল,—তাজ্জব! হাপনি জানলেন কী করে?

—জানব কেন? পদবি আর মুখের গড়ন দেখে আন্দাজে ঢিল ছুড়েছি।

—লেকিন সহি বোলিয়েছেন। মুখিয়ামন্ত্রীজি হামার ডিসট্যান্ট রিলেটিভ। দাদা লাগে।

ডক্টর মুখার্জি, ওটাই ভাণ্ডারি সাহেবের মেন ক্যাপিটাল।—নীলকণ্ঠ হেসে বললেন, দুইবন্ধু, মিলে চুটিয়ে ব্যাবসা করছেন। তাতে অবশ্য আমার ব্যাঙ্কও বেনিফিটেড হচ্ছে। রাবাংলায় আর আছেটা কী?

—কী ধরনের গুডস এখান থেকে পাঠান?

—বহোত কিসিমকা। সোবই মেডিসিন্যাল। পাহাড়ের নাইন্টি পার্সেন্ট হার্বসের মেডিসিন কনটেন্ট হাই। তবে বাল্ক কোয়ান্টিটিতে যাচ্ছে শিলাজুত! চিনেন?

—শিলাজুত! না:—! সেটা কী?

চলতি ইংরেজিতে আমরা বলি ব্ল্যাক স্টোন।—বীরেন্দ্র একক্ষণ বাদে বললেন, আসলে ওগুলো ন্যাচারাল প্রসেসেই তৈয়ারি হয়। মেনলি হিউমাস। পাহাড়ের শ্যাওলা, পাতা-উতা পচে গেলে মিট্টি-পাথুরের সাথ মিশে ধূপ খেয়ে ওয়স্যা শেপ নেয়।

—তারও মেডিসিন্যাল ভ্যালু আছে?

সিওর।—বীরেন্দ্র বললেন, এইট্টি পার্সেন্ট হার্বাল ড্রাগ কোম্পানি জাদা কোয়ান্টিটি শিলাজুত নয়। ফিজিক্যাল পাওয়ার বাড়াতে ইয়ে চিজকা বহোৎ জরুরত হ্যায়। প্রস্টেটগ্ল্যান্ডের বিমারির দাওয়াইতেও শিলাজুত লাগে।

নীলকণ্ঠ বললেন,—একটা কথা ডক্টর মুখার্জি, বীরেন্দ্রবাবু একেবারে আটঘাট বেঁধে তবে ব্যাবসায় নেমেছেন। বোটানিতে এমএসসি পাশ।

—আ:! ঘোষ সায়েবকে লিয়ে আর পারা গেল না! হামাদের কথা থাক। আপনাদের কথা বোলেন। আপনারা কি সাচমুচ যাইছেন ট্রেকিং করতে?

মামা গম্ভীর হয়ে গেলেন। কোনও জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন বীরেন্দ্রর দিকে।

বীরেন্দ্র আবার বললেন,—ঘোষ সায়েবের কাছে সোবি শুনেছি। অ্যাজ অ্যান ওয়েল উইশার বলছি, উখানে না যাওয়াই ভালো।

—কেন বলুন তো?

জায়গা তো আচ্ছা নেহি। সুবোধ বললেন, ফার্স্ট প্রবলেম, যানে সে বহোৎ পরেশানি হবে। আওর পাহাড়িরা বলে দেওতার থান, ইনসানের যাওয়া মানা। ওই সব সান্নাটা পাহাড়ে-জঙ্গলে কত কী ঘুমিয়ে থাকতে পারে, হামরা কি জানে? কী দরকার উসব ঘাঁটিয়ে। তার চেয়ে এই রাবাংলার চারদিক ঘুরেন-ফিরেন, দেখেন, ক'টা দিন ফূর্তিসে কাটান।

—সরি মিস্টার ভাণ্ডারি। আপনারা বোধহয় আমার নেচার ঠিক বুঝতে পারেননি। বিজ্ঞানের গবষেণা নিয়ে থাকলেও আমার নেশা হল, যেখানে রহস্য দেখা দেয়, সেখানে পৌঁছে যাই।

সরোজ শোভন বললেন,—মিস্টার ভাণ্ডারি, আপনারা জানেন না, অনেক মিস্ট্রি সলভ করেছেন ডক্টর মুখার্জি। একটা রহস্য সলভ করতে আমিও সঙ্গে ছিলাম।

দেন ইটস অলরাইট।—দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। গুরুং বললেন,—কবে আপনারা যাইছেন?

—ইচ্ছে আছে কাল। দেখি, নীলকণ্ঠবাবু ওনার ব্যাঙ্কে ছুটির ব্যবস্থা যদি করে ফেলতে পারেন।

—ওকে। গুডনাইট।

দুজনকে এগিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে নীলকণ্ঠ ফিরতে মামা বললেন,—এদের সঙ্গে আপনার কদ্দিনের পরিচয়?

—বছর দেড়েক, যদ্দিন এখানে এসেছি। তবে আপনি যা সন্দেহ করছেন, সেটা নয়। ট্রেকিং-এর বিপদের কথা ভেবে ওরা আমাদের থামাতে চেয়েছিল। মনে হয় অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।

—বুঝলাম। মিস্টার ঘোষ, দেওরালি অবধি বোধহয় মিলিটারি জিপ যায়।

—তা যায়। তবে পাওয়া যাবে কি?

—দেখা যাক। পট্টনায়েক নিশ্চয়ই মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

৪

অনিমেষ মণ্ডল বললেন,—বুঝলেন কিনা, ওই যে বরফের উপর দিয়ে চাকার দাগ, ওটাই রাস্তা, মিলিটারি জিপ চলে। হয় হেঁটে, নতুবা জিপে চেপে, বুঝলেন কিনা আমাদের—

—আমাদের যেতে হবে, মৈনানের দিকে। অনিমেষবাবু, এখানে মিলিটারি ক্যাম্প কোথায় জানেন?

না।—অনিমেষ বললেন, নীলকণ্ঠ বলতে পারবে। ওই যে ওর ব্যাঙ্ক, চলুন। জিগ্যেস করি।

আমরা চারজন ব্যাঙ্কের দিকে এগোলাম।

ঘুম থেকে উঠে নীলকণ্ঠবাবুকে আর দেখতে পাইনি। সামনের ক'দিন থাকতে পারবেন না, তাই সাতসকালেই ছুটেছেন ব্যাঙ্কে।

শুধুই বরফ। সাদা লেপ জড়ানো শহরের গায়ে। রোদ্দুর পড়ে ঝলসে উঠছে। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। পাহাড়ি মানুষজন টুকটাক চলাচল শুরু করেছে।

—ডক্টর মুখার্জি। ও ডক্টর মুখার্জি?

সুবোধ ভাণ্ডারি। বললেন,—গুড মর্নিং। কোথায় চলিয়েছেন?

—এই একটু কাজে বেরিয়েছি। আপনি?

—হামি অফিসে যাচ্ছে। ঘোষসায়েবের ব্যাঙ্কের একদম পাশমে। চোলেন না, বসে থোড়া গপ করা যাবে।

থ্যাঙ্কিউ মিস্টার ভাণ্ডারি। পরে যাচ্ছি। আগে কাজগুলো সেরে নিই। এখানকার মিলিটারি ক্যাম্প কোথায় জানেন?

সি-ও-র!—সুবোধ প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন, নিজেও একটা বের করে অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ওই যা দিখছেন লাইন ধরে পাইন ট্রি, ওর ঠিক ব্যাকসাইডে। ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড, উখানে হাপনার কওনসা দোরকার?

—দরকার অনেকরকম। একটা মেসেজ পাঠাতে হবে। এক কাজ করি। আমি আর টুকলু মিলিটারি ক্যাম্পের কাজ সেরে আপনার কাছে আসছি। ততক্ষণ ভাণ্ডারি সায়েবের অফিসে আপনারা গল্প করুন।

অনেকটা চড়াই ভাঙার পর সাদা-সাদা তাঁবুগুলো পাইনের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা।

ফটকের সামনে শক্ত মুখ দুজন প্রহরী। হাতে কার্বাইন।

মামা সামনে গিয়ে বললেন,—হম অফিসার সাবসে মিলনা চাহতে হ্যায়?

মামা নি:শব্দে ওঁর নেম কার্ড এগিয়ে দিলেন। একজন সেটা নিয়ে দ্রুত সামনের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল।

আধমিনিটের মধ্যেই সে বেরিয়ে এল। ইশারায় আহ্বান জানাল আমাদের। ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

এখন সাড়ে দশটা। মামা কবজির দিকে তাকালেন,—চল, সুবোধ ভাণ্ডারির অফিসে ঢুঁ মেরে যাই। অনিমেষ আর সরোজশোভন ওখানেই আছে।

—চলো। পরে তো আর সময়ও হবে না।

কাল সকালে আমাদের বেরিয়ে পড়ার বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। জিপে করে যাচ্ছি। মামার পরিচয় পেয়ে যথেষ্ট খাতির করেছেন অফিসার-অন-ডিউটি মেজর এস. পি. সিং। মামা হটলাইনে ফোন করেছিলেন সিবিআই-এর ডিজি সত্যসাধন পট্টনায়েককে। পট্টনায়েক আঙ্কেল মেজরকে আরও বিস্তারিত মামার সম্বন্ধে বলে দেওয়ার ফলে আপ্যায়ন একটু বেশিই হয়েছে। পট্টনায়েক নিজেও খুব উৎসুক। হয়তো এসেও পড়তে পারেন।

সুবোধ ভাণ্ডারি অফিসের ফাইলপত্রে মগ্ন ছিলেন। মুখ তুলে একগাল হাসলেন,—আইয়ে-আইয়ে। কামকাজ হল?

—মোটামুটি। ওরা কই?

হাফ অ্যান আওয়ার হল চোলিয়ে গেলেন। শ্যামলাল, তিন কাপ কফি তৈয়ার করো।

—কোথায় গেলেন? কোয়ার্টারে?

না, বাজারে গেছেন। ইখানকার বাজারে টিবেটিয়ানরা আগে সোনা বেচত। সফট পিওর গোল্ড, ড্যাম চিপ। আমিই গপ করতে-করতে উনাদের বাতালাম। শুনেই দোনোই একসাইটেড।

তাই নাকি?—মামা বললেন, সোনার টান বড় সাংঘাতিক। কিন্তু এসব সোনা ইল্লিগাল, তাই না?

—ধুর মশয়, হাপনি স্রিফ আইন দেখেন। টিবেটিয়ানরা বহোত পুওর। টিবেটে অনেক কুচা কাচা গোল্ড মাইন আছে, চায়না গরমেন্টও জানে না। ওরা নিজেরাই খনি থেকে উঠায়ে ধুয়ে আনে। কাপড়ার অন্দরে ছুপিয়ে।

—বলেন কী? এই পাহাড়-পর্বত, চায়না বর্ডার পেরিয়ে।

—হাঁ জি। ভুখ বড় বেশরম, লিগাল—ইল্লিগাল কুছ মানে না। টিবেটিয়ানদের সব বেওস্থা আছে। সোনা বেচে তাই দিয়ে চাওল সবজি খরিদকে লিয়ে যায়।

আমরা দুজনেই চুপ করে গেলাম।

একটু পরে মামা বললেন,—যাকগে।...মিস্টার ভাণ্ডারি, কাল রাতে আপনি শিলাজুতের কথা বলেছিলেন, মনে আছে?

—কেন থাকবে না? চলতি, কথায় ব্ল্যাক স্টোন। পাহাড়ের মিট্টি আর শ্যাওলা জমকে নেচারই বনায়!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যাম্পল আছে?

জরুর।—সুবোধ ভাণ্ডারি টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা পলিপ্যাক বার করে এগিয়ে দিলেন। প্যাকেটে কালো কালো ছোট-বড় পাথরের টুকরো।

মামা কয়েকটি টুকরোকে টেবিলে ঢেলে নেড়ে-চেড়ে দেখতে থাকেন গভীর মনোযোগ দিয়ে।

—কী ভাবতেছেন ডক্টর মুখার্জি?

—আশ্চর্য জিনিস। অবিকল পাথরের টুকরো। দু-এক পিস নিতে পারি?

—জরুর। লিন না। হাপনারা হইলেন সায়েন্টিস্ট, ক্রিম অব দ্য সোসাইটি। দেখেন, রিসার্চে ইসিসে আওর কুছ বন সকতা হ্যায় কেয়া।

মামা একটা প্যাকেটে দু-তিনটে টুকরো ভরলেন। কফিতে চুমুক দিলেন। তারপর হুট করে বললেন,—মিস্টার, ভাণ্ডারি, আপনার কি সত্যি-সত্যি মনে হয়, প্রিমিটিড ম্যান এখনও থাকতে পারে?

সুবোধ একটু থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন,—হাপনি কি ঘোষ সায়েবদের এক্সপিডিশনের কথা বলছেন? উনাদের আপনা আঁখ তো বিট্রে করেনি। এই মাউন্টেন বহোত মিস্টিরিয়াস, ইখানের ফরেস্ট-হিলসে কী যে আছে, হামরা কুছু জানে না। হাপনারা কব বেরোচ্ছেন?

—কাল মর্নিং-এ।

—ট্রেকিং করবেন।

—মৈনান অবধি মিলিটারি জিপে। ওখান থেকে তো হাঁটব।...মিস্টার গুরুংকে দেখছি না।

—বীরেন্দর মাল কালেকশনে বেরিয়েছে। হামাদের এই লোকালিটির চারতরফে ছোটা-ছোটা কালেকশন পকেট আছে। লোকাল লেপচারা অর্ডার মাফিক জড়িবুটি কালেক্ট করে রাখে। বীরেন্দ্র টেস্ট করে। তারপর পারচেজ করে। হররোজ সকালে বের হয়, সামতক ওয়াপস আসে।

এই সময় দেখি, সরোজশোভন চড়াই বেয়ে হন্তদন্ত হয়ে উঠে আসছেন।

এগিয়ে গেলাম,—কী ব্যাপার?

—অনিমেষ আসেনি?

—নাহ। আপনার সঙ্গেই ছিলেন তো!

আর বলবেন না!—সরোজশোভন ধপ করে বসে পড়লেন। বললেন, ছিল তো সঙ্গেই। বাজারে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখছিলুম। একজায়গায় উবু হয়ে আমি সোনা দরদাম করছিলুম। হঠাৎ দেখি, ও নেই।

—তখন?

—আমি ওকে খোঁজা শুরু করলুম। ছোট বাজার। কিন্তু যাকেই বলি, কেউ কিছু বলতে পারে না। আমি তখন বাজার ছাড়িয়ে আদিবাসী গাঁয়ের দিকে বেশ কিছুটা গেলাম। সেখানেও জিগ্যেস করলাম। কেউ বলতে পারল না।

—সে কী?

—হ্যাঁ। তাই ভাবলাম, যদি এখানে এসে থাকে।

—মামা, তা হলে আমাদের যাওয়ার কি হবে?

জগুমামা ভ্রু কুঁচকে বললেন,—এখনই অত ভাবছিস কেন? গোটা দিন পড়ে আছে। একটা জলজ্যান্ত মানুষ উবে যেতে পারে না।...

৫

লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘরের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হাঁটছেন সরোজশোভন আর থেকে-থেকে বলে উঠছেন,—সারপ্রাইজিং!...ইমপসিবল!...আনথিঙ্কেবল!

মামা পরপর সিগারেটে টান দিয়ে যাচ্ছেন। কপালে তিন-চারটে ভাঁজ। নীলকণ্ঠ ঘোষ নিজের মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছেন।

অনিমেষ মণ্ডলের আকস্মিক অন্তর্ধানে আমরা বিমূঢ়।

এখন রাত ন'টা। অনিমেষ ফিরে আসেননি।

অথচ তাঁকে কম খোঁজা হয়নি। নিজেরা তল্লাশি তো করেছিই। দুপুর পেরোবার পর মামা নিজে আর্মিক্যাম্পে গিয়ে তাঁদের সাহায্য নিয়েছেন।

ছোট্ট জনপদ রাবাংলা। লোক সংখ্যা বেশ কম। জলজ্যান্ত লোকটা হারিয়ে যাবেন কোথায়?

আমরা কি কোনও শত্রু সৃষ্টি করে ফেললাম? কেন জানি না, সুবোধ ভাণ্ডারির মুখ ভেসে উঠল।

এই ভাবাটা কিন্তু অন্যায়। সুবোধ নিজে সারাদিন আমাদের সঙ্গে ঘুরেছেন, সন্ধের পর আবার এসেছিলেন। মামা অবশ্য একই কথা সকাল থেকে সবাইকে শুনিয়ে চলেছেন, কাল আমরা রওনা হচ্ছিই। তবে সত্যি-সত্যিই যাওয়া কি হবে?

আমার মনের কথা নীলকণ্ঠবাবু বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, কী ডিসিশন নিলেন? এই সিচুয়েশনে আমরা কি যাচ্ছি?

সঙ্গে-সঙ্গে সরোজশোভন বললেন,—নো নেভার! আই অ্যাম দা লাস্ট পারসন টু জয়েন দ্যা ট্রেকিং উইদাউট মাই ফ্রেন্ড।

আমার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে গেল,—অনিমেষবাবু ঠিকঠাক আছেন তো? মানে পাহাড়ে-টাহাড়ে কোনও—

ওহ নো:!—সরোজশোভন চেঁচিয়ে উঠলেন, স্টপ ইট! প্লিজ!

মুহূর্তে নৈ:শব্দ্য নেমে এসেছে। জগুমামা থমথমে মুখে একবার তাকালেন সরোজ শোভনের দিকে। তারপর সিগারেটের শেষটুকু গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রেতে।

আমি জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আকাশে হিরের মতো জ্বলছে চাঁদ। তরল জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে রাবাংলা। দিগন্তের গায়ে আবছা ঢেউ। অপার্থিব, অপরূপ রাত।

সংবিত ফিরল মামার ডাকে,—টুকলু চল। খেয়ে-শুয়ে পড়তে হবে। কাল সকালে গোছগাছ আছে।

আর ঠিক তখনই আমার নজরে পড়ল, অনেক নীচে সাদা বরফের মাঝে কালো একটা বিন্দু। এগিয়ে আসছে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম,—মামা! মামা!

আধমিনিটের মধ্যে বিন্দু মানুষের অবয়ব নিয়ে নিল। এই রাতে জনশূন্য পাহাড়ি পথ বেয়ে আসছে কে?

একটু বাদেই স্পষ্ট হল, আগন্তুক পাহাড়ি ছেলে। এদিকেই আসছে জোরে-জোরে পা ফেলে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে উর্ধ্বশ্বাসে উঠে এল। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছি।

হাড়হিম শীতেও ছেলেটা ঘামে ভিজে গেছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—সাব, বঙ্গালিবাবু। নীচে রাস্তামে পড়া হুয়া থা। উঠনে কা তাকত নেহি। উনে কোই মার ভালা। শিরসে খুন নিকলছে।

অনি—? বেঁচে আছে?—সরোজশোভন আর্তনাদ করে উঠলেন।

—হাঁ সাব। উও স্রিফ বোল রাহা 'বেঙ্ক-বেঙ্ক।'

৬

ভয়ংঙ্কর শীত, বরফ ঢাকা পিছল পথ, সব ভুলে গেছিলাম। উর্ধ্বশ্বাসে অনেকটা নেমে লেপচা বস্তিতে যখন এসে পৌঁছোলাম, তখন ওই ছেলেটার মতোই ঘামে ভিজে গেছি।

অনিমেষ মণ্ডল। একটা দড়ির খাটিয়ার ওপর শোয়ানো। চোখ বোজা। ঘাড়ের কাছে মোটা করে কাপড়ের পট্টি বাঁধা। এরাই প্রাথমিক শুশ্রুষা করেছে। রক্তে লাল পোশাক। মাঝে-মাঝে ঘাড় ঘোরাবার চেষ্টা করছেন, আর অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠছেন।

ঘরের মধ্যে অনেক মানুষের ভিড়। বস্তির বাসিন্দা। তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি এবার নিবদ্ধ হল আমাদের দিকে।

সরোজশোভন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মামা বললেন,—না। আমি না বলা অবধি কোনও কথা নয়।...একটু গরম দুধ পাওয়া যাবে?

কয়েকজন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মামা বললেন,—এসএস আপনি বন্ধুর কাছে থাকুন। দুধ আনলে ব্র্যান্ডি দিয়ে খাইয়ে দেবেন। ওকে একদম কথা বলাবেন না। আমরা স্পট থেকে একটু ঘুরে আসি।...আপনারা কেউ একটু চলুন, জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন।

জায়গাটা আরও নীচে। বস্তিগুলোর থেকে একটু দূরে।

জগুমামার বিশাল টর্চ জ্বলে উঠল। আলোর বৃত্তে স্পষ্ট দেখা গেল, বরফের ওপর ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের দাগ। মামা আরও কয়েক পা নীচে নেমে গেলেন। বরফের উপর এলোমেলো অস্পষ্ট পায়ের ছাপ।

বাঁ-দিকে পাহাড়, ডানদিকে অতল খাদ, কোথাও আর জনবসতি নেই।

টর্চের আলো ঘুরতে-ঘুরতে পাহাড়ের ঢালে এসে থেমে গেল। মামা এগিয়ে গেলেন। সাদা তুষারের ওপর কালোমতন ওটা কী?

একটা নেপালি কাটারি। ফলায় এখনও রক্ত লেগে আছে। জগুমামা রুমাল দিয়ে তার হাতল ধরলেন। সবসুদ্ধু বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

অনিমেষ মণ্ডল একই ভাবে চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। মামা ওঁর পাশের মোড়ায় বসলেন। ফার্স্ট এইড বক্স খুলতে খুলতে বললেন,—এসএস দুধ খাইয়ে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ!

মামা এবার নরম গলায় বললেন,—অনিমেষবাবু, ও অনিমেষবাবু?

—উঁ।

—খুব পেইন হচ্ছে?

—উ:!

—একবার উন্ড দেখব। ওষুধ লাগাব।

বলতে-বলতে মামা অনিমেষবাবুর ঘাড় থেকে পট্টি আলতোভাবে সরিয়ে দিলেন। বিরাট ক্ষত! ঘাড়ের সামনে থেকে পিছন অবধি আড়াআড়ি কোপ দিয়েছে। রক্ত জমে কালচে হয়ে আছে।

অ্যান্টিসেপটিস অয়েন্টমেন্ট লাগাতে-লাগাতে মামা বললেন,—অনিমেষবাবু?

—উঁ।

—আপনাকে মারল কেন?

—পালিয়ে আসছিলুম। তাড়া করেছিল।

—তাড়া করেছিল। কেন?

পালাচ্ছিলুম বলে।...আমাকে ধরে নিয়ে গেছিল।...উ:!

—কারা ধরেছিল?

—চিনি না। পাহাড়ি লোক। সকালে...বাজারে...চোখ-মুখ চেপে ওষুধ দিয়ে ধরে ফেলেছিল। আটকে রেখেছিল। সারাদিন।

—কোথায়?

—একটা খুপরিতে...জায়গাটা আরও নীচে। উ:!

—তারপর?

—জানলার ফাঁক দিয়ে পালাই।...একটা পাহাড়ি গার্ড ছিল...তাড়া করেছিল।

—ধরতে পারেনি?

—হুঁ।...ধরে ফেলে...উ:! আমি খুব চেঁচিয়ে উঠি...ভয় পেয়ে কী জোরে কোপ মারল! উ:।...

জগুমামার মুখটা কঠিন। সামলে নিয়ে বললেন, অনিমেষেবাবু, হেঁটে যেতে পারবেন আমাদের সঙ্গে?

—না:।

ঠিক আছে।—মামা বস্তিবাসীদের বললেন, ভাইসব, আমাদের বন্ধুর জন্যে আপনারা অনেক করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। কষ্ট করে ওঁকে একটু পৌঁছে দেবেন?

—জরুর, জরুর।

অশিক্ষিত এই মানুষরা কত পরোপকারী। সাচ্চা মানুষ তো এরাই।

ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত পার করেছে। সদলবলে এবার উঠছি কোয়ার্টারের দিকে। খাটিয়ায় শুইয়ে অনিমেষবাবুকে সযত্নে বয়ে নিয়ে আসছে লেপচা বস্তির বাসিন্দারা।

নীলকণ্ঠবাবু বলে উঠলেন,—বছর দেড়েক হল এখানে এসেছি। বিশ্বাস করুন, রাবাংলার মতো শান্তিপূর্ণ জায়গায় খুনখারাপি কল্পনা করা যায় না।

মামা বললেন,—আমাদের ট্রেকিং-এ যেতে দিতে চায় না।

—কারা? কেন?

—সেটাই রহস্য।

সরোজশোভন বললেন,—দেন ইউ সাসপেক্ট সামথিং?

—অফকোর্স। বড় পায়ের পিছনে কোনও কালো হাত থাকা অসম্ভব নয়।

—মানে? ঠিক বুঝলাম না।

—সময় হলে বুঝবেন।

প্রায় কোয়ার্টারে পৌঁছে গেছি, হঠাৎ পরপর দুটো গুলির শব্দ। পাহাড়ে-পাহাড়ে বিকট হয়ে ছড়িয়ে গেল।

—ফায়ারিং! পুবদিক থেকে।

—মামা নির্ঘাত কিছু ঘটেছে! যাবে না?

—নিশ্চয়ই। এসএস, আপনারা অনিমেষবাবুকে খেয়াল রাখুন।

পুবের টিলা লক্ষ করে ছুটছি। মনে হয় ওপরের বাড়িটাতে কিছু ঘটেছে। পিছন-পিছন আসছে জনাকয়েক পাহাড়ি। ওরা অনিমেষকে পৌঁছে দিতে এসেছিল।

টিলার মাথায় পৌঁছেছি। ছবির মতো একটা বাংলো। নিঝুম, অন্ধকার।

ঢোকার দরজায় হালকা চাপ দিতে খুলে গেল।

—হু'জ দেয়ার? কোই হ্যায়? কেউ আছেন?

অন্ধকার ঘরে মামার কথাগুলো পাক খেতে-খেতে ফিরে এল।

মামার টর্চ আবার জ্বলে উঠল। ঘুরছে ঘরের মধ্যে।

সাজানো-গোছানো ড্রইংরুম। টিভি, স্টিরিয়ো, বেতের সোফাসেট, ফায়ারপ্লেস, বুকশেল্ফ সবই আছে। শুধু মানুষ নেই।

সুইচ টিপে দিলাম। আলোয় ঝলমল করে উঠেছে ঘর।

জগুমামা ফের চেঁচিয়ে বললেন,—কেউ আছেন?

বাঁ-হাতে জ্বলন্ত টর্চ, ডানহাতে উদ্যত রিভলভার।

ড্রইংরুমের ভিতর দিয়ে দরজা। ভেজানো। ঠেলতে খুলে গেল। শোবার ঘর। অন্ধকার। শুধু ফায়ার প্লেসে আগুনে লালচে আভা ছড়িয়ে রয়েছে।

টর্চের আলো ঘুরতে-ঘুরতে বিছানায় স্থির হল।

সঙ্গে-সঙ্গে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছে। এ কী!

টর্চের আলো বিছানার উপর।

উপুর হয়ে শুয়ে একটি মানুষ। দু-হাত দুদিকে ছড়ানো। পিঠের মোটা হাউস কোটে দু-দুটো কালচে ক্ষত। বাঁ-বগলের পাশ দিয়ে রক্তের স্রোত বিছানা দিয়ে গড়াচ্ছে। সুবোধ ভাণ্ডারি!

৭

বাব্বা! এ যে প্রায় দুপুর এগারোটা বেজে গেছে? এতক্ষণ মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। কী ভার লাগছে মাথাটা। সব মনে পড়ে গেল।

পাশের খাট ফাঁকা। তার মানে আজকের প্রোগ্রাম ক্যানসেলড। জগুমামা কোনও উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন।

বীরেন্দ্র গুরুংকে কি খবর দেওয়া হয়েছে? তাঁর কি-রিঅ্যাকশান? অনিমেষ মণ্ডলের এখানে থাকার কথা। কেমন আছেন? ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে কী?

এইসব ভাবতে-ভাবতে উঠে দাঁড়ালাম। একটু ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম করলাম। এবার একটু ফিট লাগছে।

হঠাৎ চোখ পড়ল সামনের টেবিলে। একখণ্ড কাগজের ওপর শিলাজুতের প্যাকেট চাপা দেওয়া হয়েছে।

জগুমামার লেখা। প্রথমদিন থেকে আজ অবধি সব ঘটনাগুলো পরপর সাংকেতিকভাবে সাজিয়েছেন।

হোমো হ্যাবিলিস ফুটপ্রিন্ট মৈনান ফরেস্টে

এসএস ছবি পেলেন অনিমেষ থেকে

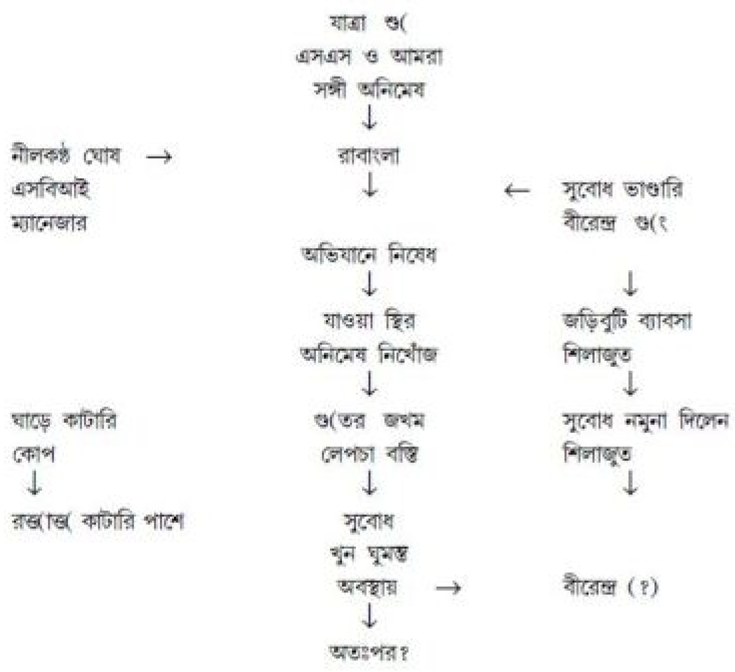

—কীরে, কী দেখছিস?

চমকে উঠেছি। জগুমামা। হেসে বললেন,—ভুলে যেতে পারি। তাই নোট করে রেখেছি।

—রাতে শোওনি?

—ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে উঠে পড়েছি। মিলিটারি ক্যাম্প হয়ে গেলাম সুবোধের বাংলোয়। পুলিশ ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে কয়েকটা ছবি তোলালাম। বীরেন্দ্র সঙ্গে কথা বললাম। আবার বেরুব।

—বীরেন্দ্র ওখানে ছিলেন?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। কাকভোরে খবর পেয়েই ছুটে এসেছে। হাউহাউ করে কাঁদছে। সুবোধ তো শুধু ব্যাবসার পার্টনার নয়, কতদিনের বন্ধু। আর ব্যাবসার দিকটাও যদি ধরিস, সুবোধের মৃত্যুতে সেটা চোট খাবে। সুবোধ মুখ্যমন্ত্রীর ভাই, এই ইমেজ ওদের বিজনেসে খুব কাজে লাগত।

—ঠিকই। সুবোধবাবু খুন হলেন কেন? কোনও মোটিভ?

—নাহ। পাচ্ছি না। চল, অনিমেষেবাবুর সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে পড়ি।

অনিমেষ চোখ বুঁজে শুয়েছিলেন। সরোজশোভন পাশে বসে। বললেন,—অনি, ডক্টর মুখার্জি এসেছেন।

আস্তে-আস্তে চোখের পাতা খুললেন অনিমেষ। জগুমামা বললেন,—কেমন আছেন অনিমেষবাবু?

এ-ক-টু ভা-লো।—অনিমেষ মৃদুস্বরে বললেন, তবে, বুঝলেন কিনা, ব্যথা। বড় ব্যথা।

ব্যথা তো হবেই। অতখানি উন্ড।—মামা সরোজশোভনকে বললেন,—ডাক্তার এসেছিলেন?

হ্যাঁ। দশটা স্টিচ হয়েছে।

—নীলকণ্ঠবাবু কোথায়?

—ব্যাঙ্কের দিকে গেলেন। বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।

আমরা একটু বেরোচ্ছি।

সুবোধ ভাণ্ডারির বাংলোর দিকে যাচ্ছি। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে বাংলোর বাইরে বেশ কিছু লোকজনের জটলা। পাহাড়ি লোকজন, সায়েবি পোশাকের মানুষ আর উর্দিপরা সিকিম পুলিশ।

হাঁটতে-হাঁটতে জগুমামা কী ভেবে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন,—টুকলু, কাটারির কোপটা কীভাবে মেরেছিল অনিমেষবাবুকে?

—উনি বললেন, পিছন থেকে তাড়া করে এসে মেরেছিল। কেন বলো তো?

—না, এমনি।

—কী হল মামা? চুপ করে গেলে কেন?

—কিছু না! স্রেফ মোটিভ! মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি না।

সুবোধ ভাণ্ডারির শরীর এখনও একভাবে পড়ে আছে। কালচে রক্ত জমাট বেধে গেছে। বেশ ভিড়। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সব অফিসার। কয়েকজন হইহই করে উঠলেন,—মুখার্জিসাব এসে গেছেন। আপনার জন্যে ওয়েট করছি।

—কেন?

—বডি কি পোস্ট মর্টেমের জন্যে উঠাব?

—নিশ্চয়ই। সুবোধবাবুর কোনও আত্মীয়স্বজন আসবার নেই তো?

—সুবোধের রিলেটিভ তো হামরা ছিলম মুখার্জিসাব। একদম বাচ্চা বয়েসে ওর বাপ-মা দোনোরই ডেথ হয়। অরফ্যানেজে পড়ালিখা করেছে। সাদি করেনি।

ঘরের কোণ থেকে কান্নাভেজা কথাগুলো ভেসে এল। বীরেন্দ্র গুরুং। একটা বেতের মোড়ায় মাথা ধরে বসে আছেন। চোখদুটো লাল, চুল উস্কোখুস্কো।

আস্তে-আস্তে বললাম,—মন শক্ত করুন বীরেন্দ্রজি। আপনার দোস্তকে যে খুন করেছে, তাকে ধরতে হেল্প করুন।

—জরুর! জরুর ভাইয়া! ওহি শয়তানকে হামি কভি ছাড়বে না। সুবোধ... মেরে দোস্ত...মুখার্জিসাব যিতনা খরচা হো, ফিকর মাত কিজিয়ে, সুবোধের কাতিলকে পাকড়াতেই হবে।

—বীরেন্দ্রজি, হয়তো শুনেছেন, প্রফেসর মণ্ডলও সিরিয়াসলি ইনজিওরড হয়েছে। ওই কাল রাতেই ঘাড়ে কাটারির কোপ মেরেছে।

—হাঁ, শুনেছে। কী যে হইতেছে হামি বুঝতে পারছে না।

মামা বললেন,—ডেডবডি পাঠিয়ে ঘর সিল করে দিন। চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ পোস্টিং থাকবে।

৮

ফায়ারপ্লেস সামনে বসে আছি। নীলকণ্ঠ ঘোষ, সরোজশোভন আর আমি। অনিমেষবাবু ঘুমিয়ে চলেছেন। জগুমামা অন্য ঘরে।

—সরোজশোভন হঠাৎ বললেন, টুকলু, কাল তোমরা যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, আপনি যাচ্ছেন না?

—সার্টেনলি নট। অনিকে এই অবস্থায় ফেলে...মিস্টার ঘোষ, আপনি কি যাচ্ছেন?

—আমাকে তো যেতে হবেই। স্পট আইডেন্টিফাই করবে কে? তবে অনিমেষ অনেকটা সুস্থ। ওর নার্সিং-এর ব্যবস্থা করে আপনি যদি...

না-না মিস্টার ঘোষ, এসএসের যাওয়ার দরকার নেই।—জগুমামা ঘরে ঢুকে পড়েছেন। বললেন—যা সব ঘটছে, তাতে যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও বাজে ঘটনা ঘটতে পারে। অনিমেষবাবুকে একা রাখা ঠিক হবে না।...টুকলু, যাবি তো?

—কী রে যাবি তো?

—চলো। আমি রেডি।

পাহাড়ি পথ জনমানবশূন্য। আকাশে মেঘ, ঘোর অন্ধকার। শোঁ-শোঁ করে কনকনে বাতাস বইছে। তিনপ্রস্থ গরম পোশাক। তবু ঠান্ডা বিঁধছে সূচের মতো।

ধীরে-ধীরে দুজনে হাঁটছি। টাটকা বরফ পড়ছে। রাস্তা বেশ হড়হড়ে, টর্চের আলোয় বুঝেশুনে পা ফেলতে হচ্ছে।

—চাবি?

—ডুপ্লিকেট বানিয়ে নিয়েছি। ওরিজিন্যালটা পুলিশের কাছে।

নিস্তব্ধ চরাচর, নিকষ অন্ধকারে ঢাকা। অদূরে সেই বাংলো।

সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছি। ও হরি! দু-দুজন লেপচা সেপাই দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। মামা ইশারায় বললেন,—চুপ!

খুট! তালা খোলা হল। পা-টিপে-টিপে দুজনে ভিতরে। মামা ফিসফিস করে বললেন,—সুইচে হাত দিস না।

মামার হাতের টর্চ জ্বলে উঠেছে। নীচের দিকে ফোকাস। ঘরে হালকা আলো। বিছানা এখন শূন্য। গদিতে দু-চারটে কালচে ছোপ। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

—টুকলু, কুইক। টেবিল সার্চ কর। আমি বুকসেলফ দেখছি। হাতে লেখা কাগজপত্র, ডায়েরি, চিঠিপত্র যা পাবি, নিয়ে নে।

একগাদা ফাইল টেবিলে ছড়ানো। পোর্টেবল টাইপ মেশিন। রাইটিং প্যাড—উপরে হিজিবিজ লেখা। একটা ডায়েরি,—ব্যাবসার খরচ লেখা। একটা 'পার্সোনাল নেম অ্যাড্রেস' ছাপা ডায়েরি। সব ঢুকে গেছে জ্যাকেটের পকেটে।

পায়ে লোমশ মতো কিছু ঠেকল। বেড়াল? পশমের নেপালি টুঁপি। মামা ইশারায় নিয়ে নিতে বললেন।

মামা জানলার ঠিক নীচে বুক সেলফের সামনে উবু হয়ে বসে বইপত্র টেনে নামাচ্ছেন, হাত ঢুকিয়ে ভেতর দেখছেন, আবার বই রেখে দিচ্ছেন। আড়চোখে দেখলাম, একটা খাম টেনে বার করেছেন।

আমি টেবিলের ড্রয়ার তোলপাড় করছি। নানারকম শুকনো গাছগাছড়া পলিপ্যাকে ভরতি। তিনচারটে শিলাজুতের প্যাকেট বলে মনে হল। ওই রকম কালো কালো, ঢিলের মতো, একটায় আবার 'X' চিহ্ন দেওয়া। জ্যাকেট পুরে ফেলেছি।

—কে? কে ওখানে?

কাচের জানলার বাইরে কালো একটা মূর্তি! মামা ছুটে গেলেন জানলার দিকে।

নাহ এত অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল না। কেবল দেখতে পেলাম, অজ্ঞাত অনুসরণকারী ঊর্ধ্বশ্বাসে নামছে পাহাড় বেয়ে।

মামা পাঁচসেলের টর্চ চেপে ধরেছেন জানলার কাচে। একবার ঝলসে উঠল লোকটার পৃষ্ঠদেশ। গায়ে নীলের ওপর সাদা স্ট্রাইপ জ্যাকেট।

মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—আমি অনুমান করেছিলাম, খুনি আজ আসবেই। কিছু-না-কিছু সূত্র ও নিশ্চয়ই ফেলে গেছে। সে জন্যই আলো জ্বালিনি। তবু শেষরক্ষা হল না।

—তুমি জ্যাকেটটা দেখেছ?

—জ্যাকেট?

—হ্যাঁ। লোকটা পরে ছিল। পরশু যখন আমরা রাবাংলায় এসে পৌঁছলাম, নীলকণ্ঠবাবু আমাদের রিসিভ করতে এসেছিলেন। ওঁর গায়ে ছিল—

—রাইট! ঠিক বলেছিস। এই নীল-সাদা জ্যাকেট। তুই জ্যাকেটটার প্রশংসা করায় হেসে বলল, দিদি সুইডেন থেকে পাঠিয়েছে।

৯

দশটা পাঁচ। মিলিটারি জিপের সামনে ড্রাইভারের পাশে জগুমামা। পিছনে লাগেজসহ নীলকণ্ঠবাবু ও আমি।

সবচেয়ে আফশোসের ব্যাপার, যাদের উৎসাহে আমাদের এই অভিযান, সেই সরোজ শোভন আর তাঁর বন্ধু অনিমেষ দুজন কেউই সঙ্গে নেই। একজন জখম হয়ে শয্যাশায়ী, অন্যজন তাঁর দেখভালের দায়িত্বে।

গাঢ় সবুজ পাহাড়ের ঢেউ, খণ্ড-খণ্ড মেঘ এসে ঘিরে ধরছে। হিমালয়ের সোনালি শিখর আঁকা আকাশের গায়ে।

সরু আঁকাবাঁকা পথ। কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে গভীর খাদ। টলমল করতে করতে জিপ উঠছে পাহাড় বেয়ে। দক্ষ হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছেন শর্মাজি, ফৌজি ড্রাইভার।

সুধী শর্মা নেপালি। হিন্দি তো বটেই, মোটামুটি বাংলাও বলতে পারেন। বছর তিরিশের সুঠাম যুবক। অমায়িক হাসিখুশি।

বললাম,—শর্মাজি, মৈনান ফরেস্ট কতক্ষণ লাগবে?

—শাম হোয়ে যাবে। দিখছেন তো রাস্তার হালত। আপনারা তো উঁহা ঠারবেন?

—হ্যাঁ।

—আর্মস লিয়েছেন সাথে? হামারা পাশ একঠো হ্যায়। বহোত কিসিম কা জানবার আছে উ জঙ্গলে। আনে-যানে কা সময় কহিবার হাম লেপার্ড ভি দিখেছে।

—আপনি মৈনান ফরেস্ট গেছেন?

—জি। আকসার যাতে হ্যায়। জঙ্গল কা থোড়া করিব হামারা ক্যাম্প, চায়না বর্ডার। সাবলোগ বোলে থে, আপলোগ উ জঙ্গলমে বড়া-বড়া প্যায়ের কা নিশান দিখেছে। ইনসান কা মাফিক, লেকিন বহোত বড়া। হ্যায় না?

—হ্যাঁ, শর্মাজি। এই যে নীলকণ্ঠবাবু, উনি পায়ের ছাপ কেন, নিজের চোখে আদিম মানুষদের দেখেছেন।

—সাচ? ঘোষসাবকো হাম বহোৎ পহেলে সে জানতে হ্যায়। বেঙ্ক ম্যানেজার। সাব, আপনা আঁখসে দিখেছেন?

হ্যাঁ শর্মা। নীলকণ্ঠ ঘোষ, বললেন, দেখেছিলুম বলেই না এত কাণ্ড!

—আপনি যে আজ একেবারে সাইলেন্ট নীলকণ্ঠবাবু! কী ব্যাপার?

—কী বলব রে ভাই! কিস্যু ভাল্লাগছে না। পরপর যা সব ঘটে যাচ্ছে। কোথায় আসব পাঁচজন, একজন কাটারি খেয়ে পড়ে থাকল, তার বন্ধুটাও আসতে পারল না। হঠাৎ খুন—

ড্রাইভারজি, থোড়া রুকিয়ে!—জগুমামা কথা থামিয়ে বলে উঠলেন।

জগুমামা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন, চশমার ওপর চেপে ধরেছেন দূরবিন।

দক্ষিণের দুটো পাহাড়ের ঢালের সমতল জায়গায় একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে ছোট-ছোট বিন্দুর মতো কারা ঘোরাফেরা করছে।

দূরবিন চোখ থেকে সরিয়ে মামা বললেন,—শর্মাজি, ওখানে আমাদের যেতে হবে।

—ঠিক হ্যায়। লেকিন, বহোৎ ঘুমনা হোগা। চলিয়ে।

জিপ আবার স্টার্ট দিল। আমি বললাম,—মামা, ওরা কি জঙ্গলে কাঠ কাটছে।

—না রে। বড়-বড় কোদাল, বেলচা দিয়ে কীসব তুলছিল। আচ্ছা শর্মাজি, এখানে জঙ্গলে ঢুকতে হলে পারমিট লাগে না?

—জরুর লাগে। বর্ডার এরিয়া। ফরেস্ট ডিপাট সে লাগে, মিলিটারি সে ভি লাগে। দোনো পাস চাহিয়ে।

জিপ গোঁগোঁ করে পাক খাচ্ছে পাহাড়ি পথ বেয়ে। শুধু একটানা ইঞ্জিনের শব্দ, সকলেই নিশ্চুপ।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। বললাম,—নীলকণ্ঠবাবু, আপনার গায়ের এই জ্যাকেটটা বিদেশি, তাই না?

—হ্যাঁ। আগেই তো বলেছি, দিদি সুইডেন থেকে পাঠিয়েছিল। তুমি আবার নজর দিও না যেন।

—কেন? নজর দেব কেন?

—কী জানি ভাই! কাল সকালে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে ব্যাঙ্কে গেছিলুম। চেম্বারে এটা খুলে রেখে ক্যাশ ব্যালান্স মিলিয়ে চেম্বারে ফিরে দেখি—ধাঁ। মালটা নেই! ভাবলুম, ভুলে বোধহয় বাড়িতেই ফেলে এসেছি। তারপর কোয়ার্টারে এসেও পেলুম না।

—তারপর?

—তারপর অবাক কাণ্ড! আজ সাতসকালে ব্যাঙ্কের দারোয়ান বাহাদুর আমার কোয়ার্টারে এসে এটা দিয়ে গেল। বলল, আমার চেয়ারেই নাকি ঝোলানো ছিল।

—সে কী?

—হ্যাঁ রে ভাই। একে তুমি কী বলবে? অদ্ভুতুড়ে ঘটনা? সবমিলিয়ে আমার মনমেজাজ খুব বেচাল।

মামা পিছনে ফিরেছেন, আমার সঙ্গে চোখা-চোখিও হয়েছে। মামার ইশারা বুঝে নিয়ে বললাম,—আবার এটাও তো হতে পারে, রাবাংলায় খুনের পিছনে যে ক্রিমিন্যাল বসে আছে, সে-ই হয়তো আপনার জ্যাকেটটা সরিয়েছিল কালকের জন্যে?

—বলো কী! তার লাভ?

—লাভ বিরাট। আপনার এই জ্যাকেটটা রাবাংলায় খুবই আনকমন। অপরাধী যদি এটা গায়ে চাপিয়ে কোনও কুকর্ম করে পালায়, দূর থেকে তাকে দেখে আপনি বলেই ভুল হবে।

—তাই তো!

আমাদের বাহনও থেমে গেছে।

মামা জিপ থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন। পিছনে আমরা।

ওরাও থেমে গেছে। কোদাল, বেলচা হাতে ধরে জিজ্ঞাসুচোখে তাকিয়ে রয়েছে পাহাড়ি লোকগুলো এবং তাদের সর্দার যুবকটি।

যুবকের পরনে প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। অবাঙালি, তবে আদিবাসী নয়। চোখেমুখে বিরক্তি। মামা সোজা তার দিকেই গিয়ে বললেন,—আপনারা এখানে কী করছেন?

তাচ্ছিল্যের সুরে পালটা প্রশ্ন এল,—আপলোগ কৌন হ্যায়?

হাম মিলিটারি কা আদমি।—শর্মা কঠিন গলায় বললেন, সাব যো সাওয়াল পুঁছ রহে হ্যায় উসকা জবাব দিজিয়ে।

—ইয়ে ভাণ্ডারিজি কা মাল হ্যায়। জড়ি বুটি আইটেম। ভাণ্ডারিজি কওন জানতে হ্যায়? চিফ মিনিস্টার কা ভাই।

—ভাণ্ডারিজি মিনস সুবোধ ভাণ্ডারি? লেকিন—

মামার কড়া চিমটি খেয়ে থেমে গেছি। মামা গম্ভীর গলায় বললেন,—পারমিট দিখাইয়ে। টুকলু, কিছু স্যাম্পল নিয়ে নে।

যুবক যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গে জ্যাকেটের পকেট থেকে কাগজপত্র বার করল। আমি আর নীলকণ্ঠবাবু পাহাড়ি শ্রমিকদের কাছ থেকে কিছু নমুনা নিলাম।

কালচে রঙের ঢেলাগুলো আর কিছুই নয়, বিখ্যাত সেই 'শিলাজুত' বা শ্যাওলা পাথর।

বেশ কিছু শিলাজুত পকেটে ভরেছি। মামা কাগজপত্র পরীক্ষা করে যুবককে ফেরত দিয়ে দিলেন। বললেন,—চলিয়ে শর্মাজি।

জিপ আবার রওনা হয়েছে। মামা হাত বাড়ালেন,—টুকলু ওগুলো দে তো।

তার পরেই মামার ভ্রুদুটো সেকেন্ড ব্র্যাকেট হয়ে গেল,—এ কী! এগুলো কী?

—কেন? শিলাজুত।

—উঁহু। এগুলো মোটেই শিলাজুত নয়।

১০

পাহাড়ে অন্ধকার ঝুপ করে নেমে আসে। এখন আবার শীতের সময়। ঘড়ির কাঁটা সবে চারটে পেরিয়েছে, এর মধ্যেই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। সূর্য পশ্চিমের পাহাড়—জঙ্গলের ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে, শিগগিরই ডুব দেবে।

আমাদের তাঁবু দুটো সেটিং হয়ে গেছে। মিলিটারি ম্যান সুধী শর্মা একাই করে দিয়েছেন। নীলকণ্ঠ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছেন সামনের জঙ্গলে। জ্বালানির কাঠ আনতে।

আমরা তিনজন গল্প করছিলাম। আমার সামনে ব্যান্ডেজ বেঁধে অনিমেষ মণ্ডল আর সরোজ শোভন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কথা বলব কী, আমাদের পাশের দুটো ঝাঁকড়া গাছে পাখির দল এমন ভয়ানক কিচিরমিচির জুড়েছে যে, কান একেবারে ঝালাপালা। সরোজশোভন বার দুয়েক কিছু বলার চেষ্টা করে শেষে 'ধ্যুৎ' বলে চুপ করে গেছেন।

হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। মৈনানের জঙ্গলে পৌঁছোবার আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের বাকি দুই পার্টনারও এসে হাজির!

আমি দুজনকে দেখে খুশি হলেও, জগুমামার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

সরোজশোভন কিছু আঁচ করেছেন। আমতা-আমতা করে বলেছিলেন,—কী করব বলুন? আপনারা রাবাংলা ছাড়ার পর থেকে অনি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। ওর এক গোঁ, আসবে। শেষে বাধ্য হয়ে মিলিটারি থেকে ফের পাস নিয়ে বীরেন্দ্র গুরুংকে বলে জিপের বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হলাম।

মামা বললেন,—কাজটা ঠিক করেননি প্রফেসর মণ্ডল।

—সে আপনি যাই বলুন, এই অভিযানে আমিই হলুম গিয়ে মূল হোতা। সেই আমিই, বুঝলেন কি না, ঘরে শুয়ে আঙুল চুষব, আর আপনারা সবাই ড্যাং-ড্যাং করে চলে আসবেন, এ হয় নাকি?

পরিস্থিতি তেমন হলে মেনে নিতে হবে।—মামা একই টোনে বললেন।

—না-না, ডক্টর মুখার্জি। আপনি অকারণ ভয় পাচ্ছেন। আয়াম কোয়াইট ফিট। বুঝলেন কিনা, গত পরশু থেকে কনসপিকুয়াস ট্রিটমেন্ট তো হয়েছে।

কথাটা যে 'কনটিনিউয়াস' সে প্রসঙ্গে না গিয়ে মামা শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। বলে গেছেন, —খেয়াল রাখিস, টুকলু। জানোয়ার গিজগিজ করছে। একটু ঘুরে আসছি।

ইতিমধ্যে সূর্য অদৃশ্য। আকাশে আলোর রেখাগুলো দ্রুত মুছে যাচ্ছে। পাখপাখালির কলরব কমে গেছে। হাঁড় কাঁপানো বাতাস বইতে শুরু করেছে।

উইন্ডচিটারের চেন গলা পর্যন্ত টেনে বললাম,—এবার বলুন, কী বলছিলেন।

—ধুর, সে ভুলে গেছি। বলো তো, ডক্টর মুখার্জি কিনারা করতে পারলেন?

—কীসের?

—এই ধরো অনিমেষের ওপর অ্যাটাক, ভাণ্ডারির মার্ডার বা ফুটপ্রিন্টের?

—মামা বলেছেন, সব ব্যাপারগুলোই রিলেটেড। একই সুতোর বাঁধা। আর—

থেমে গেছি। স্তব্ধ পাহাড়ে হঠাৎ জেগে উঠেছে ধুপ...ধুপ শব্দ!

মুহূর্তে তিনজনে তাঁবুর মধ্যে। অনিমেষকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে দুজনে দুটো কাটারি হাতে মুখ বাড়িয়ে রইলাম।

আওয়াজটা এদিকেই এগিয়ে আসছে। ধুপ...ধুপ...ধুপ...ধুপ...

এক-এক করে সেকেন্ড...মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে...রুদ্ধশ্বাসে...দাঁড়িয়ে আছি...

যা ব্বাবা! দুই মূর্তিমান সুধী শর্মা আর নীলকণ্ঠ ঘোষ। বিরাট এক কাঠের বোঝা দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে আসছেন। এবড়ো-খেবড়ো জমিতে তার উৎকট শব্দ! যাক, বাঁচা গেল।

নীলকণ্ঠবাবু এসেই বসে পড়লেন,—বাপরে! দম বেরিয়ে গেছে।

সুধী শর্মা হেসে বললেন,—ঘোষসাব পুরা থক গয়া! আরে ভাইয়া, ইয়ে তো কুছ নেহি হ্যায়। হামারা ট্রেনিং মে তো—

একটু থেমে চোখ বুলিয়ে বললেন,—লেকিন মুখার্জিসাব কাঁহা?

উনি একটু বেরিয়েছেন।—বললাম, এখনই এসে পড়বেন।

ইয়ে আন্ধেরি পাহাড়েমে,—শর্মা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, ঠিক হ্যায়। অব আইয়ে, সামান উঠাইয়ে। খানা পাকায়েঙ্গে।

মালপত্র শুধু আমাদের নামাতে হল। পুরো রান্না একাই আরম্ভ করলেন শর্মা। আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছি। সত্যি, এই মানুষটা না এলে কপালে প্রচুর দুর্ভোগ ছিল।

নীলকণ্ঠ ঘোষের মনমরা ভাব চলে গেছে। রুকস্যাকে আধশোয়া হয়ে পা নাচাতে-নাচাতে বললেন,—যাই বলো, আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে। আরে বাবা, ফুল গ্রুপে আসতে না পারলে মজাটাই মাটি।

যা বলেছেন!—সরোজশোভন বললেন,—আই ওয়াজ সো আপসেট, আপনাকে বোঝাতে পারব না। সবকিছু অরগ্যানাইজ করে নিয়ে এলাম, অথচ শেষে কিনা আমরাই বাদ।

—এসব তো আমার জন্যেই হল রে! আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

—তুই কী করবি? তুই কি জানাতিস নাকি যে তোর এই অবস্থা হবে? গুডলাক, তুই সুস্থ হয়ে উঠেছিস।

ছাড়ুন ওসব!—নীলকণ্ঠ বললেন, জানেন, আমার বেশ থ্রিল হচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে, এইবার এইবার—

নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটবে।—সরোজশোভন বললেন, আমারও ঠিক আইডেন্টিক্যাল ফিলিংস হচ্ছে। দ্যাট এপম্যান উইল অ্যাপিয়ার এগেইন।

আমার বুকের ভিতর কেমন গুরগুর করে উঠল। চোখ চলে গেল কবজির দিকে। মাত্র ছ'টা। এর মধ্যেই রাত ঝিমঝিম করছে।

কয়েক মিনিট সকলেই চুপ। অনিমেষ বললেন,—তা ভাই টুকলু, যে কথাটা হচ্ছিল, সুবোধ ভাণ্ডারিকে খুন করে কার কি লাভ হল? বা, আমাকে অমনভাবে কিডন্যাপ করল কেন? এর পেছনে উদ্দেশ্য কি? ডক্টর মুখার্জির ধারণা কি?

বললাম তো! আমার ধারণা আপনাকে যারা কিডন্যাপ করেছিল, তারা চেয়েছিল আমরা যাতে এখানে না আসি।

—কেন? আমরা এলেই বা কী, না এলেই বা কী?

—সেটাই তো রহস্য!

—আর ভাণ্ডারির খুন?

—হতে পারে সুবোধবাবু কোনও চক্রের মধ্যে ফেঁসে গিয়েছিলেন। পরে উনি সেই জাল থেকে বেরিয়ে আসতে চান। অপরাধী সেটা বুঝতে পেরে ওঁকে দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেয়। আরেকটা ঘটনা জানেন?

আসার সময় পাহাড়ে আমরা সুবোধবাবুদের কালেক্টরদের দেখি। লরি দাঁড় করিয়ে শিলাজুত সংগ্রহ করছিল। কিন্তু স্যাম্পল নেবার পর, মামা দেখে বললেন, ওগুলো শিলাজুত নয়।

—মানে? তা হলে কী ওগুলো?

—জানি না।

এই সময় উঁকি মারলেন সুধী শর্মা,—রাত বহোৎ হো চুকে। মুখার্জিসাব আভিতক তো নেহি লওটা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম, সর্বনাশ! প্রায় সাতটা বাজে। জগুমামা ফেরেনি।

বললাম,—এখনই আমাদের বেরুতে হবে। শর্মাজি, রাইফেলটা নিয়ে নিন। সরোজ শোভনবাবু, আপনি অনিমেষবাবুকে নিয়ে পাহারায় থাকুন। চারিদিকে আগুন জ্বলছে, কোনও জন্তু কাছে ঘেঁষবে না।

১১

আকাশে লালচে মেঘ, চাঁদ, তার আড়ালে। পিচঢালা ঘোর অন্ধকার, এক হাত দূরের বস্তু দেখা যাচ্ছে না, অসহ্য ঠান্ডা!

সুধী শর্মার কাঁধে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল। পাঁচ সেলের টর্চ দুটো।

শর্মা হঠাৎ ফিসফিস কণ্ঠে বললেন, হোঁশিয়ার! আজুবাজুমে শের হ্যায়। স্মেল আ রাহা হ্যায়।

তখনই খুব কাছ থেকে ভেসে এল রক্ত-জল-করা ধ্বনি,-উ-উ-ম-ম!

শর্মা অস্ফুটে বললেন,—লেপার্ড।

কিন্তু মামা? মামা কোথায় গেলেন? হিংস্র শ্বাপদ অধ্যুষিত রাতের অরণ্য, মামা একা! সম্বল তো একটা রিভলভার! ভেবে শিউরে উঠছি, তবে কি কোনও শ্বাপদের আক্রমণে—? না-না—অসম্ভব।

মামা মামা! জগুমামা-আ! তুমি কোথায়?

নীলকণ্ঠ ঘোষও চেঁচিয়ে উঠলেন,—ডক্টর মুখার্জি!

দুটো আওয়াজই পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরতে লাগল।

শর্মা শক্তগলায় বললেন,—চলিয়ে।

চলব কী, পা যে অসাড় লাগছে। অসহ্য আতঙ্ক গলার কাছে।

শর্মা কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে শূন্যে ফায়ারিং করল—টি-উ-স!

আবার প্রতিধ্বনিতে কাঁপছে পাহাড় জঙ্গল।

ওই যে-ওই যে! তীব্র চিৎকার ছেড়ে হঠাৎ ছুটে গেলেন নীলকণ্ঠ ঘোষ।

টর্চের আলোয় আমার শরীর বেয়ে হিমবাহ নেমে গেল। জঙ্গলের ঠিক সামনের ফাঁকা জায়গায় একজন মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর দু-হাত সামনে ছড়ানো।

মামা! জগুমামা!

নীলকণ্ঠ ঘোষ উবু হয়ে বসে পড়েছেন অচেতন দেহের সামনে। স্থান কাল ভুলে চিৎকার করছেন,—ডক্টর মুখার্জি! ডক্টর মুখার্জি?

আমি পাগলের মতো ছুটে গিয়ে মামার বুকে কান পেতেছি। যাক, নিশ্বাস পড়ছে।

সুধী শর্মা উদ্যত রাইফেল হাতে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে।

—শর্মাজি, ডক্টর মুখার্জি সাড়া দিচ্ছেন না কেন?

—বেহোশ হো গয়া। ঘোষসাব, ইনকো ইঁহাসে তুরন্ত লে যানা হোগা।

এই সময় ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন জগুমামা। অবসন্ন গলায় বললেন,—আ-আমি...উ: ব্যথা!

আবার তাঁর চোখ বুজে এল। বিড়বিড় করে বললেন,—জাপটে...ধরেছিলাম। পারলাম না। হাতে কী একটা...মারল মাথায়।...সব অন্ধকার।

—কাকে ধরেছিলে?

—এপ...এপ ম্যান। আদিম মানুষ। উ:...সারা গা লোমে ভরতি, উ:...কী শক্তি!

—উনসে ইতনা বাত করনা ঠিক নেহি। পহেলে ফাস্ট এইড দেনা হোগা। আপ দোনো উনকো উঠাকে লে চলিয়ে। জলদি।

আমার কাঁধে মাথা, নীলকণ্ঠবাবুর কাঁধে পা, দুজনে টেনে নিয়ে চলেছি জগুমামাকে। পাশে সর্তক শর্মা, এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে রাইফেল।

খানিকটা দূর থেকেই লালচে আলো দেখা যাচ্ছে। আমাদের তাঁবু দুটোর আগুন-পাঁচিল।

কিন্তু কাছে পৌঁছোতে আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

তাঁবুর প্রবেশপথের আগুন নিভু-নিভু। তাঁবু দুটো ছিঁড়ে ফর্দাফাই, ভেঙে চুরে থেবড়ে পড়ে আছে! কে বা কারা যেন প্রবল আক্রোশ মিটিয়েছে তাঁবু দুটোর ওপরে!

কিন্তু মধ্যে যারা ছিল? তাঁরা? তাঁরা কোথায়?

শর্মা চেঁচিয়ে উঠলেন,—বনার্জিসাব! মণ্ডলসাব।

জবাব এল না।

গল্প-উপন্যাসে পড়েছি, দু:স্বপ্নের রাত নাকি ফুরোতে চায় না। কিন্তু কথাটা বাস্তবেও যে কত সত্যি, তা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি কাল রাতে। এর আগে কখনও আমার এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়নি।

কাল সারা রাত কেটে গেছে নিদ্রাহীন। চোখ মেলে বসেছিলাম। অরণ্য পর্বত মাঝে-মাঝে কেঁপে উঠেছে। শ্বাপদের হিংস্র গর্জনে। কখনও কাছে, কখনও দূরে। ছেঁড়াখোঁড়া তাঁবুর দোরগোড়ায় থ্রি-নট-থ্রি হাতে বসেছিলেন সুধী শর্মা। আমার পাশে নীলকণ্ঠ ঘোষ। একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করেছেন আর মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করে গেছেন,—এরপর...এরপর আর কী হতে পারে? ওরা দুজন...আমরা...ফিরতে পারব তো?

কে উত্তর দেবে? সরোজশোভন আর আহত অনিমেষ মণ্ডলকে কেউ বা কারা তুলে নিয়ে গেছে। কেমন আছেন বা আদৌ এখনও আছেন কি না, জানি না। আর জগুমামা? শর্মাজি গুঁড়োদুধ গুলে খাইয়ে দেবার পর সেই যে চোখ বুজেছেন, নি:সাড়ে ঘুমিয়েছেন।

চোখের সামনে ধীরে-ধীরে অন্ধকার আবছা হয়ে এল। জনহীন নিঝুম মৈনান আবার মুখরিত হয়ে উঠল পাখিদের কল কূজনে।

আ:—! রাত আর দিনের মধ্যে এত তফাত! ভোর এত মধুর! আগে কোনওদিন বুঝতে পারিনি।

মামা এখনও ঘুমোচ্ছেন। আমরা তিনজন বেরিয়ে এলাম। নীলকণ্ঠ ঘোষ এখনও এক কথা বলে যাচ্ছেন,—শর্মাজি, ওদের দুজনকে কি আর পাওয়া যাবে না?

সুধী শর্মা জবাব দিলেন না। বলতে বাধ্য হলাম, কী প্রশ্ন করছেন বলুন তো? আপনি যেখানে, আমরাও সেখানে।

শর্মা সপ্রশংস চোখে তাকালেন। বললেন,—ব্রাদার, এক কাম করো, অন্দর যাকে দেখো, মুখার্জি সাব নিদ সে উঠ গয়া কেয়া?

তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই মন আনন্দে ভরে উঠল। জগুমামা জেগেছেন শুধু না, স্লিপিং ব্যাগ থেকে উঠে বসেছেন।

বিষণ্ণ হেসে বললেন,—কী রে, কী খবর?

—তুমি কেমন আছ?

—এমনিতে সব ঠিক, কেবল মাথার পিছনে খুব ব্যথা। নিজেকে ছাড়াতে মাথায় কাটারির কোপ মেরেছিল।

—এদিকে আসুন। মামা জেগে গেছেন।

হুড়মুড় করে বাকিরা ঢুকে পড়লেন।

—মামা, এবার বলো, কাল কী ঘটেছিল?

—ওরা কই? বাকি দুজন?

—পরে বলছি। আগে তোমারটা বলো, ওদের ঘটনাটা পরে ঘটেছে।

—বি সিরিয়াস টুকলু। এটা ছেলেমানুষির সময় নয়। আগে আমার সব জানা দরকার।

মামা হঠাৎ কেন রেগে গেলেন, বুঝলাম না। নীলকণ্ঠবাবু সবটা বললেন।

জগুমামা সব শুনলেন। তারপর বললেন,—এবার অনেকটা পরিষ্কার হল। আমায় না পেয়ে, ওদের দুজনের ওপর ঝাল মিটিয়েছে। এবারে আমার কথা বলছি।

সরোজশোভন আর অনিমেষবাবুকে দেখে মেজাজ খিঁচড়ে গেছিল। কারণ আমি সব সময় মনে করি, টিম লিডারের ডিসিশন শেষ কথা। নইলে ডিসিপ্লিন, থাকে না। তার ডিসিশনে আপত্তি থাকলে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয় হোক, কিন্তু সিদ্ধান্ত একবার হয়ে গেলে সেটা সবাইকে মানতেই হবে। সেটা ওরা মানেনি।

ওদের সম্বন্ধে কী করা উচিত, এইসব ভাবতে-ভাবতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছি। হঠাৎ খেয়াল হল সূর্য ডুবে গেছে। আলো নিভে যাচ্ছে।

সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন করলাম। কিন্তু গরম মাথায় গোড়াতেই ভুল করে ফেলেছি। যে-কোনও অচেনা জায়গায়, বিশেষত জঙ্গলে, এগোবার সময় চিহ্ন দিয়ে এগোতে হয়। সেটা আমি করিনি, ফলে যা হবার তাই হল। আমি পথ হারালাম। চিহ্ন দিয়ে দেখছি, বারবার একই জায়গায় ফিরে-ফিরে আসছি।

ততক্ষণে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে পাহাড়। আমার বাঁ-হাতে টর্চ, ডানহাতে রিভলভার। মাঝে-মাঝে নানারকম হুংকার, গর্জন শুনছি। জঙ্গলের ফাঁক-ফোঁকরে দেখছি জ্বলন্ত সব চোখ, টর্চ মারতে সরে যাচ্ছে।

আমার অবস্থা ভাবুন! একবার ভাবছি কোনও গছে উঠে বসি। সকাল হলে বেরোব। আবার ভাবছি, আপনারা চিন্তায় অস্থির হয়ে যাবেন।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছে, বলতে পারব না। হঠাৎ দেখলাম, দূরে আলো!

ওই আলো লক্ষ করে ছুটলাম।

কখনও হোঁচট খেয়ে পড়ছি লতাপাতায়, কখনও ধাক্কা খাচ্ছি গাছে, আবার ছুটছি। রিভলভার পকেটে, বাঁ-হাতে শুধু জ্বলন্ত টর্চ।

ক্রমশ আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, তাঁবু দুটো আর আগুনের বেড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঠিক এই সময় —!

মামা বাঁ-হাত বাড়িয়ে বললেন, জল।

জলের বোতল এগিয়ে দিতে উপুড় করে দিলেন গলায়। তারপর বললেন,—জানেন, প্রায় আঠেরো ঘণ্টা পর জল খাচ্ছি।

—তারপর?

—হঠাৎ আমার সামনে মাটি ফুঁড়ে এসে দাঁড়াল এক কৃষ্ণকায় দানব।

—দানব?

—হ্যাঁ, দুপায়ে হাঁটলেও ওকে মানব বলা অসম্ভব। বীভৎস চেহারা। মুখের হনু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, কুতকুতে চোখ দুটো গর্তে ঢোকানো, মুখটুকু বাদে সারা শরীর লোমে ভরতি।

বলতে লজ্জা নেই, ঠিক সেই মুহূর্তে হাত-পা অসাড় হয়ে এসেছিল। বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলাম। কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইলাম। এই সময় ওই এপ ম্যান মুখ উপরে তুলে ছাড়ল হুংকার।

সংবিত যখন ফিরে পেলাম, দেরি হয়ে গেছে। না-না, রিভলভার বের করতে পারতাম, কিন্তু বিজ্ঞানের লোক হয়ে এতবড় এক আবিষ্কারকে গুলি করা যায় না।

তখন আর পালাবার সময় ছিল না, দানবটা দু-হাত বাড়িয়ে আমায় ঘিরে ধরেছে।

ঠিক সেইসময় শুনলাম, টুকলুর চিৎকার। শুনেই সর্বশক্তিতে পালটা ঝাঁপ মারলাম ওর উপরে। দু-হাতে ওর পেট জাপটে ধরলাম। এর পরপর নীলকণ্ঠবাবুর ডাক। একটা রাইফেলের শব্দ।

আমি তখন মাথা দিয়ে প্রাণপণে গুঁতোচ্ছি ওই দানব-মানুষটার পেটে।

পারলাম না। হঠাৎ মনে হল, মাথায় যেন কেউ পাথর ভাঙল। সব অন্ধকার।...

কয়েকমুহূর্তের নৈ:শব্দ। তারপর সুধী শর্মা বললেন,—মুখার্জিসাব অব ক্যা শোচতে হ্যায়? ওয়াপস চলে?

এক ঝটকায় জগুমামার মাথাটা ঘুরে গেল শর্মার দিকে।

—বলছেন কী শর্মাজি? ফেরার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

—কিন্তু ওরা দুজন? ওদের ফিরে পাওয়ার কী হবে?

—খুঁজতে হবে। যদি জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ওরা—ওরা বেঁচে নেই?—নীলকণ্ঠ চেঁচিয়ে বললেন।

—থাকতে পারে, নাও পারে। প্রার্থনা করুন।

মামা আমার পিঠে হাত রাখলেন। বললেন,—মন খারাপ করে লাভ নেই। যা হবার এতক্ষণে হয়ে গেছে। চল বেড়িয়ে পড়ি।

কাল দেখিনি, আমাদের তাঁবুর কাছেই এমন সুন্দর একটা ঝরনা আছে। সবুজ পাহাড়ের মাথা থেকে ফেলিল জলস্রোত নেমে আসছে।

শর্মা বললেন,—ব্যস! পানিকা প্রবলেম সলভড। জেরিকেন, বটল, লেকর পহলে পানি ভরনা হ্যায়!

সকালবেলা। নীল আকাশ। ঝকঝকে আলোয় পাহাড়-বন হাসছে। দূরে আকাশছোঁয়া হিমালয়। ঘন সবুজ পাহাড়ের জায়গায় জায়গায় খানিকটা সাদা। রাতের বরফ পড়ে আছে।

নীলকণ্ঠবাবু চুপ করে গেছেন। বিড়বিড় করে বললেন,—এমন শান্তির জায়গা। এখানেই আমাদের এতবড় ক্ষতি হয়ে গেল!

—দেখেছেন?

মস্ত বড়-বড় পদচিহ্ন। লম্বায় প্রায় আড়াই ফুট, চওড়ার দেড় ফুট। পাশাপাশি অনেক দূর চলে গেছে।

নীলকণ্ঠ অস্ফুটে বললেন,—দেখেছি। গতবার এসে এই পায়ের ছাপের ফোটো তুলেছিলুম।

সুধী শর্মা কাজে লেগে পড়েছেন। মামা বললেন,—টুকলু, পিওর ওয়াটার। চোখেমুখে ঘাড়ে দিয়ে নে।

জুতো জামা খুলছি।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল।

—মামা; একী! তোমার জ্যাকেট যে লোমে ভরতি।

—তাই নাকি? এপম্যানের লোম? রাতের ধ্বস্তাধস্তিতে উঠে এসেছে।

একটানে জ্যাকেটটা খুলে পেতে ধরলেন মামা। আদিমানবের গায়ের লোম! ভাবতেও রোমাঞ্চ হচ্ছে।

কালো-কালো, বেশ শক্ত। আঙুলের মতো লম্বা।

একটা লোম তুলে নিলেন সুধী শর্মা। কিন্তু তাঁর কপাল কুঁচকে গেল! ধীরে-ধীরে দু-দিকে মাথা নাড়তে লাগলেন।

মামা বললেন,—কী হল শর্মাজি?

—কুছ সমঝমে নেই আ রহা। ইয়ে ভালুকা লোম হ্যায়।

ভালুকের লোম! আদিমানবের গায়ে ভালুকের লোম!

—কী বলছেন? ভালুক কোত্থেকে আসবে? আমি নিজের চোখে তাকে দেখেছি। তার সঙ্গে লড়তে হয়েছে। না-না, হতেই পারে না!

—ও মুঝে নেহি মালুম। লেকিন ইয়ে জরুর ভালুকা লোম হ্যায়।

ঝরনার সামনে গুম হয়ে বসে আছেন মামা। চিবুক বাঁ-হাতের তালুতে।

সুধী শর্মা জলের বোতল, জেরিকেন ভরতি করছেন। নীলকণ্ঠ ঘোষ চশমা খুলে চোখেমুখে জল ছেটাচ্ছেন।

—মামা ও মামা?

—হুঁ।

—কী ভাবছ তখন থেকে?

—ভালুকের লোম।

—উনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।

—উনি নয়, আমরা করছি।

—মানে?

—দু-দুটো রহস্যকে আমি আলাদাভাবে সমাধান করতে চাইছিলাম। উনি দুটোকে জুড়ে দিলেন।

—তাতে কি সুবিধে হল?

—সুবিধে? হ্যাঁ তা হয়তো হল। কিন্তু আমাদের বন্ধুদের আর ফেরত পাব কি? অপরাধী প্রমাণ রাখতে চায় না। শর্মাজি। বোতলগুলো এখানে থাক। আমরা একটু ভেতরে ঢুকি।

পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল। পথও প্রায় নেই। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠছি। হাঁফ ধরে যাচ্ছে।

মাঝে-মাঝে ফাঁকা জায়গা। দু-একটা বড়-বড় পাথরের চাঁই, বড়-বড় গহ্বর।

একটা রুমাল! মামা তুলে নিয়ে বললেন,—আশ্চর্য! এখানেও মানুষ আসছে!

নীলকণ্ঠবাবু বললেন,—হয়তো কোনও ট্রেকিং পার্টি এদিকে এসেছিল।

—কখখনো নয়। চেহারা দেখুন। তকতকে পরিষ্কার। আজকালকের মধ্যে কারও পকেট থেকে পড়ে গেছে।

—তব তো হাম সহি রাস্তেমে চল রহে হ্যায়। হ্যায় না?

মনে হচ্ছে।—মামা রুমালটা দেখছেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, টুকলু দ্যাখ! এককোণে পদ্মফুল আঁকা। মনে হচ্ছে, সরোজশোভনের রুমাল!

—ডক্টর মুখার্জি, তা হলে বেঁচে আছে। তাই না?

মামা ঠোঁট ও হাত উলটোলেন।

ঝরনার একটানা ছলছল, পাখিদের বকবক এটুকুই। আর কোনও শব্দ নেই। চোখজুড়োনো রূপ নিয়ে প্রকৃতি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

খড়মড়—খড়মড়! আমরা সচকিত। একটা ঝোপ বারেবারে নড়েচড়ে উঠছে।

সুধী শর্মা রাইফেল তুলে হুংকার দিলেন, অ্যাই, হুস-হুস!

খ্যামম্যাঁচ করতে-করতে ছুঁচোল মুখো একটা জন্তু দৌড়ে পালাল।

মামা বললেন,—হায়না।

শর্মাজি ঝোপের কাছে পৌঁছে গেছেন।

—মুখার্জিসাব! আইয়ে, ইধর আইয়ে।

সকলেই ছুটে গেলাম।

ঝোপের মধ্যে একপাটি হান্টার বুট। ছিন্নভিন্ন। মনে হয়, খাদ্য ভেবে হায়েনাটা দাঁতের জোর ফলাচ্ছিল।

নীলকণ্ঠ বললেন,—এটা সরোজবাবুর। আমি কাল ওর পায়ে দেখেছি।

মামা বললেন,—এদিক দিয়েই আসুন। টুকলু তুই বাঁ-দিকে, নীলকণ্ঠবাবু আপনি ডানদিকে নজর রাখুন। শর্মাজি, আপনি সবার পিছনে। তৈরি থাকবেন।

জগুমামা হাঁটতে শুরু করেছেন।

মামার সন্দেহ মিলে যাচ্ছে। কিছু-কিছু লতাগাছ ঝোপ দুমড়ে-মুচড়ে রয়েছে। কোনও ভারী জিনিস এখান দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—ডক্টর মুখার্জি, দেখুন! ওই জুতোর আরেক পার্টি।

মামা একটু দেখলেন। আবার পা চালালেন।

অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। ঝরনা বেশ নীচে। তাঁবুর জায়গা পুতুলের ঘরবাড়ির মতো লাগছে।

চাতালের মতো ন্যাড়া জায়গা। বড় ক্লান্ত লাগছে। সূর্য ঠিক মাথায়। নীলকণ্ঠবাবু প্রায় এলিয়ে পড়েছেন। মামার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

নীলকণ্ঠবাবু চিঁচিঁ করে বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, একটু কিছু খেয়ে নিলে হত না?

—বেশ। শর্মাজি, থোড়া রুক যাইয়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে পাথুরে জমির ওপর লম্বা হয়ে পড়লেন নীলকণ্ঠ।

—খুব টায়ার্ড লাগছে?

—টায়ার্ড? উফ! শর্মা তো ফৌজি। তোমার মামাও কী মিলিটারি ট্রেনিং নিয়েছেন? সায়েন্টিস্ট বলতে এত কাল জানতুম দুবলাসুবলা লোক! বাপরে! জান বের করে দিয়েছে।

জগুমামার সত্যি অফুরন্ত এনার্জি। আমার অবস্থাও কিছু ভালো নয়। আধশোয়া হয়ে শ্বাস নিচ্ছি ভসভস করে। এত উঁচুতে বাতাস পাতলা, অক্সিজেন কম।

সুধী শর্মা আর জগুমামা চাতালে ঘুরছেন। পাথরের বোল্ডারের উপর দাঁড়িয়ে দূরবিন তুলে দেখছেন।

মিনিট দশেক হয়েছে। হঠাৎ জগুমামার গলা, শর্মাজি! জলদি ইধর আইয়ে!

চটকা ভেঙে গেছে। আবার কী হল?

আমাদের ঠিক কোনাকুনি পাহাড়ের ঢালে হেলান দেওয়া একটা বড় পাথর। তার সামনে দাঁড়িয়ে মামা ইশারায় সুধী শর্মাকে কিছু দেখাচ্ছেন।

কাছে গিয়ে শুনি মামা বলছেন,—এর গায়ে কান পেতে শুনুন, একটা শব্দ হচ্ছে না?

তাই তো! একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে।

হচ্ছে, আবার থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। তবে কি এই বোল্ডারের নীচে কোনও গহ্বর আছে? গোঙানি কি মানুষের, না কোনও বন্য জন্তুর?

হতে পারে, গুহার অন্যদিক দিয়ে ঢোকার রাস্তা আছে। সেদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকে বিশ্রাম নিচ্ছে কোনও নিশাচর চতুষ্পদ। এটা তারই আস্তানা। সঙ্গে ছানাপোনাও থাকতে পারে। 'মা' জানোয়ার বড় হিংস্র, বাচ্চাদের বাঁচাতে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মামা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। একটু পরে বললেন,—ঝুঁকি নিতে হবে। শর্মাজি, আপনি রাইফেল 'অন' করে বাঁয়ে পজিশন নিন। আমি ডাইনে দাঁড়াচ্ছি। টুকলু, তোমরা দুজনে চেষ্টা করে দ্যাখো, পাথর সরাতে পারো কি না।

উরেব্বাপ! কী ভারী। দুজনে দরদর করে ঘেমে গেলাম, বোল্ডারটা একচুল নড়ল না।

—না: আমাদেরও হাত লাগাতে হবে শর্মাজি, আসুন।

হচ্ছে, হচ্ছে! এবার নড়ছে। হেঁইয়ো—হেঁইয়ো! পাথরটা ঠেলে দিয়েই একদিকে সরে গেলেন সুধী শর্মা, অন্যদিকে জগুমামা।

টলমল করতে-করতে পাথরটা একটু গড়িয়ে গেল। গুহার মুখ খুলে গেছে।

সবাই রেডি। রুদ্ধশ্বাস। এবার কী কোনও জন্তু বেরোবে?

দপ-দপ করে কেটে যাচ্ছে মুহূর্ত। নাহ, কেউ বেরোল না।

সুধী শর্মা মামাকে ইশারা করলেন। মামা মাথা কাত করলেন। গেরিলা ফাইটারদের মতো ডানদিকে পায়ে-পায়ে সরলেন শর্মা। মুখটা কাত করলেন গুহার মধ্যে!

তার পরেই চেঁচিয়ে উঠলেন,—ডক্টর মুখার্জি!

১৪

লম্বা সুড়ঙ্গের মতো গুহা। কতদূর বিস্তৃত কে জানে। তারই মধ্যে হাত দশেক দূরে পড়ে আছে একটি মানুষ। তাকে চেনামাত্র আঁতকে উঠেছি।

সরোজশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভদ্রলোকের হাত-পা বোধহয় পিছমোড়া করে বাঁধা। একটা পুটলির মতো ফেলে রাখা হয়েছে। কেবল মুখটা খোলা। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে গোঙানি।

সুধী শর্মা প্রস্তুত। নাইলনের দড়ি প্যান্টের বেল্টে বেঁধে দড়ির অন্যপ্রান্ত আমাদের হাতে দিয়ে উনি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলেন গুহার ভিতরে।

যত দেখছি, তত অভিভূত হয়ে যাচ্ছি। এই মানুষটা না থাকলে কী যে হত আমাদের।

সরোজশোভনকে বের করে আনতে মিনিট দশেক লাগল।

ওঁর জ্ঞান ফিরল আরও আধঘণ্টা পরে। জলের ছিটে, স্মেলিং সল্ট, দু-চামচ তরল...পরপর প্রয়োগ করার পর উনি চোখ মেললেন।

আমরা ওঁর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছি। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে দেখতে সরোজশোভন বললেন,—আমি...কোথায়?

—আমাদের কাছে।

—বাট দোজ এপস...দ্যাট হরিবল কেভ...আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে...

—আমরা উঠিয়ে নিয়ে এসেছি।

এতক্ষণে বাস্তবে ফিরে এলেন সরোজশোভন। দুহাতে ভর দিয়ে আস্তে-আস্তে উঠে বসলেন। তাকালেন রোদ ঝলমল পাহাড়, বনের দিকে। তারপর বললেন,—আ:—আমি বেঁচে আছি! এখনও ভাবতে পারছি না। কাল রাতে যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, কী উল্লাস ওদের!

—কাদের? ওই আদিম মানুষগুলোর?

—হ্যাঁ, একটা নয়, দু-দুটো! ডক্টর মুখার্জির খোঁজে আপনারা বেরিয়ে যাবার পরপরই ওরা দাপাতে-দাপাতে ঢুকল। তাঁবু ছিড়ে লণ্ডভণ্ড করে ওরা এসে দাঁড়াতে অনিমেষ সেন্সলেস! আমি তবু খালি হাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এত শক্তি! এমন মারল—উ:!

চুপ করে গেলেন সরোজশোভন।

—তারপর?

—নাহ, ভাবছি, এপম্যান দুটোর হাতে মার খেয়ে আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। মাঝে-মাঝে সেন্স ফিরে আসছিল। এখন আবছা মনে পড়ছে, ওরা আমায় ঘাড়ে ফেলে নিয়ে যাচ্ছিল। যেতে-যেতে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

—কথা বলছিল! মানুষের ভাষায়?

—ইয়েস। দ্যাটস স্ট্রেঞ্জ! হিন্দিতে বলছিল।

—হিন্দিতে? কী বলছেন? ও দুটো তা হলে নর্মাল মানুষ?

—নো-নো নেভার। ইটস ইমপসিবল টুকলু। পিওর এপ ম্যান! সারা গা লোমে ঢাকা। কুতকুতে চোখ, ঠেলে বের হওয়া হনু ছ'ফুটের ওপর লম্বা।

জগুমা বললেন,—বুঝেছি। আপনি একটু রেস্ট নিন।

—কিন্তু অনি, অনিমেষ? ওকে খুঁজে বের করবেন না?

—নিশ্চয়ই করব। ও নিয়ে ভাববেন না। 'বড় পায়ে'-র খোঁজ প্রায় পেয়ে গেছি।

—পেয়ে গেছ, মামা? প্লিজ, সবটা খুলে বলো।

—আরে পাগল, হাত ছাড়। এতদিন অপেক্ষা করলি, আরেকটু সবুর কর। চলুন, এবার পেটে দেওয়া যাক। নীলকণ্ঠবাবু কী বলেন?

—যা বলেছেন! আমার পেটে তো দক্ষযজ্ঞ চলছে।

বাসি স্যান্ডুইচ। তার সঙ্গে কিছু শুকনো ফল। প্রবল খিদের মুখে মনে হচ্ছে অমৃত।

—মামাও খাচ্ছেন। আর মাটিতে কী সব আঁকিবুকি কাটছেন। একটু পরে বললেন,—আজকের রাত আমাদের অভিযানের সবচেয়ে ভাইটাল এপিসোড। এই 'বড় পায়ে'-র পিছনে যেসব মানুষের কালো হাত লুকিয়ে আছে, তাদের ধরতে হবে। তাই কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

একটু থেমে বললেন,—যেখানে এসএস বন্দি ছিলেন, সেই গুহায় ঢুকতে হবে।

—সে কী!

—হ্যাঁ, আমি ঢুকব। শর্মাজি, টুকলু, নীলকণ্ঠবাবু, এসএস, আপনারা কাছাকাছি উঁচু গাছে চড়ে বসবেন। সব পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৈরি থাকবেন।

—তার মানে, শিকার করার সময় যেমন টোপ দেওয়া হয়, তুমি সেই টোপ হয়ে বসে থাকবে?

—রাইট। তফাত শুধু, আমি নিরস্ত্র থাকছি না। এ ছাড়া হাতেনাতে ধরার কোনও পথ নেই।

—বুঝলাম। তবে একটা নয়, দুটো 'টোপ' থাকবে।

—মানে?

—মামা-ভাগ্নে।

আমার কথা শুনে মামা চুপ করে গেলেন। কোনও প্রতিবাদ করলেন না।

সরোজশোভনের দুই হাত আমার আর নীলকণ্ঠবাবুর কাঁধে। আমরা ফের গুহার দিকে উঠতে শুরু করেছি।

পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে। সূর্য দ্রুত ছুটছে পশ্চিমে।

গুহার পিছনের জমিতে একটা হুক শক্ত করে পুঁতলেন সুধী শর্মা। সেখানে নাইলনের 'রোপ' লাগিয়ে অন্যদিক আমাদের শরীরে। আমার হাতে টর্চ।

দুজনে গুড়ি মেরে ঢুকে পড়লাম গুহার ভিতরে।

১৫

গুহাটা নীচের দিকে যত ঢালু হয়ে গেছে, ততই সঙ্কীর্ণ হয়েছে। যেখানটায় গুড়িসুড়ি মেরে পড়ে আছি, তা মানুষের চেহারার কোনও প্রাণীর প্রায় অগম্য।

ভিতরে কয়লার মতো অন্ধকার। মামা আমার নীচে। আমার শরীরের সম্পূর্ণ ভার ওঁর ওপর। উপায় নেই।

কিন্তু জগুমামার মুখে টুঁ শব্দ নেই। ডানহাতে রিভলভার ধরে উনি মড়ার মতো পড়ে আছেন।

অস্বস্তিতে আমি উসখুস করে উঠেছি। মামা ধমক দিয়েছেন, চুপ করে থাক। আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

বাইরে রাত ঝিমঝিম করছে। শীতও বাড়ছে। এই সুরঙ্গের মধ্যে মাঝে-মাঝে এসে ঝাপটা মারছে বরফ বাতাস, শরীরের ফাঁকা জায়গায় বিঁধছে।

মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে চতুস্পদ নিশাচরদের বিচিত্র সব আওয়াজ। স্তব্ধতা চিরে যাচ্ছে।

দু-একটা জ্বলজ্বলে জোড়া চোখ কখনও উঁকি মারছে গুহামুখে। কোন প্রাণী জানি না। মামা রিভলভার তাক করছেন। আবার সরে যাচ্ছে।

—মামা, শিকার আসবে তো?

—আশা তো করছি। অন্তত সরোজশোভনকে ওদের সর্দারের কাছে নিয়ে যাবার জন্যেও ওদের আসতে হবে। তবে বস যদি কোনও আঁচ পেয়ে থাকে তা হলে অবশ্য—। টুকলু, সিগারেটে দু-একটা টান দিলে তোর কি খুব অসুবিধে হবে?

—না-না, খাও। কিন্তু খাবে কী করে?

মামা খুব কসরত করে বাঁ-হাত আমার শরীরের তলা দিয়ে বের করলেন। রিভলভারটা আমার বুকে শুইয়ে ডানহাতে লাইটারে আগুন জ্বালালেন। তারপর ফের রিভলভার উঠে এল ওঁর ডানহাতে।

অন্যরাও নিশ্চয়ই দম আটকে বসে আছেন গাছের উপরে। দুশ্চিন্তা একমাত্র নীলকণ্ঠ ঘোষকে নিয়ে। মানুষটি এমনিতে চমৎকার, কিন্তু বয়স অনুপাতে ছেলেমানুষ। যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের ঢুলে গাছ থেকে যদি পড়ে যান, তা হলে সর্বনাশ।

নি:শব্দে সময় বয়ে চলেছে। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটা পেরোচ্ছে। আর কতক্ষণ?

একভাবে পড়ে থাকতে-থাকতে আমি নিজেই তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছিলাম। পেটের ওপর রিভলভারের খোঁচা আর কানের কাছে মামার ফিসফিসানি,—টুকলু!

গুহার মুখে আলোটুকু নেই। অন্ধকার দুটো ছায়া।

কথা ভেসে এল হিন্দিতে,—ওস্তাদ, কোনও সাড়াশব্দ নেই। মালটা টেঁসে গেল নাকি? অ্যাই, কওন হ্যায়?

সঙ্গে-সঙ্গে আমি বন্দি সরোজশোভনের কায়দায় পা-মাথা এক করে পুঁটলির মতো হয়ে গেলাম। মামা আমার নীচে, অদৃশ্য।

অন্য কণ্ঠ বলল,—ফালতু চিল্লাতা কিঁউরে? টর্চ জ্বাল। দেখ, পঞ্ছি উড় গয়া ক্যায়া?

বুদ্ধু কাঁহিকা! হাত-পা বাঁধা। দড়ি ছাড়া উপরে উঠবে কী করে?

—টর্চের ফোকাস এসে পড়ল আমার গায়ে, দেখ। বেহোশ পড়া হ্যায়।

—নে, জলদি নেমে পড়।

—না বস! আগেরবার আমি নেমেছি। এবার তুমি।

—ইল্লি আর কি! বাজে বকিস না। দড়ি তোর কোমরে বাঁধা আছে।

নামছে! একটা নেমে আসছে! বুকের মধ্যে হাপরের মতো ওঠানামা করছে।

কানের কাছে মামার মুখ,—তোকে জাপটে না ধরা অবধি কিছু করবি না!

অল্প আলো সুড়ঙ্গের মধ্যে। জ্বলন্ত টর্চটাকে কোনও খাঁজে গুঁজে দেওয়া হয়েছে।

স্টপ ওয়াচ এর শব্দ শুনতে পাচ্ছি মগজের মধ্যে! ত্রিশ...উনত্রিশ...আঠাশ...সাতাশ...

লোকটার ডানহাত আমার শরীর স্পর্শ করল। তারপর ঢুকে গেল পেটের নীচে।

সঙ্গে সঙ্গে নিথর নৈ:শব্দ্য ভেঙে খানখান হয়ে গেল। গুড়ুম!

মামার রিভলভার অগ্নিবর্ষণ করেছে। টর্চ চুরমার। আবার অন্ধকার।

উপর থেকে শব্দ ভেসে এল, ধুপ-ধাপ...। সঙ্গীরা নেমে পড়েছে।

পরের কয়েক মুহূর্তের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

—অসম্ভব সরু জায়গায় অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বেধড়ক কিল ঘুঁষি। লোকটা এত ঘাবড়ে গেছিল যে, কিছুই করতে পারছিল না।

জগুমামাও গুহার একটা খাঁজ আঁকড়ে ধরে বেধড়ক লাথি চালাতে শুরু করেছেন। তবে দু-একটা আমার গায়েও এসে লাগছে।

যন্ত্রণার আওয়াজ করতে-করতে লোকটা নেতিয়ে পড়েছে। জগুমামা বললেন,—তুমহারা খেল খতম! হামলোগ দো হ্যায়। অর রিভলভার ভি হ্যায়।

এই সময়ে গুহা মুখে আবার টর্চ জ্বলে উঠল। সুধী শর্মা বলছেন,—মুখার্জিসাব! একঠো পাকড়া গয়া। আপ সব ঠিক হ্যায় তো?

—হ্যাঁ! আমরাও একটাকে ধরেছি। উপরেরটাকে ভালো করে বেঁধে ফেলুন। তারপর দড়িটা টানুন। এটাকে নিয়ে এবার উঠি।

উফ! হাতে পায়ে খিল ধরে গেছিল। মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে প্রাণভরে শ্বাস টানলাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু জগিং করলাম।

দুটোরই হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়েছে। মামা হিন্দিতে বললেন,—বা:! বেশ ভালোই চালাচ্ছিলে। ভালুকের চামড়ায় ঢেকে এপ ম্যান। তোমাদের হেড কোথায়?

দুজন মাথা নীচু করে আছে। কোনও উত্তর দেয় না।

বুঝেছি। সোজা কথায় কাজ হবে না!—জগুমামা রিভলভার ঠেকালেন একজনের কানে। কঠিনগলায় বললেন,—কী, জবাব দেবে?

—আমার কুছু জানি না। আমরা অ্যায়সেই—

এই ফাঁকা মাঠে অ্যাক্টিং করছিলে, কেমন?—আগুন চোখে জগুমামা বললেন, ঠিক তিন গুনব। তার মধ্যে উওর না পেলে, প্রথমে তোমায়, তারপর তোমার দোস্তকে...ফিনিশ। তিন গুনছি...এক...দু...

—বলছি, বলছি স্যার। আমরা স্যার কনট্যাকে এসেছি। এখানে যাতে কেউ আর না আসে, সেই জন্যে ভয় দেখাতে।

—তাতে যদি কেউ মরেও যায়, যাক না! তোমাদের কর্তার কাছে নিয়ে চলো। আলাপ করব।

দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। জগুমামা স্থিরচোখে তাকিয়ে আছেন। একজন বলল, —উনি তো স্যার এখানে নেই!

—ফের ঝুট বাত! লাস্ট চান্স!

গু-ড়ু-ম! মামার রিভলভার শূন্যে গর্জন করল!

দুটো বিশাল দেহী কাঁপতে শুরু করেছে।

এখান থেকে অনেকটা পথ স্যার। মৈনানে ঢোকার একটু আগে।

—আমাদের সঙ্গে জিপ আছে। নীলকণ্ঠবাবু। দড়ি টেনে দুটোকে নিয়ে চলুন।

১৬

জিপের পেছনের একদিকের সিটে হাত-পা বেঁধে 'এপম্যান' দুটোকে বসানো হয়েছে। দড়ি ধরে নীলকণ্ঠ ঘোষ।

এতক্ষণ উত্তেজনায় পারিপাশ্বির্ক অবস্থা ভুলে ছিলাম। জিপ স্টার্ট দিতে কনকনে বাতাস তেরপলের ফাঁকফোঁকর দিয়ে ঢুকতে লাগল।

ঘড়িতে প্রায় বারোটা। হেডলাইট জ্বেলে এবড়ো-খেবড়ো জমি বেয়ে জিপ নামছে।

—কী হে, ঠিক যাচ্ছি তো?

একটা ঝুঁকে তাকাল সামনের কাচ দিয়ে। বলল,—জি স্যার। সামনেই বাঁ-দিকে দুটো পাহাড়ের একটা খাঁজ পড়বে। একটু এগোলেই ক্যাম্প।

—ওখানে তোমাদের সর্দারকে পাওয়া যাবে তো?

—পাবার কথা স্যার। উনিই আমাদের পাঠালেন, লোকটাকে তুলে নিয়ে যেতে।

—তোমরা কোথাকার লোক?

—স্যার, নেপালের পোখরা। এত্তেলা দিলে আসি।

—বা:! আইডিয়াল ভাড়াটে গুন্ডা কাম বহুরূপী!

জিপ বাঁকের ঠিক মুখে এসে পড়েছে। মামা বললেন,—শর্মাজি, হেডলাইট নেভান, স্টার্ট বন্ধ করুন।

—নীলকণ্ঠবাবু, আপনি এ দুটোর পাহারায় থাকুন। আমরা আসছি।

সুধী শর্মার হাতে রাইফেল, মামার হাতে রিভলভার, আমার হাতে টর্চ। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি।

—মুখার্জিসাব, দেখিয়ে! শায়দ উ হ্যায়।

নক্ষত্রের হালকা আলোয় দেখা গেল, সাদা তাঁবু।

পা টিপে-টিপে এগোচ্ছি।

হঠাৎ বিপত্তি ঘটে গেল। আমার স্নোবুটের ডগা একটা প্রমাণ সাইজের নুড়িতে লাগতেই সেটা গড়াতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

গুব...গুর...গুর...শব্দটা বাড়তে-বাড়তে খাদে পড়ে মিলিয়ে গেল।

সামান্য শব্দটা অসামান্য হয়ে উঠল পিন-পড়া নৈ:শব্দের মাঝে।

তাঁবু ফাঁক হয়ে গেল। জ্বলন্ত টর্চ হাতে বাইরে বেরিয়ে এল তিনটে ছায়ামূর্তি।

—কওন...কওন হ্যায়? রমেশ—?

হাঁ জি!—উপস্থিত বুদ্ধিতে দারুন জবাব দিলেন সুধী শর্মা।

—উসকো লায়া?

—হাঁ জি।

—ঠিক হ্যায়। অন্দর লাও।

ছায়ামূর্তি তিনটে ভেতরে ঢুকে গেল।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। মামা বললেন,—শর্মাজি, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব।

—কোই বাত নেহি স্যার। আব কেয়া করু?

—আমার ধারণা, ওদের কাছে আর্মস আছে! সংঘর্ষ এড়াতে আমাদের আরেকটু অভিনয় করতে হবে। চোখমুখ যতটা সম্ভব ঢেকে টুকলুকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আমরা ঢুকে যবে তাঁবুর মধ্যে।

অতএব শূন্যে উঠেছি আমি। মামা এবং শর্মাজির হাতে চিত হয়ে চলেছি তাঁবুর দিকে। বুকের মধ্যে ড্রাম বাজছে...এরপর?

আমাকে নিয়ে সটান ঢুকে গেলেন তাঁবুর মধ্যে। তাঁবুর ভিতরে মিটমিটে আলো।

লিজিয়ে সাব। শর্মাজি আমায় জমিতে শুইয়ে বললেন, পুরা বেহোশ হ্যায়।

পরমুহূর্তে সুধী শর্মার হাতে উঠে এল রাইফেল। জগুমামার হাতে রিভলভার।

—হ্যান্ডস আপ!

আমি উঠে বসে যাঁদের হতভম্ব হতে দেখলাম, তাদের সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না।

যুবকটিকে আগে দেখেছি, মৈনান আসার পথে। কুলিদের দিয়ে 'শিলাজুত' লরিতে ওঠাচ্ছিল।

বাকি দুজনের একজন, নিহত সুবোধ ভাণ্ডারির প্রাণের বন্ধু ও পার্টনার বীরেন্দ্র গুরুং! অন্যজন অধ্যাপক অনিমেষ মণ্ডল!

হাতে রিভলভার, অন্যজনের হাতে রাইফেল। তাই বাঁধাবাঁধির অপ্রিয় কাজ আমাকেই করতে হল।

তিনজনকে পিছমোড়া করে আগাপাস্তালা বেঁধে ফেলার পর উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র দুটো নীচু হল। জগুমামা বললেন,—চমৎকার! বাইরে এত ঠান্ডা অথচ তাঁবুর ভেতরটা কেমন উষ্ণ।

—হাঁ সার। হামারা আর্মিমে অ্যায়সা ক্যাম্প দো চারঠো হ্যায়। বড় অফসরকে লিয়ে। জেনরেটরসে ইনটারন্যাল হিটিং সিস্টেম চলতা।

তাই। ঢোকার পর থেকে মৃদু 'স-স-স' শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। এককোণে ইলেকট্রিক ল্যাম্পও জ্বলছে।

—তা গুরুং সাব, শেষ অবধি বড় পায়ের খোঁজ পাওয়া গেল। আর ডক্টর মণ্ডল, আপনি তো 'কালিদাস' মশাই। নিজের ডাল নিজেই কাটলেন। বেশ তো চোরাকারবার চলছিল! নিজেদের কেরামতি দেখাতে কেন যে খামোকা ফোটোগুলো বন্ধুকে পাঠাতে গেলেন?

মাথা নীচু করে থাকা দুজনের কেউই উত্তর দিলেন না।

—মামা, এবার বলো, প্লিজ।

বাব্বা! তুই একেবারে উদব্যস্ত হয়ে উঠেছিস। মামা আয়েস করে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন,—এই মহাপ্রভুদের হিসেব একেবারে জলবৎ তরলং। শিলাজুত দেখেছিস তো? এই বনপাহাড়ে আরেকটা গাছও আকছার জন্মায়। তার শুকনো ডালপালা কালচে রঙের, অবিকল শিলাজুতোর মতো দেখতে। বস্তুটা কী জানিস? হাসিস! ভয়ংকর মাদক। মৈনান আসার পথে ওই ছোকরা কুলিদের দিয়ে পাহাড় থেকে সেগুলোই তোলাচ্ছিল। শিলাজুতের সঙ্গে তার দামের ফারাকও আকাশপাতাল। একবস্তা হাসিস-এর দাম কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা! বেশ কিছুকাল ধরে এই স্পেশাল শিলাজুত টনকে-টন পাচার হয়ে যাচ্ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

—বলো কী!

—এটাই ঘটনা। এই নকলি শিলাজুতের কারবারের বুদ্ধি এসেছিল...না, বীরেন্দ্রর মাথা থেকে নয়, ওরই ক্লাসমেট বেঁটে প্রফেসারটার মাথা থেকে। যে নাকি কলেজের ছাত্র পড়ায়, দেশের ভবিষ্যৎ তৈরি করে। কী মণ্ডল, ঠিক বলছি? নইলে আপনাকে এরা কারবারে পার্টনার করবে কেন?

অনিমেষ মণ্ডলের ঘাড় ঝুলে পড়েছে। মামা বলে চলেছেন,—হ্যাঁ, মণ্ডলের পরামর্শে বীরেন্দ্র এই কারবারে নেমে পড়ল। চিফ মিনিস্টারের ভাই রয়েছে সঙ্গে, অতএব সুবিধে অনেক। সহজে কেউ ঘাঁটাবে না। আর লোকজন যাতে এ তল্লাট না মাড়ায়, সেজন্য ভাড়া করা হল দুটো 'এপ ম্যান'। তাদের দিয়ে আতঙ্ক

ছড়াতে হবে। মণ্ডল, আপনার বন্ধুদের নিয়ে ট্রেকিং করতে আসা এবং এপ ম্যানের সামনে পড়া অবধি ঠিকই ছিল। মখে-মুখে ব্যাপারটা এমন ছড়িয়ে গেছিল, পাহাড়ি আদিবাসীরাও এদিক আর মাড়াত না। গণ্ডগোলটা হল অতি উৎসাহে বন্ধুকে ফুটপ্রিন্টের ফটো পাঠিয়ে। আমরা এসে গেলাম। তখন উলটে আমাদের জঙ্গলে ঢোকা ঠেকাতে কিডন্যাপ, আহত এসবের নাটক বানাতে হল।

—নাটক?

—হ্যাঁ। আমাদের যাত্রাভঙ্গ করতে ওকে নিজের ঘাড়ে নিজেকেই কাটারির কোপ মারতে হল।

—সে কী? নিজেই নিজেকে!

—হ্যাঁ। ক্ষতের গভীরতা থেকে এটা বোঝা যায়। নিজের ডানহাত দিয়ে বাঁ-ঘাড়ে কোপ মারলে উন্ড-এর ডেপথ এবং লেনথ যতটা হবে, অন্য কেউ কাটারি মারলে কখনও তেমন হবে না। এই ধরনের ঘটনা আকছার ঘটে। শত্রুর ঘাড়ে দোষ চাপাতে নিজেই নিজেকে মেরে থানায় চলে আসে। তোর মনে আছে, টর্চের আলোয় ক্ষতটা দেখার পর ওই রাতে আমি খুঁজে বের করি কাটারিটা। সেই রাতেই আমি সিওর হয়ে যাই, অনিমেষ মণ্ডল কোনও চক্রান্তে জড়িত। সে জন্যেই সরোজশোভনকে ওর পাহারায় রেখে আমরা পরদিন স্টার্ট করি রাবাংলা থেকে।

—হ্যাঁ। নিষেধ না মেনে তারপরে দুজনে এখানে চলে আসেন। ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি। কিন্তু ওদের মেন পার্টনার সুবোধ ভাণ্ডারির খুন?

—সুবোধের মার্ডার আমাদের সঙ্গে একটু জড়িত। আমরা না এলেও সুবোধকে ঠিক মরতে হত। হয়তো কিছুদিন পরে। একটাই কারণ, সুবোধ এই নোংরা চোরাকারবারে থাকতে চায়নি। ওদের থামাতে চেয়েছিল। বলেছিল, এই পাপ-ব্যাবসা বন্ধ না করলে সরকারকে জানিয়ে দেবে। ন্যাচারালি, এই দুজন তখন মরিয়া। এমন সোনার ব্যাবসা, আয়াসে কোটি-কোটি টাকা আমদানি ছেড়ে দেব! ইতিমধ্যে আমরা এসে গেছি রাবাংলায়। ওই সময়ে সুবোধকে সরিয়ে দিতে পারলে, আমরা যদি ভয়ে অভিযান বন্ধ করে দিই, সেটা বাড়তি লাভ।

—বে-চা-রি! তোমায় চিনতে পারেনি। কিন্তু ভাণ্ডারিকে খুন করল কে?

—এই বীরেন্দ্র গুরুং। নিজের রিভলভার দিয়ে। সুবোধবাবুর বাংলোয় রাতে ঢুকে কাগজপত্র ছাড়াও মেঝেতে কুড়িয়ে পাই একটা বিশেষ কারুকাজ করা নেপালি টুপি। তার বাঁ-কোণে সূক্ষ্ম সুতোয় লেখা 'বীরেন্দ্র'। এরপর বীরেন্দ্রর মাথার টুপির নকশাও গেল বদলে।

—লেকিন এক বাত মুখার্জিসাব। বিজনেস মে সুবোধ ভাণ্ডারি সে গুরুং অর মণ্ডলকা ইয়েসব ঝনঝাটকি বারেমে আপকো ক্যায়সে মালুম হুয়া?

—সুবোধ ভাণ্ডারির ওই বাংলো থেকে জোগাড় করা কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে। ভান্ডারির অদ্ভুত অভ্যেস ছিল। ওর মনে যখন যা ধাক্কা দিত, কাগজের ফাঁকা জায়গায় খস-খস করে লিখে ফেলত। নানান ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক ব্যাপার এভাবে লেখা রয়েছে। এর মধ্যে দু-জায়গায় আমি দেখেছি—শিলাজুত নেহি... নেহি...হাসিস...খতরনাক...বীরু...নেহি নেহি...মত করনা গলত কাম। আমার আরেক জায়গায় লিখেছে—শালে বীরু, চুহা কাঁহিকা। হামকো থ্রেট করতা...মণ্ডল...মণ্ডল শালে চোর...নেহি ছোড়েগা!

—বড়া তাজ্জুব।

—আরেকটা ব্যাপার মামা, রাতে বাংলোয় নীল সাদা জ্যাকেট পরা লোকটা?

—ও-ও তো এই মক্কেল! গুরুং। আমাদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল।

—মুখার্জিসাব! হম কিসি সায়েন্টিস্টকো ক্রিমিনাল সাইকোলজিমে ইতনা ক্লিয়ার কনসেপশন কভভি নেহি দেখা।

—আমার তদন্তে আপনার অবদানও কিন্তু কম নয় শর্মাজি। শিলাজুত ওরফে হাসিস চোরাচালানের ব্যাপারটা ধরতে পারলেও এপম্যানের ব্যাপারটা যে ওর সঙ্গে রিলেটেড, তা কিন্তু আমি ধরতে পারিনি। আপনিই বুঝিয়ে দিলেন।

—তোমার কোটে লেগে থাকা লোমকে ভালুকের লোম বলে, তাই তো?

—একজ্যাক্টলি। উনি যে মুহূর্তে ফার্মলি বললেন, সঙ্গে-সঙ্গে ঘটনাগুলো সুতোয় গাঁথা হয়ে গেল। তখন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছিলাম। হয়তো সরোজশোভনকে ওরা মেরেই ফেলেছে। এদের কাছে, দু-চারটে খুন কোনও ব্যাপার নয়।

বলতে-বলতে, মামার দু-চোখ আবার জ্বলে উঠেছে।

—মুখার্জিসাব, আব কেয়া করনা?

এখন জিপে এ তিনটেকে তুলে, রাবাংলার দিকে রওনা হব। আপনি এদের পেছনে থাকবেন, আমরা থাকব সামনে।

কিন্তু মিনিট দুয়েক পরে আচমকা যে ঘটনা ঘটে গেল, তা কল্পনাতীত বললেও কম বলা হয়।

সামনে মামা, আমি, পিছনে সুধী শর্মা। মধ্যে ওই তিনজন। তাঁবু থেকে বেরিয়ে হাঁটছি। তাঁবু সার্চ করে পাওয়া গেছে একটা একে ফরটিসেভেন রাইফেল। সেটা আমার হাতে।

মাত্র কুড়ি গজ মতন এগিয়েছি, হঠাৎ কানে এল একটা গুরগুর শব্দ। সেকেন্ডে-সেকেন্ডে সেই শব্দটা ভীষণ বেড়ে গেল। তার পরেই কান ফাটানো শব্দ! বিরাট আকারের একটা পাথরের চাঁই গোলার মতো ছিটকে নেমে গেল আমাদের পিছন দিকে।

খুব বেশি হলে দশ সেকেন্ড।

তিনটে অস্ফুট আর্তনাদ উঠেই মিলিয়ে গেল বোল্ডার খাদে পড়ার গর্জনের মধ্যে।

পিছন ফিরে দেখলাম, সুধী শর্মা বিমূঢ় দাঁড়িয়ে। ঠিক মাঝখান ফাঁকা বন্দি তিনজন নেই!

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিহ্বলতা কাটিয়ে মামা দ্রুত টর্চ ফেললেন বাঁ-দিকের উঁচু পাহাড়ের দিকে।

কোথাও কেউ নেই।

আপনা-আপনি অতবড় পাহাড় থেকে পাথরটা গড়িয়ে নামল আর ঠিক মাঝখানের তিনজনকেই শেষ করে চলে গেল?

এ অবিশ্বাস্য, অসম্ভব।

আমার প্রশ্নেরই যেন জবাব দিলেন সুধী শর্মা। কাঁপা-কাঁপা গলায় উনি বললেন,—জলদি-জলদি চলিয়ে। ইয়ে জাগা। আভি ছোড়না হোগা। দেও কো বহোৎ গুসসা হুয়া। চালিয়ে...।

বলেই অত সাহসী জওয়ান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন জিপের দিকে।

মামা বললেন,—শর্মাজি, থামুন। এটা অ্যাকসিডেন্ট। আলগা কোনও পাথর লেগে ছিল পাহাড়ের ঢালে। এসব পাহাড়ি এলাকায় যখন-তখন ভূকম্প হয়। সেরকমই কাঁপুনিতে গড়িয়ে পড়েছে।...

কে শোনে কার কথা! সুধী শর্মার ছোটার গতি আরও বেড়ে গেল। কপালে করজোড়ে হাত ঠুকতে-ঠুকতে উনি বলে চললেন,—রাম রাম, পরণাম দেও! শুনিয়ে মুখার্জিসাব, আপলোগকো যো শোচনা হ্যায় শোচিয়ে। ম্যায় ইঁহা একমিনিট ভি নেহি রুকেগা।

অগত্যা আমরাও জিপের দিকে ছুটলাম। মাথাটাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবার সময় নেই। উনি যেমন খেপে গেছেন, আমাদের ফেলে রেখেই না জিপ চালিয়ে দেন। বিশ্বাস অতি বিষম বস্তু।

জানুয়ারি ১৯৯৩

নীল কাঁকড়ার রহস্য

১

এবার আবহাওয়ার খবর। উপগ্রহ মারফত দেখা গেছে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্থানে- স্থানে বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার হয়েছে। এর ফলে আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম ও উড়িষ্যার উপকূলবর্তী এলাকায় বজ্রপাতসহ প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।...

টিভিতে সন্ধে সাড়ে সাতটার সংবাদ শেষ হচ্ছে। বাইরে ঝমঝমে বৃষ্টি। আকাশে চমকে-চমকে উঠছে চোখধাঁধানো বিদ্যুৎ। সঙ্গে মেঘের গর্জন।

মা বললেন,—এত বৃষ্টি! জগু এখনও ফিরল না?

মায়ের কথা শেষ হল না। জানলার কাচে তীব্র আলোর ঝলকানি, গাড়ির হর্ন এবং কলিংবেলের শব্দ।

পিকলু দরজা খুলে দিল। জগুমামা ভিজে চুপচুপে। বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে বললেন,—আজকের বাংলা কাগজটা চাই। একটা খবর চোখ এড়িয়ে গেছে।

প্রায় পনেরো দিন হল জগুমামা ছুটি কাটাতে এসেছেন কলকাতায়। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফোর্থ ইয়ারের পরীক্ষা দিয়ে আমিও এসেছি বাড়িতে।

সুতরাং সোনায় সোহাগা। স্বপ্নের মতো কাটছে দিনগুলো। পিকলু বেচারি সত্যিই অভাগা। কোনওকালেই মামার কলকাতায় থাকার সুযোগ নিতে পারে না। এবারেও ওর হায়ার সেকেন্ডারি। ব্যাজার মুখে বই নিয়ে বসে আছে।

কয়েকদিন পর আজ প্রথম আমাদের দুজনের প্রোগ্রাম আলাদা হয়ে গেছিল। আমার বন্ধু রথীন এসেছিল। তাই মামা বিকেল চারটে নাগাদ একাই বেরিয়ে গেছিলেন।

কাগজ নিয়ে মামার ঘরে ঢুকে পড়লাম। চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে মামা এগিয়ে এলেন। কাগজ ধরে ওপর থেকে নীচে অবধি খুঁটিয়ে দেখছেন আর পাতা ওলটাচ্ছেন।

এই! আশ্চর্য! সকালে চোখে পড়ল না।—মামা ছয়ের পাতার বাঁ-কোণে চিরুনি ঠেকালেন। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, শান্তশ্রী সুইসাইড করার ছেলে ছিল না।

অধ্যাপকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : কাল বিকেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূবদিকের গেটের কিছু দূরে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক শান্তশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মৃতদেহের মুখ ছিল ক্ষতবিক্ষত। এর ফলে সনাক্তকরণে বেশ দেরি হয়। পাশেই নাইট্রিক অ্যাসিডের খালি বোতল পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল ছিল নিরিবিলি, ঝোপঝাড়-গাছপালায় ঢাকা। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের পোশাক ছিল সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট। প্যান্টের পকেট থেকে প্রায় ৫০০ টাকা ও কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র পাওয়া গেছে।

পুলিশের অনুমান, এটি আত্মহত্যার ঘটনা। নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে শান্তশ্রী আত্মহত্যা করেন। অধ্যাপকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

—শান্তশ্রীবাবু তোমার বন্ধু ছিলেন?

—না-না। অনেক জুনিয়র। আমি যখন সায়েন্স কলেজে পড়াতাম, ওরা কয়েকজন আমার আন্ডারে ডক্টরেট করেছিল। ওদের মধ্যে শান্ত ছিল সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট।

—ওঁর পরিবার?

—ওর বাবা-মা গত হয়েছেন। শান্ত একমাত্র সন্তান। বউ চৈতালী ওর ক্লাসমেট ছিল। সেও আমার ছাত্রী। ওদের একটা ছেলে।

—বা:! সুখী পরিবার।

জগুমামা নি:শব্দে ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন,—শান্তর এক বন্ধু উমাশংকরের সঙ্গে আজ হঠাৎ দেখা। সে-ই খবরটা দিল। বলল, পুলিশের ধারণা, শান্তর সঙ্গে চৈতালীর বনিবনা ছিল না। তাই শান্ত শেষ পর্যন্ত সুইসাইড কর। কিন্তু—

একটু থেমে মামা বললেন,—উমা খবরটা পেয়ে আজ সকালে চৈতালীর সঙ্গে দেখা করে। চৈতালী ভেঙে পড়েছে। সে বলেছে এসব মিথ্যে প্রচার। এটা আদৌ আত্মহত্যা নয়, মার্ডার।

—মার্ডার! কেন? তোমার কী মনে হচ্ছে?

আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। বছর তিনেক ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।—মামা সিগারেটে টান দিলেন। বললেন, উমার কাছে খবরটা শুনে এমন ধাক্কা লাগল, ভেবেছিলাম তখনই শান্তদের বাড়ি যাব। কিন্তু এসপ্ল্যানেড ক্রস করতে-না-করতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। ডিসিশন পালটে ফেললাম। বৃষ্টি মানেই কলকাতার রাস্তায় জল। তার ওপর নিজের গাড়ি থাকা মানে দুর্ভোগের একশেষ।

—তা হলে তুমি ব্যাপারটার মধ্যে জড়াতে চাইছ?

—দ্যাখ টুকলু, বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত কোনও মানুষ যদি সন্দেহজনকভাবে মারা যান, একই পেশায় থেকে আমি দায়িত্ব এড়াতে পারি না।—জগুমামা বললেন, তা ছাড়া শান্ত-চৈতালীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ক্লোজ।

—তার মানে কাল সকালেই আমরা ওখানে যাচ্ছি?

—সেরকম ইচ্ছে। যাকগে, এখনই বাড়িতে বলার দরকার নেই।

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। মামা বললেন,—দিদিকে চায়ের কথা বলে আয়। যা কাকভেজা ভিজেছি, শীত-শীত করছে।

এইসময় ড্রইংরুমের টেলিফোনটা বেজে উঠল।

—হ্যালো।

—হ্যাল্লো। টুকলু?

—বলছি। আপনি?

—বলো তো ব্রাদার, কে?

—আপনি...আপনি—

—উহুঁ, পারছ না! হাউ আর ইউ?

—ফাইন। আপনি?

—আমি? আয়াম অল কোয়াইট।

—ইয়েস! আপনি অনন্ত সরখেল। বাব্বা, কতদিন পর!

—ছি:-ছি: টুকলু, তোমার এতক্ষণ লাগল আমায় চিনতে!

—না-না, তা নয়। মামা আর আমি অন্য একটা ব্যাপারে একটু—

—মামা? মানে স্যার? কলকাতায়? আইব্বাস! আমি এখনি যাচ্ছি।

—না-না! এখন আসবেন না। রাস্তায় জল।

—ছাড়ো জল! স্যারের সঙ্গে দেখা করব, ওসব তুচ্ছ বাধা আমাকে আটকাতে পারবে? শোন, আমি—

—শুনুন, শুনুন অনন্তবাবু! প্লিজ, পাগলামি করবেন না। কাল সকালে চলে আসুন!

২

আমি লাইসেন্স পাওয়ার পর থেকে মামা পারতপক্ষে ড্রাইভারের সিটে বসেন না। অবশ্য ড্রাইভ করতে আমার ভালোই লাগে।

আজও তাই হল। অনন্ত সরখেলকে আমার পাশে বসিয়ে মামা অধিষ্ঠিত হলেন পিছনে। ঘড়িতে ঠিক সাতটা পনেরো।

গাড়িতে বেশ স্পিড তুলে দিয়েছি। রাস্তাঘাট ফাঁকা, ফুরফুরে হাওয়া খেলছে গাড়ির মধ্যে। সবে ঘুম-ভাঙা কলকাতাকে দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে।

মামা বললেন,—তারপর অনন্তবাবু, আপনার খবর-টবর বলুন? অনেককাল এদিক মাড়াচ্ছেন না।

কী করব স্যার, হেঁ-হেঁ!—দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে অনন্ত সরখেলের মূলো-দাঁতগুলো বেরিয়ে এল, স্যার, আজকাল একদম সময় পাই না। আপনাদের আশীর্বাদে আমার রেডিমেড গারমেন্টের দোকানটা এমন ফ্লাওয়ার করেছে, কোত্থাও বেরুতে পারি না। কী বলব স্যার, সবসময় ছটফট করি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে। বর্ষাকাল অফসিজিন। তাই স্যার চলে এলুম।

—বেশ করেছেন। রাঁচির এখন হালচাল কী? সেই 'হাত' কাণ্ডের পর আর ওদিকে যাওয়াই হয়নি।

—এখন সিচুয়েশন অনেক বেটার স্যার। তবে স্যার—

টুকলু, থামা! —মামা বলামাত্র ব্রেকে চাপ দিলাম, আমরা গোলপার্ক জলযোগ-এর দোকানের ঠিক সামনে।

মামা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলেন,—সদা, অ্যাই সদানন্দ?

বাসস্টপের দিকে এগোতে থাকা গোলগাল ভদ্রলোক মুখ ফেরালেন। একমুখ হাসি নিয়ে আমাদের দিকে পিছিয়ে এলেন,—ওহো:! হোয়াট আ সারপ্রাইজ! জগুদা, তুমি! কতকাল পর দেখা। আজকাল তো তোমার নাম শুধু কাগজে পড়ি।

—উঠে আয়। টুকলু, স্টার্ট দে। তোর অভ্যেস একইরকম আছে। শুধু আয়তনেই যা পালটেছিস। যাচ্ছিলি কোথায়?

—গড়িয়া।

—গড়িয়া? কোথায়?

—জগুদা, তুমি শান্তর খবরটা শোনোনি?

—শুনেছি। তুই কি সেখানে যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। তোমরা?

—আমরাও। দাঁড়া, আগে আলাপ করিয়ে দিই। সামনে ড্রাইভ করছে আমার ভাগ্নে টুকলু, ভালো নাম অর্ণব ভট্টাচার্য। ওর পাশে উনি শ্রী অনন্ত সরখেল, আমাদের পরম ঘনিষ্ঠ আর ইনি সদানন্দ জানা। শান্তশ্রীর বন্ধু।

—জগুদা, তোমায় খবর কে দিল?

—উমা। উমাশংকর রায়। কাল হঠাৎ বোস ইনস্টিটিউটে দেখা। ওর চোখমুখের চেহারা দেখে আমার সন্দেহ হল। জিগ্যেস করতে ও বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে উঠল। ঘটনাটা বলল। শান্তর ভীষণ বন্ধু ছিল তো।

—বন্ধু আমিও ছিলাম জগুদা। তবে আমি মেন্টালি তৈরি ছিলাম। জানতাম, খুব শিগ্রি কিছু ঘটে যাবে।

—একটু খুলে বল।

বলছি। একমিনিট।—পকেট থেকে প্যাকেট বের করলেন সদানন্দ। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, শান্ত কতদিন এসে আমায় দু:খ করেছে, আর পারছি না। লাইফ হেল হয়ে গেল। আমি শান্তকে বলেছি, আলাদা হয়ে যাও। ও বলেছে, নারে। ছেলেটার বারোটা বেজে যাবে।

—তুই কি বলতে চাইছিস, শান্তর সঙ্গে চৈতালীর—

—হ্যাঁ, তাই। এটা ঘটনা। চৈতালী ওয়জ টু মাচ ডমিনেটিং। ও যা বলবে, শান্ত মাস্ট ওবে দ্যাট। শান্ত আর অ্যাডজাস্ট করতে পারছিল না। ওর মধ্যে প্রথমে ফ্রাস্ট্রেশন আসে, তার থেকে ডিপ্রেশন, তারপর...তারপর...যা হবার তাই হয়েছে।

আবেগে সদানন্দবাবুর গলা বুঁজে এল।

—কী জানি, আমার তেমন মনে হয়নি। তবে হ্যাঁ, চৈতালী চিরকালই স্পষ্ট কথা বলত। দু-একবার দেখেছি, আমার সামনেই ও শান্তকে দু-চার কথা শুনিয়ে দিচ্ছে। শান্ত তাতে মিটিমিটি হাসত। মনে হত এনজয় করছে।

—হ্যাঁ, সেসব গোড়ার দিকে। পরের দিকে শান্তর কাছে ব্যাপারটা আনবিয়ারেবল হয়ে উঠেছিল। ভাই, ব্যাঙ্কের গা দিয়ে তুমি বাঁ-দিকে টার্ন নাও।

—সদা, এখন আছিস কোথায়?

—আমার দেশে। ওড়িশায়। ভুবনেশ্বর ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছি। তবে এখনও মাসের মধ্যে দিনদশেক আমায় কলকাতা থাকতে হয়। রিসার্চের কিছু মেটিরিয়াল নিয়ে যেতে হয়।

—এখানে এসে কোথায় উঠিস?

—একটা গেস্টহাউসে। বিধান চৌধুরী ওড়িশার হোটেল-বিজনেসে টপ টাইকুন। আমার স্কুলফ্রেন্ড। কলকাতায় ওর চমৎকার গেস্টহাউস আছে। গোলপার্কের কাছে। আমি কলকাতায় এলে ওখানেই উঠি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের একটা কার্ড আমার কাছে আছে। দাঁড়াও, এর পিছনে আমার ভুবনেশ্বরের অ্যাড্রেসটা লিখে দিচ্ছি। এবার ডানদিকে ঘোরো।

৩

সদানন্দবাবু অবাকসুরে বললেন,—এ কী বিধান! তুমি এখানে? আজ সকাল থেকে শুধু সারপ্রাইজ।

টাকমাথা ভদ্রলোক অল্প হাসলেন। কিন্তু ওঁর পাশেরজন বলে উঠলেন,—কেন বিধান চৌধুরীর সঙ্গে তুই ছাড়া কারুর পরিচয় থাকতে পারে না?

—ধ্যুৎ! আমি কি তাই বলেছি নাকি? বলতে চাইছি বিধানের সঙ্গে শান্তর পরিচয় হওয়া...মানে ওড়িশার একজন হোটেল ব্যবসায়ীর সঙ্গে কলকাতার অধ্যাপকের—

—তোমরা থামো। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় চাঁদিপুরে। উনি তখন প্রায়ই ওখানে যেতেন। ওখান থেকে যেতেন বলরামগড়ি। ওখানে সরকারি একটা গবেষণা কেন্দ্র, কী নাম যেন?

সামুদ্রিকা।—সদানন্দবাবু বললেন, ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল ইন্সটিটিউট অব ওসানোগ্রাফির সেন্টার।

—ঠিক, ঠিক। চাঁদিপুরে গিয়ে শান্তশ্রীবাবু বরাবর আমার হোটেল সি-ভিউয়ে উঠতেন। ফরচুনেটলি, উনি থাকার সময় একবার আমি চাঁদিপুরে ছিলাম। পরিচয় হল। তারপর ঘনিষ্ঠতা। সে থেকে কাল নিউজটা শুনে —

বিধান চুপ করলেন। জগুমামা পাশেরজনকে জিগ্যেস করলেন,—উমা, কতক্ষণ এসেছিস?

—আধঘণ্টা!

—চৈতালী কোথায়?

—শুয়ে আছে।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ নৈ:শব্দ্য নেমে এল। ভেতরে যাওয়ার দরজার গোড়ায় পরদা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বছর বারোর একটা ছেলে। ভারী মিষ্টি মুখ। এখন থমথম করছে। নিশ্চয়ই ওঁদের ছেলে।

—তোমার নাম কি ভাই?

—অন্তু।

—কোন স্কুলে পড়ছ?

—পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে।...কথা বলতে ভালো লাগছে না।...প্লিজ।

—অন্তু, আমার নাম টুকলু। তুমি কি জানো, তোমার বাবা আমার 'আঙ্কল' ছিলেন?

অন্তু ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। নিরুত্তর।

—অন্তু, শান্তশ্রী আঙ্কল কি সুইসাইড করেছেন?

মিথ্যে কথা!—অন্তু সোজা চোখে তাকাল। রাগের গলায় বলল,—আমি জানি, আমার বাবাকে খুন করা হয়েছে।

—আশ্চর্য! কিন্তু সব কাগজে...অন্তু, তুমি একটু বাইরে আসবে?

আমার দিকে কড়াচোখে তাকিয়ে অন্তু পায়ে-পায়ে এল। জগুমামা ভিতরে ঢুকে গেছেন।

—তোমার বাবাকে খুন করা হয়েছে, এই সন্দেহটা তোমার হচ্ছে কেন?

—মা বলেছে। বাবা কী একটা গোপন রিসার্চ করছিলেন। কয়েকটা পাজি লোক সেটার জন্যে বাবাকে খুন করেছে।

—রিসার্চটা কী, তুমি জান?

—না:! মাও জানে না। বাবা সারাদিন কাজ নিয়েই পড়ে থাকতো।...কথা বলত না, সময়ই পেত না।...তোমরা কি পুলিশের লোক?

অনন্তবাবু বললেন,—না। তবে ওই যে মানুষটা, উনি তোমার বাবা-মারও স্যার ছিলেন। সাংঘাতিক লোক! ওনার হাত থেকে আজ পর্যন্ত কোনও দুষ্টু লোক ছাড়া পায়নি।

—তাই?

—হ্যাঁ।

—অন্তু। বাবা-মার সব বন্ধুদের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

—হ্যাঁ।

—তাঁরা কেমন?

—খুব ভালো। তবে—

—তবে— ?

অন্তু আমার দিকে তাকাল। বলল,—উমা কাকুকে আমার ভাল্লাগে না। খালি বাবার ওপর খবরদারি করত। এটা ভালো হচ্ছে না, ওটা ঠিক হচ্ছে না।—বাবা তো চুপচাপ লোক। কিছু বলত না।

—মা কিছু বলতেন না?

—না:।

অনন্ত সরখেল বাঁ-ভুরু নাচালেন। তারপর গোয়েন্দার স্টাইলে বললেন,—হুম! তলবৎ জলরং! চল, এবার ভেতরে যাই।

জগুমামা কাউকে ফোনে বলছেন,—দয়া করে আইজি ক্রাইমের বাড়িতে লাইনটা দেবেন?...হ্যাঁ, মিস্টার সেনকে চাইছি। আমার নাম জগবন্ধু মুখার্জি। শুধু আমার নামটা বললেই হবে।

সকলে মামার দিকে তাকিয়ে।

মামা বলছেন,—কে, প্রণবেশ? আমি।...হ্যাঁ, দরকার তো বটেই। খুন, জখম ছাড়া পুলিশের কাছে ঘেঁষতে যাব কোন দু:খে?...না-না, এটা কোনও কথা নয়। তুমিও কনট্যাক্ট করতে পার। শোন, তুমি কি জান, পরশু একজন প্রফেসার যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে মারা গেছেন? হ্যাঁ, আনন্যাচারাল ডেথ। পুলিশের অনুমান সুইসাইড। ওই প্রফেসর ছিল আমার খুব কাছের মানুষ।...ফোরেনসিক রিপোর্ট পেয়েছ? আজ...কখন?...তোমার অফিসে যাচ্ছি।...এই বারোটা নাগাদ।...ছাড়ছি।

ফোন রেখে বললেন,—বিধানবাবু, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করব?

—সিওর।

—শান্ত চাঁদিপুরে থাকতে রোজই কি বলরামগড়ি যাতায়াত করত?

—রোজ নয়। দু-তিনদিন অন্তর যেতেন। সেদিনই আবার ফিরে আসতেন। এমনিতে চাঁদিপুরে নিজের ঘরে বসে সারাদিন লেখালেখি করতেন। তবে বেশি রাতের দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন।

—কোথায় যেতেন?

—ঠিক জানি না। তবে দেখেছি, সি-বিচে অনেক রাত পর্যন্ত হেঁটে বেড়াতেন।

—হেঁটে বেড়াতেন? কেন?

—বলতে পারব না। জিগ্যেস করলে হাসতেন।

—ঠিক আছে। আমরা চলি। তোরা চৈতালীকে আমাদের কথা বলে দিস। হ্যালো, মাস্টার!—মামা এগিয়ে গিয়ে অন্তুর মাথাটা নিজের শরীরে চেপে ধরলেন। ওর চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন,—মাকে দেখো। তুমি ছাড়া মায়ের কেউ নেই। আমি দেখছি, তোমার বাবাকে যদি সত্যি-সত্যিই কেউ মেরে থাকে, সেই বাজে লোকটাকে ধরতে পারি কিনা।

অন্তু হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

গাড়ি চলছে। তিনজনেই চুপচাপ। আজকের সকালটা বড় বিষণ্ণ। বারবার পিতৃহীন অন্তুর মুখটা ভেসে উঠছে।

অনন্ত সরখেল বললেন,—স্যার, ছেলেটাকে কেমন লাগল? বুদ্ধিশুদ্ধি আছে?

—আছে মানে? ওভার ইন্টেলিজেন্ট চ্যাপ।

—তাহলে স্যার, আমি অপরাধী চিনে ফেলেছি।

—চিনে ফেলেছেন? কে?

বলছি স্যার।—অনন্ত সরখেল হাত-পা নেড়ে বললেন অন্তুর সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা।

মামা শুনলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন,—অন্তুর উমাকে ভালো না লাগার সঙ্গে খুন করার কী সম্পর্ক? খুনের মোটিভ কী?

হয়তো স্যার,—অনন্তবাবু খ্যাঁচম্যাচ করে দাড়ি চুলকোতে শুরু করলেন, মানে স্যার, সেটাই স্যার...

—উফ! চুপ করুন।

৪

কফফি-কফফি, গরাম-কফফি—ব্রেড-বাটার আন্ডা। কামরা সরগরম যত রাজ্যের হকারদের হইচইতে। আর ইতিমধ্যেই সিটে বাবু হয়ে বসে প্রবল বিক্রমে ফ্রোৎ-ফ্রোৎ শুরু করে দিয়েছেন অনন্ত সরখেল।

অথচ এই বিটকেলের জন্যে আর একটু হলে ট্রেনটা মিস হতো। ভোর পাঁচটা চল্লিশে ট্রেন ছাড়বে, পাঁচটা আটত্রিশ পর্যন্ত পাত্তা নেই। মামা আর আমি প্ল্যাটফর্মে ছটফট করছি আর ঘড়ি দেখছি। একসঙ্গে টিকিট, ফেলেও যেতে পারছি না।

ঠিক পঞ্চাশ সেকেন্ড তখন বাকি। আবির্ভূত হলেন। হাঁফাতে-হাঁফাতে ছুটে আসছেন, পিছনে কুলির মাথায় রাজ্যের বোঁচকা-ব্যাগ।

আমরাও উঠেছি, ট্রেনও ছেড়ে দিল। অ্যালার্ম ক্লক নাকি সময়ে বাজেনি। তারপর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে 'নস্টোরিয়াস' কলার খোসায় চিৎপাত হয়েছিলেন। কোমর ভাঙেনি, আমাদের ভাগ্য।

অথচ এরমধ্যে দিব্যি নিদ্রার শেষমার্গে পৌঁছে গেছেন।

—কফি, এখানে। দুটো।

—দুটো কেন? অনন্তবাবু?

—উনি ঘুমোচ্ছেন।

কিছু বলছ?—অনন্ত সরখেল প্যাটপ্যাট করে তাকালেন, আমি জেগে আছি ভাই।

—কিছু মনে করবেন না, আপনার নাকে কি অ্যালার্ম দেওয়া আছে?

—এঁ হেঁ হেঁ স্যার, কী যে করি। আজকাল স্যার, জেগে থাকলেও নাকটা নিজে-নিজেই ডাকে। বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার স্যার!

ধৌলি বেশ স্পিড নিয়েছে। বাইরে আকাশ মেঘলা, অন্ধকারের পরদা এখনও ঝুলে আছে। জোলো বাতাস ঢুকছে।

আমরা চাঁদিপুর চলেছি।

কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম,—কাল আইজি-র সঙ্গে কী-কী কথা হল, বললে না তো?

—সময় পেলাম কই রে? ফোরেনসিক রিপোর্ট দেখলাম। শান্তর পকেটের কাগজপত্র, চাবিটাবি ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। তারপর প্রণবেশকে বললাম, ওড়িশা পুলিশকে আমাদের যাওয়ার কথা জানিয়ে দিতে।

—ফোরেনসিক রিপোর্ট বা কাগজপত্রে কিছু—

ইয়েস! রিপোর্ট ইজ ভেরি মাচ সারপ্রাইজিং।—মামা বললেন, রিপোর্ট বলছে, শান্তর মৃত্যুর সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও এক্সপ্লেসিভে নাকি মুখ-গলা জ্বলে গেছে।

—এক্সপ্লেসিভ?

—হ্যাঁ। বিস্ফোরক পদার্থ। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, এরকম কোনও পদার্থ যদি কাছ থেকেও ছুঁড়ে মারা হয়, তাহলে তো শুধু মুখ আর গলাটুকু জ্বলবে না।

—হ্যাঁ, তাই তো। বুক-টুকও খানিকটা ঝলসে যাবে।

—রাইট। ওটাই রহস্য। এদিকে আবার কাগজপত্রের মধ্যে একটা অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি।

—চিঠি?

—হ্যাঁ। প্রণবেশের কাছ থেকে নিয়েও রেখেছি। এই দ্যাখ।

মামা পকেট থেকে একটা নীল খাম বের করলেন। খামের ওপরে 'শান্তশ্রী ব্যানার্জি' নাম ও ঠিকানা টাইপ করা। এককোণে হাতে লেখা 'পার্সোনাল'। বালেশ্বর পোস্টাপিসের সিলমোহর টিকিটের ওপরে।

ভেতরে একটা পাতলা নীল কাগজ। তাতে মাত্র তিনটে লাইন টাইপ করা—

BLUE CRAB MAY BITE YOU. IT’S DANGEROUS. BE ALERT.

কাগজের নীচে ডানদিকে একটা কাঁকড়ার ছবি।

—ব্লু ক্র্যাব! নীল কাঁকড়া! কাঁকড়া এল কোত্থেকে?

কোত্থেকে আবার? সি-বিচ থেকে। চাঁদিপুরে চল, তোমায় লাখ-লাখ কাঁকড়া দেখাব। বালিতে ভেলভেটের মতো ছেয়ে আছে।—অনন্ত সরখেল ঝিমোতে-ঝিমোতে বললেন।

বলতে গেছিলাম, 'ধুস, কীসব আবোল-তাবোল বকছেন', জগুমামা থামিয়ে দিলেন। বললেন,—রাইট! ঠিক বলেছেন অনন্তবাবু। সত্যিই তো, কাঁকড়া চাঁদিপুরেই পাব...আপনি এক-একসময় এমন ঠিক বলে ফেলেন...ঠিক, চাঁদিপুরে নীল কাঁকড়া...শান্ত যেত চাঁদিপুর...ঠিক।

জগুমামা কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন,—হ্যাঁ, সামুদ্রিকা। বুঝলি, আমরা প্রথমে সামুদ্রিকাতেই যাব।

অনন্তবাবুর ঘুম-টুম উড়ে গেছে! পায়ের ওপর পা তুলে নাচচ্ছেন। বললেন,—মাস্টার অর্ণব, চল। একবার সরেজমিনে তদন্ত করে আসি।

—কোথায়?

—কোথায় আবার, ট্রেনে! মাঝে-মাঝে তুমি এমন বোকার মতো কথা বল। জান তো, এই ট্রেনের পুরোটা যাওয়া যায়। সন্দেহজনক কেউ যদি ঘাপটি মেরে বসে থাকে, স্যারকে ইনফর্ম করব। ওঠো! উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত...আলসেমিই বাঙালির বারোটা বাজাল।

ট্রেনের বেশিরভাগ যাত্রী ঝিমোচ্ছে। তারই মধ্যে অনন্তবাবু দু-চারপা অন্তর আমায় কনুইয়ের খোঁচা মারছেন,—টুকলু দ্যাখো, ওই যে বাঁ-দিকে!...সাতসকালে কালো চশমা পরে...আরে ওই যে, ডানদিকের হুমদোমতন লোকটা জানলার ধারে...ওই লোকটাকে দ্যাখো, ঠোঁট চেরা, গালে কাটা দাগ...

প্রথমে 'না-না' করছিলাম, দেখলাম, বৃথা চেষ্টা। উনি ছাড়বার পাত্র নয়। ট্রেনের মধ্যেই একের-পর-এক সন্দেহজনক ব্যক্তি খুঁজে চলেছেন।

আমার কাঁধে একটা হাত পড়ল। হাতের মালিক বলে উঠলেন,—কোথায় যাচ্ছেন?

চাঁদিপুর।—অনন্তবাবু বলে দিলেন।

—জগুদা?

—আছেন। দুটো কম্পার্টমেন্ট ছেড়ে তিননম্বরে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—আমি ভুবনেশ্বর। ইউনির্ভাসিটিতে পড়াতে। দেখা যখন হয়ে গেল, জগুদার সঙ্গে একটু গেজিয়ে আসি।

—সদা, তুই কতবার চাঁদিপুর গেছিস?

—অনেকবার। কেন বলো তো?

—ওখানে নীল কাঁকড়া পাওয়া যায় কিনা বলতে পারিস?

—নীল কাঁকড়া? সরি। বলতে পারলাম না। জুলজিতে আমার নলেজ খুব লিমিটেড। কেন বল তো?

—শান্ত নাকি নীল কাঁকড়া নিয়ে রিসার্চ করছিল।

—হতে পারে। তবে আমি সিওর, শান্তশ্রী কমিটেড সুইসাইড।

—হতে পারে, নাও হতে পারে। যাকগে, চাঁদিপুরে কোথায় উঠি বল তো?

—কেন, বিধানের হোটেলে। কাল শুনলে তো, শান্তও ওখানে উঠত।

৫

আসুন স্যার। বসুন, বসুন।—আমরা ঢুকতে ভদ্রলোক যেভাবে উঠে দাঁড়ালেন, বুঝলাম খবরাখবর নিখুঁত নিয়মে হয়েছে।

—কী নেবেন বলুন, ঠান্ডা না গরম?

বসতে-বসতে আমার চোখ গেল বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসানো পেতলের নেমপ্লেটের দিকে। ড: ডি বি পাণিগ্রাহী, ডিরেক্টর।

জগুমামা মৃদু হেসে বললেন, গরমই হোক।...ডক্টর পাণিগ্রাহী, একটু বিরক্ত করব।

—না-না। বিরক্তির কী আছে? একজন ন্যাশন্যাল সায়েন্টিস্টের পায়ের ধুলো পড়ল আমাদের এখানে। আমরা গর্বিত।

—আপনি কি শুনেছেন, দিন তিনেক আগে কলকাতার একজন অধ্যাপক মারা গেছেন? উনি শুনলাম, প্রায়ই আপনার এখানে আসতেন? মৃত্যুর দিন সাতেক আগেও এসেছিলেন?

—হ্যাঁ স্যার। কিছুক্ষণ আগে টেলিফোনে জেনেছি, শান্তশ্রী ব্যানার্জি হঠাৎ মারা গেছেন। আপনার ইনফর্মেশন ঠিক। রিসার্চের ব্যাপারে উনি চাঁদিপুর থেকে দু-তিন দিন অন্তর এখানে চলে আসতেন।

—রিসার্চের সাবজেক্ট কী ছিল?

—কাঁকড়া।

—কাঁকড়া? নীল কাঁকড়া?

—না-না স্যার, নীল কাঁকড়া কেন? নীল কাঁকড়া তো এদিকের সি-বিচে পাওয়া যায় না।

—তবে?

—হর্স সু ক্রাব। বালি-কাঁকড়া। ঘোড়ার খুরের মতো দেখতে, ল্যাজবিশিষ্ট। মেটে-মেটে গায়ের রং।

—ও:। ওই কাঁকড়া নিয়ে শান্ত কী গবেষণা করছিল?

—ওঁর গবেষণার বিষয়টা আমাদের রিসার্চের সঙ্গে মিলে যায়। নিন স্যার, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

নিজের কাপটা তুলে নিলেন ডিরেক্টর। বললেন,—আমাদের সেন্টারে ওই কাঁকড়া নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা চলেছে। সাধারণভাবে প্রাণীটিকে কাঁকড়া বলা হলেও, আসলে শ্রেণিগতভাবে কাঁকড়া নয়। অন্যান্য কাঁকড়ারা যেখানে ক্রাসটেসিয়া ক্লাসের, এর ক্লাস মেরোস্টোমাটা। সেদিক দিয়ে মাকড়সা জাতের প্রাণীদের সঙ্গেই বরং এর মিল অনেক বেশি। সায়েন্টিফিক নেম লিমুলাস।

কিন্তু একে নিয়ে এত গবেষণা কেন?—অনন্তবাবু বললেন।

বিশেষ কারণ আছে।—চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন পাণিগ্রাহী। বললেন, এই সিউডো-ক্র্যাব বা নকল কাঁকড়ার শরীরেই রয়েছে এক দুর্মূল্য রাসায়নিক পদার্থের ভাণ্ডার। লাইসেট। লাইসেট মেডিসিন্যাল কম্পোনেন্ট হিসেবে অপরিহার্য। যে-কোনও লাইফসেভিং ড্রাগ অর্থাৎ জীবনদায়ী ওষুধ, কিডনি বা প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের চিকিৎসার ওষুধ—লাইসেট দরকার।

'লাইসেট' আমরা আমদানি করি ফরেন থেকে।—পাণিগ্রাহী বলে যান, কোটি-কোটি টাকার ফরেন কারেন্সি খরচ হয়ে যায় লাইসেট ইমপোর্ট করতে। অথচ এতকাল আমরা খবর রাখতাম না, আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলে বেলাভূমিতে লাইসেটের এমন বিশাল ভাণ্ডার পড়ে আছে। লিমুলাসদের শরীরের ন্যাচারাল লাইসেট।

—দারুণ ব্যাপার! লাইসেট তবে তো আর ইমপোর্ট করতে হবে না?

হ্যাঁ। সেজন্যেই রিসার্চ চলছে।—পাণিগ্রাহী বললেন, মুশকিল হল লিমুলাসের শরীর থেকে নির্যাস বের করে লাইসেটকে আলাদা করতে খরচ পড়ে যাচ্ছে বিরাট। হিসেব কষে দেখা গেছে, বাইরে থেকে আনবার চেয়েও সেটা অনেক বেশি। ডক্টর ব্যানার্জি রিসার্চ করছিলেন, কীভাবে কম খরচে কাঁকড়াদের শরীর থেকে লাইসেট বের করা যায়।

—শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল কি?

—বোধহয় কাছাকাছি চলে গেছিলেন। দিন সাতেক আগে শেষ যেবার ব্যানার্জির সঙ্গে আমার দেখা হয়, দেখলাম খুব এক্সাইটেড। কাজ নাকি প্রায় শেষ। কিন্তু—

ডিরেক্টর থেমে গেলেন। মামা বললেন,—আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।

পাণিগ্রাহী বললেন, অধ্যাপক ব্যানার্জি বললেন, চারিদিক থেকে চাপ আসছে। লোভনীয় সব টাকার অফার। এই নো-হাউ দেবার জন্যে। কিন্তু উনি রাজি নয়। দিলে উনি গভর্নমেন্টকেই দেবেন।

হুঁ।—মামা গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন, আপনার কাছে এসে খুব উপকৃত হলাম ডক্টর পাণিগ্রাহী। শান্তর অকালমৃত্যু সুইসাইড না মার্ডার, অনেকটা পরিষ্কার হল। হ্যাঁ, ওর রিসার্চের কোনও রিপোর্ট আপনাকে কখনও দিয়েছিল?

—না স্যার। বলেছিলেন, কাজটা শেষ হলে দেবেন। তবে আপনি যদি লিমুলাস সম্বন্ধে বিশদ জানতে চান, আমাদের রিসার্চের কপি আপনাকে দিতে পারি।

—থ্যাঙ্কিউ। দরকার হবে। এখন চলি।...

বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে বাহন পেয়ে যাব, আশা করিনি। একটু দূরেই একটা 'অটো' দাঁড়িয়েছিল।

—কোনদিকে যাবেন দাদা?

চালক বিড়ি টানতে-টানতে বলল,—চাঁদিপুর।

আরে:! এই ভরদুপুরে সামুদ্রিকার আশেপাশে ট্যাক্সি বা অটো পাওয়া যে ভাগ্যের ব্যাপার, আসার সময়েই টের পেয়েছি।

ডিরেক্টর অবশ্য বারবার আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। ওঁর অফিসের গাড়ি কাজে বেরিয়েছে, ফিরলে উনি আমাদের চাঁদিপুর পৌঁছবার ব্যবস্থা করবেন।

আমাদের অটো চলেছে জনহীন পথ ধরে। শুধু অটোর ভটভট। দুদিকে ঝাউবন। বাঁ-দিকে ঝাউয়ের ফাঁকে-ফাঁকে চিকচিক করছে আদিগন্ত বেলাভূমি। দিগন্তের রেখায় আবছা জল দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র।

চাঁদিপুর-সাগরের এই এক আশ্চর্য লীলা। জোয়ারের সময় ঢেউহীন সমুদ্র চলে আসে খুব কাছে। ভাটায় পিছিয়ে যায় বেশ কয়েক কিলোমিটার। হাঁটতে-হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে পৌঁছতে।

এখন বোধহয় ভাটার সময়। সমুদ্র চলে গেছে বহু-বহু দূরে।

অনন্ত সরখেল ভাবালু গলায় বললেন,—বুঝলে টুকলু, কবিগুরুর গানটা একেবারে গলায় এসে গেছে! সেই যে গো, সুনীল সাগরে সবুজ কিনারে...

—এ জায়গাটা কিন্তু সাগর নয়।

—সাগর নয়? তাহলে কী স্যার?

—বলতে পারেন মোহানা। বুড়িবালাম নদী এখানে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

—ও, তাই বুঝি? বা:! এখানে মোহানা-সাগর সবই আছে।

—জায়গাটা কেন বিখ্যাত জানেন?

—জানি স্যার। কাঁকড়ার জন্যে। এখানে বালিতে লাখ-লাখ কাঁকড়া। নিজে দেখেছি স্যার।

—ধ্যুৎ! বাঘা যতীনের নাম শুনেছেন?

—তা আর শুনিনি স্যার? সবাই বলত মাস্টারদা। চাটগায়ে কী লড়াইটাই না লড়েছিলেন।

—মাস্টারদা হলেন সূর্য সেন। বাঘা যতীনের পুরো নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। খালি হাতে একটা বাঘ মেরেছিলেন, তাই নাম হয়ে ছিল বাঘা যতীন।

—বুঝেছি স্যার! এ জায়গাটা ওনার জন্মভূমি।

—মোটেই নয়। ঠিক উলটো, মৃত্যুভূমি। ভারতকে স্বাধীন করতে বাঘা যতীন জার্মানির অস্ত্র কোম্পানির সঙ্গে গোপন চুক্তি করেন। অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজটার আসার কথা ছিল এখানে। বাঘা যতীন তাঁর দলবল নিয়ে এখানে লুকিয়ে ছিলেন দিনের-পর-দিন। কিন্তু—

অনন্তবাবু বললেন,—কিন্তু স্যার?

—কিন্তু সে জাহাজ আর আসতে পারল না। ইংরেজ সরকার খবর পেয়ে গেল। এই বলরামগড়ির একটু দূরে চাষখণ্ডে শুরু হয়ে গেল বাঘা যতীনের দলের সঙ্গে ব্রিটিশ ফৌজের ভীষণ লড়াই।

—তারপর কী হল স্যার?

—তারপর যা স্বাভাবিক, তাই হল। মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান।

আমাদের গাড়ি হঠাৎ থেমে গেছে। ড্রাইভার বারবার হ্যান্ডেল তুলছে, কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না।

ধারেকাছে লোকালয় নেই। দু-দিকেই ঘন ঝাউবন, নির্জন নিস্তব্ধ।

ভালো ঝামেলা বাধল।—মামা বললেন, ও ভাই, তোমার গাড়ি চলবে তো? নাকি—

কথা শেষ হল না। অটোর দু-দিকে এসে দাঁড়িয়েছে চারজন সশস্ত্র যুবক। ওদের হাতে ভোজালি, রড, কাটারি চকচক করছে। চারজনেরই চোখে রোদচশমা।

ওদের মধ্যে একজন ঝুঁকে পড়ল অটোর চাল ধরে। কর্কশকণ্ঠে বলল,—যা আছে, বার করি দে।

—যদি না দিই?

—দেব শেষ করি।

ভোজালি মামার গলায়।

ও মাগো!—অস্ফুট আওয়াজ করে অনন্ত সরখেল এলিয়ে পড়েছেন।

—দিচ্ছি। আগে গলা থেকে ওটা সরাও।

সঙ্গী তিনটে ছোকরা খ্যা:-খ্যা: করে হেসে উঠল। কিন্তু ড্রাইভার কোথায়? তার টিকি দেখা যাচ্ছে না।

জগুমামা ধীরেসুস্থে বুকপকেট থেকে কাগজপত্র, সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই বের করলেন। কিছু খুচরো টাকাপয়সাও বেরোল। পাশের সিটে রাখলেন। ওদের দু-চোখ লোভে চকচক করছে।

মামা মুখ একটু নীচু করলেন, প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালেন। ফিসফিস করে বললেন,—রে-ডি! টুকলু!

এরপরেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

জগুমামার হাতে উঠে এসেছে রিভলভার। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন,—হ্যান্ডস আপ। আমি দুটো হাতে আঁকড়ে ধরলাম অটোর চালের রড। শরীর শূন্যে ভাসিয়ে দুটো পা একসঙ্গে চালিয়ে দিয়েছি এদিকের দুটোকে তাক করে।

আর্তনাদ করে দুটোই ছিটকে পড়ল রাস্তায়। অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে তারা উঠে দাঁড়াল। দৌড় দিল বনের মধ্যে।

মামা বেরিয়ে পড়েছেন অটো থেকে। শূন্যে একবার ফায়ার করে তিনি ছুটতে-ছুটতে বললেন,—টুকলু! ধর!

দুজনেই পিছনে ছুটছি। ওরা ছুটতে-ছুটতে ঢুকে গেল বনের আরও গভীরে।

তবুও তাড়া করে যাচ্ছিলাম, মামা থামিয়ে দিলেন,—টুকলু, থেমে যা! জঙ্গলে ওদের দলবল থাকতে পারে।

লম্বালম্বা নি:শ্বাস ফেলে অটোর দিকে ফিরছি। ওরা কি শুধুই টাকাপয়সা ছিনতাই করতে এসেছিল?

মামা হতাশভাবে বললেন,—হাতে এসেও ফস্কে গেল। এই অটোটা দিয়ে পরে যদি পুলিশ আইডেন্টিফাই করতে পারে। অবশ্য নম্বর-টম্বরের মাথামুণ্ডু নেই। উঠে পড়।

—কিন্তু যাবে কী করে? ড্রাইভার তো নেই।

—ও তো ওই দলের। আমাদেরকে শিকার করবে বলেই ব্যাটা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। এককালে স্কুটার অনেক চালিয়েছি। মনে হয়, পেরে যাব।

৬

ঘুম, টানা ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, জানি না। সারাটা দিন ছোটাছুটির ধকলে শরীর নির্জীব।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার। বাইরেও। ঘড়ির জ্বলন্ত কাঁটাদুটো—বাপরে! সাড়ে সাতটা।

আমার পাশের খাটে অনন্ত সরখেল নিয়মিত ডেকে চলেছেন। তৃতীয় খাটে মামা।

হাতড়ে-হাতড়ে সুইচ টিপলাম। যা ভেবেছি, মামার খাট ফাঁকা।

—ও অনন্তবাবু! অনন্তবাবু! উঠুন—।

অনন্তবাবুকে মাত্র দুবার ঠেলা দিয়েছি, অমনি হাউমাউ করে উঠলেন ওরে বাপরে! মেরে ফেলল রে।

—আরে! আমি। কী হল?

—ও:, তুমি! বলো!

—কী বলব? অমন গেঙিয়ে উঠলেন কেন?

—গেঙিয়েছি? আমি? হা:-হা:—মাই ডিয়ার বয়, তোমার পেট নির্ঘাৎ গরম হয়েছে।

—এইমাত্র লাফিয়ে উঠলেন, এখন ডিনাই করছেন?

—বুঝতে শেখো, বৎস, বুঝতে শেখো। অ্যাকটিং! বুঝলে অভিনয়। একসময় এই শর্মা নাট্যসম্রাট শিশির চৌধুরী, অহীন্দ্র ভাদুড়ীর চেলাদের কাছে ট্রেনিং নিয়েছে। বুঝেচো!

দরজায় ঠক-ঠক। অনন্তবাবু বললেন,—আসুন।

সার্ভিস বয়। বলল,—সাব, চা-নাস্তা দেব?

—স্রেফ চা। রেডি কর, আমরা ডাইনিং হলে যাচ্ছি।

বিকেল চারটে নাগাদ সেই 'অটো'-তে চেপে এসে পৌঁছেছি চাঁদিপুর। প্রথমে থানায়। ওসি আগেই আমাদের আসার খবর পেয়েছিলেন। আমাদের কাছে বলরামগড়ি থেকে আসার পথে যা ঘটেছে, শুনে উত্তেজিত। অটোর মালিককে খোঁজার নির্দেশ দিলেন।

এরপর পুরোনো প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা এসে উঠেছি এই 'সি ভিউ' হোটেলে। বিধানবাবু অবশ্য এখন এখানে নেই। তবে তাঁর ম্যানেজার সুদেব পাণ্ডাও অমায়িক ভদ্রলোক।

ডাইনিং হলে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে প্রথম অনন্তবাবুরই চোখে পড়ল। বললেন,—দেখেছো?

সামনের দেওয়ালে সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো বেশ বড় একখানা ফটো। একটি বাচ্চা ছেলের। মিষ্টি কোমল মুখ, ভাসা-ভাসা দুটো চোখ।

সুদেব পাণ্ডা কাউন্টারে। হিসেব কষছিলেন। ছেলেটির কথা জিগ্যেস করতে তাঁর মুখের রং বদলে গেল। বললেন,—ভেরি ট্রাজিক।

একটু থেমে দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলে বললেন,—আমাদের মালিকের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে বছর দশেক। ওই ছিল একমাত্র সন্তান। রঞ্জন। মালিকের নয়নের মণি বললেও কম বলা হয়। ছেলের জন্যে উনি পারলে আকাশের চাঁদও এনে দিতেন। মা মারা যাবার সময়ে রঞ্জন কয়েকমাসের শিশু। সেই রঞ্জন বছর দুয়েক আগে—

—আহারে! কোনও শক্ত ব্যামো হয়েছিল বুঝি?

—ব্যামো? না:—! সমুদ্র। সমুদ্র ওকে শেষ করল।

—অদ্ভুত ব্যাপার তো! শুনিছি, চাঁদিপুর তো সবচেয়ে ঠান্ডা সমুদ্র। ঢেউ-ফেউ নেই।

—ভাগ্য মশাই, ভাগ্য! একা-একা রঞ্জন সমুদ্রের ভিতরে বহুদূর চলে গেছিল সাঁতার কাটতে। ফিরল ওর লাশ। ডাক্তার বললেন, হাতে পায়ে আচমকা খিল ধরেছিল।...আমরা কেউ ওর চিৎকারও শুনতে পাইনি।

যাকগে,—সুদেববাবু ম্লান হেসে ফের বললেন, বলুন, রাতে কী খাবেন।

—যাহোক লাইট কিছু। কী বলেন অনন্তবাবু?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নো ম্যাটার। একটা হলেই হল।...চল হে, বাইরে থেকে একটু পিওর অক্সিজেন নিয়ে আসি।

বড়জোর দু-তিন গজ এগিয়েছি, জগুমামার হাজির।

কী হে বাবুরা, কোথায় যাওয়া হচ্ছিল?

—সি-বিচে। তুমি কোত্থেকে?

—থানা থেকে। একটু আলোচনা করে এলাম। ওসি বললেন, শান্তর সঙ্গে ওর আলাপ ছিল না। তবে বারদুয়েক দেখেছেন।...তোরা এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলি?

—আধঘণ্টা হল উঠেছি। তুমি ডাইনিং হলের ফটোটা দেখেছ?

—রঞ্জনের কথা বলছিস তো? হ্যাঁ, রতনের কাছে সব শুনেছি। সো স্যাড।

—রতন কে?

—রঞ্জনকে যে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। রতন পেঁড়া। এই হোটেলের কেয়ারটেকার। বিধান চৌধুরীর ডানহাত।

সমুদ্রের পাড়ে চলে এসেছি। সাগরে এখন জোয়ার। জল চলে এসেছে প্রায় পায়ের কাছে।

অমাবস্যার রাত। তারার আলোয় চিকচিক করে উঠছে কুচো ঢেউ। পায়ের তলায় পচপচ করছে ভিজে বালি। হাওয়ার টানে মাঝে-মাঝে জল এসে পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিচ্ছে। শিরশিরে ঠান্ডা।

বললাম,—কিছু এগোনো গেল।

—খানিকটা। যেমন ধর, ব্লু ক্র্যাব। এখানকার হর্স সু ক্র্যাব, অর্থাৎ লিমুলাস, ওর রক্তের রং নীলাভ। লাইসেট থাকার জন্যে। ডক্টর পাণিগ্রাহীর পেপার পড়ে এটা জানতে পেরেছি। দ্বিতীয়, দুপুরে আমাদের ওপর ওই গুণ্ডাগুলো অ্যাটাক করেছিল কেন? নিশ্চয়ই চুরি-ছিনতাইয়ের জন্যে নয়। আমার ধারণা—

—আমাদের কাছে এমন কোনও জিনিস চলে এসেছে, যেটা শান্তশ্রীবাবুর খুনিকে ধরার অকাট্য প্রমাণ। খুনিই গুণ্ডাগুলোকে ফিট করেছে।

—রাইট! তুই দেখছি কালে-কালে আমাকেও ছাড়িয়ে যাবি।

—প্রমাণটা কী বুঝতে পেরেছ?

আঁচ করছি। সিওর নই।—মামা বললেন, তিন নম্বর, আমি হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানলাম, এখানকার ঝাড়ুদার অবধি জানে, শান্ত কাঁকড়া নিয়ে গবেষণা করত। এমনকি বেশ কিছু জ্যান্ত কাঁকড়া ধরে হোটেলের ছাদে গামলায় রাখা থাকত। অথচ সেদিন বিধান চৌধুরী বললেন, শান্তর রিসার্চের সাবজেক্ট জানেন না। হয়তো সত্যিই জানেন না। উনি এতরকম ব্যবসায় মেতে থাকেন, মাসের মধ্যে চব্বিশ-পঁচিশ দিন এদিক-ওদিক ঘুরছেন। ম্যানেজারই সব সামলান।

—স্যার, বিধান চৌধুরীর কথা উঠলেই আমার ছেলেটার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আহা রে, অমন ফুলের মতো ছেলে!

—স্বাভাবিক। রতন বলছিল, রঞ্জনের বুদ্ধিও ছিল খুব প্রখর। আর ছিল তেমনি জেদি আর বেপরোয়া। যেটা করবে ঠিক করত, করবেই। কাউকে পরোয়া করত না।

—ওইখানেই যত গণ্ডগোল স্যার। আমার পিসতুতো ভাইটাও ছিল ঠিক ওরকম। ডাকাবুকো টাইপের। তার কী দশা জানেন? এখন বদ্ধ পাগল।

—পাগল?

হ্যাঁ, টুকলু।—অনন্তবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, খুব ছোট্ট ব্যাপার। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরেছিল। শর্ত ছিল ওকে অমাবস্যার রাতে একা-একা শ্মশানে যেতে হবে। আধঘণ্টা থাকতে হবে। বন্ধুদের দেওয়া বিড়ি টেনে শ্মশানকালীর মূর্তির সামনে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। ও সরল মনে গেছে। নিঝঝুম রাত। সে রাতে শ্মশানে কোনও ডেডবডিও আসেনি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কথামতো আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়েছে, তারপর শ্মশানকালীর মূর্তির সামনে বিড়ি ধরিয়েছে। তারপর যেই না বিড়িতে দুটো টান মেরেছে, অমনি দুম—ফটটাস!

—দুম ফটাস? মানে?

—হ্যাঁ। বিড়িটাতে ছিল যত গণ্ডগোল! বন্ধুরা ওকে ভয় দেখাতে বিড়ির মধ্যে ছোট ক্যাপ পটকা গুঁজে দিয়েছিল। ছেলেটা যতই সাহস দেখাক, টেনশন তো ভিতরে-ভিতরে ছিল। আচমকা ওই বিকট আওয়াজ আর আগুনের ঝিলিক দেখে, ব্যস! ধড়াম করে অজ্ঞান। নার্ভাস ব্রেকডাউন। বন্ধুরা ছুটে এল। ওর ওই অবস্থা দেখে—

দাঁড়ান, দাঁড়ান! কী, কী বললেন? পটকা?—মামা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, সাবাস অনন্তবাবু, সাবাস!

আমরা হতভম্ব। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। জগুমামা চেঁচাচ্ছেন কেন? ভাবতে-ভাবতে শেষে পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

—ও মামা, মামা! প্লিজ কুল ডাউন! এতে তুমি—

কথা শেষ হয়নি। আমার কানের কাছে একটা খসখসে গলা,—নড়বার চেষ্টা কোরো না।

পিঠের ওপর ঠান্ডা লোহার নল! অন্ধকার ফুঁড়ে আরও দুই মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে জগুমামা আর অনন্ত সরখেলের ঠিক পিছনে।

—কী চাই? আমাদের টাকা হোটেলে।

—দেখো ডক্টর, চালাকি কোরো না। পকেটে যা আছে, চটপট বের করে দাও।...উঁহু!...লাশ পড়ে যাবে।

অনন্ত সরখেল আবার টলমল করতে শুরু করেছেন। এই রে! আবার ফিট হবেন নাকি? নাহ, সামলে নিয়েছেন। কাঁপতে-কাঁপতে পকেট ঝেড়েঝুড়ে একজনের হাতে দিয়ে দিলেন।

আমার পিঠে নলের খোঁচা,—কী রে বাচ্চু। এই বয়সে ফুটতে চাস নাকি? জলদি।... এক...দুই...

পকেটে যা আছে, নি:শব্দে তুলে দিলাম। জগুমামাও সুবোধ বালকের মতো এমনকী সিগারেটের প্যাকেট-দেশলাইটাও তুলে দিলেন।

বদমাশ তিনটে মিশে গেল অন্ধকারে।

৭

মামা বললেন,—তোর 'সুমনের' গানটা মনে পড়ছে?

—কোনটা? আমার সুমনের অনেকগুলো গানই ফেবারিট।

তোর ওখানেই শুনেছিলাম।—জগুমামা নিজেই গুনগুনিয়ে উঠলেন—

কখনও সময় আসে জীবন মুচকি হাসে
ঠিক যেন পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা
অনেক দিনের পর মিলে যাবে অবসর
আশা রাখি পেয়ে যাব বাকি দু-আনা...

—বাব্বা! একেবারে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছো! ক'দিন আগে তুমিই তো সুমনের গান নিয়ে তুমুল তক্কো করলে। বললে, এসব টিকবে না। ফালতু।

—হ্যাঁ রে। প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। আসলে একদম নতুন ধরনের সুর, কথা, ছন্দ। আমাদের কানে সইয়ে নিতে সময় লাগে।

—হুঁ-হুঁ মামা! এর মানে হচ্ছে নীল কাঁকড়ার দাঁড়া প্রায় ভেঙে ফেলেছ। অ্যাট লিস্ট ভাঙার আগে চেপে ধরেছ। নইলে আর যাই হোক, তোমার গলায় গান বেরোত না।

—কথাটা ভুল বলিসনি। তবে দু-একটা জায়গায় জট পাকিয়ে রয়েছে।

আমরা যাচ্ছি আইজি প্রণবেশ সেনের ফ্ল্যাটে।

কাল বিকেলে ফিরেছি চাঁদিপুর থেকে।

পরশু রাতে সাগরে বেড়াবার সময় যখন দ্বিতীয়বার আমাদের ওপর হামলা হল, আমাদের সর্বস্ব ছিনতাই হলেও মামা একটুও মুষড়ে পড়েননি। বরং খোশমেজাজে বলেছেন, —নাকের বদলে নরুন পেলাম, টাক ডুমাডুম ডুম। ইনাম তো পাবিই না, উলটে পাবি পশ্চাদ্দেশে পদাঘাত।

ফ্ল্যাটের ঠিক নীচে আইজির নেমপ্লেট। দুবার হর্ন দিলাম।

একটু পরে দীর্ঘদেহী, সুদর্শন মানুষটি বেরিয়ে এলেন গেট দিয়ে। প্রণবেশ সেন।

আপনাদের জন্যে ওয়েট করছিলুম।—উনি আমাদের গাড়িতেই উঠে পড়লেন।

—ইনি আপনার সারথি শ্রীমান টুকলু?

আমি হেসে নমস্কার করলাম।

মামা বললেন,—তোমার গাড়ি?

প্রণবেশ বললেন,—পিছনে। একটু দূরত্ব রেখে আসবে।

—গুড। সবকিছু এনেছ তো?

—নিশ্চয়ই। আমরা প্রথমে যাব কোথায়? বম্ব স্কোয়াডে?

—না। প্রথমে শান্তর ডিপার্টমেন্টে। যাদবপুর। সেখানে তদন্ত সেরে যদি সময় থাকে তারপর!

—কিছু মনে করবেন না দাদা, অধ্যাপক শান্তশ্রী ব্যানার্জির মৃত্যুটা যে মার্ডার, আপনি সিওর তো?

—টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট। এমনকী কীভাবে ওকে মারা হয়েছে, কে ওকে মেরেছে, তাও আন্দাজ করতে পেরেছি। আর প্রমাণ? হ্যাঁ, আজ 'প্রমাণ'-কে প্রমাণিত করার জন্যেই আমাদের বম্বস্কোয়াডের সাহায্য নিতে হবে। আমি এখন আটকে আছি একটা জায়গাতেই। সেটা হল খুনের মোটিভ।

—কেন মামা? খুনের উদ্দেশ্য তো সিম্পল। প্রফেসর ওই কাঁকড়া থেকে কম খরচে 'লাইসেট' বের করার রিসার্চ করছিলেন। খুনি চেয়েছিল ওই রিসার্চের রেজাল্ট। উনি রাজি হননি, তাই—

—বুঝলাম। কিন্তু টুকলু, আমার ধারণা শান্তশ্রীকে খুন করেছে তার কাছের মানুষ। যার ওই রিসার্চ পেয়ে নিজের খুব কিছু লাভ নেই। টাকার পাশাপাশি কিছুটা ঈর্ষাও এর পিছনে হয়ত কাজ করেছে। জালের

এককোণে মাকড়সার মতো ঘাপটি মেরে বসে আছে কোনও বিজনেসম্যান, যে শান্তর এই কাছের লোকটিকে, কাজে লাগিয়েছে। আমি সেই আড়ালে থাকা মাকড়সাকেও ধরতে চাই।

—একটা কথা। টুকলুর অ্যানালিসিস যদি ঠিক হয়, তাহলে আমার প্রশ্ন, খুনি বা তার লোকজনের ডক্টর ব্যানার্জিকে মেরে ফেলে কী লাভ হল?

—প্রণবেশ, এর উত্তর দুরকম হতে পারে। প্রথম, চেয়ে না পাওয়ার ঝাল মেটানো। দ্বিতীয়, শান্ত সুইসাইড করেছে এটা প্রমাণিত হয়ে গেলে যখন সব থিতিয়ে যাবে, তখন সুযোগ বুঝে শান্তর স্ত্রীকে একটু-একটু করে পটিয়ে ওই রিসার্চ পেপারগুলো হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে।

গোলপার্ক পেরিয়ে যোধপুর পার্ক ছাড়িয়ে এসেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বাঁ-দিকে। সামনেই প্রথম গেট।

—ঢুকব?

—হ্যাঁ রে। ভিসির সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে হবে। পারমিশন নিতে হবে।

গাড়িটা ইউ-টার্ন করে ঘুরিয়েছি, এই সময় গেটের বাইরে চায়ের স্টল থেকে 'টুকলু-টুকলু' শুনে ব্রেক কষতে হল। অনন্ত সরখেল হাসিমুখে এগিয়ে এলেন,—অনেকক্ষণ এসে গেছি স্যার।

□

—তুমিই তো রামলগন প্রসাদ?

—জি সাহাব।

—বোসো। শান্তশ্রী ব্যানার্জিকে চিনতে?

—জরুর সাহাব। বহোৎ আচ্ছা প্রফসর ছিলেন। ভোলেভালা। দিনভর আপনা কাম লিয়ে থাকতেন।

মামা বায়োকেমিস্ট্রির সাবস্টাফ রামলগনকে জেরা করতে শুরু করেছেন। এখন দশটা বাজতে দশ। ডিপার্টমেন্ট ফাঁকা। অধ্যাপকরা এখনও কেউই এসে পৌঁছননি।

এদিকে শান্তশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব কাবার্ড খুলে কাগজপত্র, ডায়েরি, ফাইল বের করতে শুরু করেছেন প্রণবেশ সেন। সঙ্গে অনন্ত সরখেল ও আমি। আলমারির চাবি প্রণবেশ সেন নিয়ে রেখেছিলেম।

মামা বলছেন,—যেদিন ঘটনা ঘটেছিল, সেদিন শান্তশ্রী কখন এসেছিল ডিপার্টমেন্টে?

—করিব সাড়ে দশ বাজে।

—সেদিন ওর মধ্যে কোনও তফাত দেখেছিলে?

—নেহি সাহাব। উনি এলেন, চায়ে পিলেন, কেলাস লিলেন, ইখানে টিফিন ভি করলেন। মিঠাই লাকে দিলম।

—তারপর?

—তারপর করিব ঢাই বাজে, সাহাবের দোস্ত এলেন। উনি হামায় চায়ে লানতে বলিলেন।

—দোস্তকে তুমি চেন?

—জি সাব। অকসর আসেন। উহ ভি প্রফসর।

—ওনার নাম জান?

নাম?—রামলগন কয়েকসেকেন্ড ভ্রূ কুঁচকে ভেবে বলল, সাহাব, উহ ভি প্রফসর...হাঁ, হাঁ, ইয়াদ পড়েছে! উমা, উমাজি।

অনন্ত সরখেলের কাগজপত্র গোছানো বন্ধ হয়ে গেল। ফিসফিসিয়ে বললেন,—শুনলে, শুনলে টুকলু? কতবার স্যারকে বললুম, উনি পাত্তাই দিলেন না। কী, এখন?

মামা নির্বিকার। বললেন, তারপর?

—তারপর সাব, দোনো একসাথ বারিয়ে গেলেন। হামাকে বলিয়ে গেলেন, ওয়াপস আসছি।

—রামলগন, ওইদিন এরপরে প্রফেসরের সঙ্গে আর কারও দেখা হয়েছে কিনা বলতে পার?

রামলগন বলল,—হাঁ-হাঁ সাহাব, ইয়াদ পড়েছে। হামার ভাতিজা ছবিল ভি ইখানে দুসরা ডিপার্টে কাম করে। প্রফেসারজির মওতের দিন রাতে উ হামায় বলেছিল, ইসকে বাদ উ দিখেছিল প্রফেসারজি আর উনকা দোস্তকে। আপনি উর সাথে বাত করিবেন সাহাব?

খুব ভালো হয়।—মামা বললেন, তবে তার আগে একটা কথা বল। সেদিন বিকেলের দিকে কোনও শব্দ পেয়েছিলে?

—নহি। একমিনিট সাহাব। হামি ছবিলকে লিয়ে আসি।

মিনিটদুয়েকের মধ্যেই রামলগন অল্পবয়েসি একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল।

—হামার ভাতিজা ছবিল।

—বোসো ছবিল। তোমার কাকা বলল, তুমি ওই দিন প্রফেসরকে দেখেছ একজনের সঙ্গে হেঁটে যেতে।

—জি সাব। দোনো বরাবর পূবসাইডের গেটের পাশ দিয়ে যাইছিলেন।

—উনি তো প্রফেসরের বন্ধু। তাই না? আগে তুমি ওকে এখানে দেখেছ নিশ্চয়ই?

—নেহি সাব।

কেয়া বলছিস তু? —পাশ থেকে রামলগন ধমকে উঠল, আরে বেটা, ইয়ে ক্যা বাত বোল রহে? কিতনেবার উনাকে দিখেছিস, হাঁ! শোচ-সমঝকে বোল। হরবখত আসত। উমাবাবু।

—নেহি চাচা! হামি উনাকে পহেলে কভি দিখেছি না।

—কেমন দেখতে বলো তো ছবিল?

—থোড়াসা মোটামাফিক। সুটবুট পহেনা।

—তুমি আবার দেখলে চিনতে পারবে?

—জি সাব।

—আরেকটা কথা। সেদিন প্রফেসরকে দেখার পরে, ধরো আধ ঘণ্টার মধ্যে, কোনও জোরদার আওয়াজ পেয়েছিলে?

আওয়াজ?—ছবিল থমকে গেল। একটু পরে ওর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল,—ঠিক, ঠিক সাব। উধারসেই হুয়া। বহোত জোর আওয়াজ। হামনে শোচা থা, বাস ইয়া লরিকা টায়ার বাস্ট হো গয়া।

—ঠিক আছে। দরকার হলে তোমাদের আবার ডাকব। চলো হে প্রণবেশ। কাগজপত্র সব গুছিয়ে নাও।

৮

বাথরুম থেকে বেরিয়ে তোয়ালেতে মাথা মুছছি। কানে এল জগুমামার গলা,—হ্যালো, চাঁদিপুর পোলিশ স্টেশন? আই অ্যাম ফ্রম ক্যালকাটা। প্লিজ পুট মি টু মিস্টার ওসি।...

আমার কান মুহূর্তে সজাগ। মামা বলছেন,—হ্যালো, ডক্টর মুখার্জি স্পিকিং। ক্যান ইউ রিকগনাইজ মি?...ওকে, ওকে। শুনুন, ইমিডিয়েট একটা কাজ করতে হবে। 'সি ভিউ' হোটেলের রতন পেঁড়া। এখনই ওর পিছনে ঝানু ইনফর্মার লাগান। হ্যাঁ, হ্যাঁ প্লিজ নোট করুন...রতনের গ্রাম ব্রাহ্মণগাঁ, আপনাদের ডিস্ট্রিক্টেই। জানতে হবে, ওর দেশের বাড়িতে পরিবার পরিজন কে-কে আছে?...না-না, কদিন কি মশাই, আজই চাই...বাই এনি মিনস! দিস ইজ মোস্ট আর্জেন্ট। আমি আপনাকে রাতে রিং করছি।...বলব, সব বলব। কালপরশুর মধ্যে আপনার ওখানে যাচ্ছি।...অলরাইট।

মামা ফোন নামিয়ে আমার দিকে ফিরলেন। হেসে বললেন,—কিছু বলবি?

আমি অভিমানের সুরে বললাম,—মামা, আমি জানি, নীল কাঁকড়ার রহস্য তুমি বুঝে ফেলেছ। আমি কিন্তু কিছুই জানি না। আমি নাকি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট!

আহা, রাগ করিস না রে ভাগ্নে।—মামা হঠাৎ আপনমনে সুমনের আরেকটা পুরোন গান গুনগুন করে উঠলেন :

চেনা দু:খ চেনা সুখ

চেনা চেনা হাসিমুখ

চেনা আলো চেনা অন্ধকার...

তারপরেই গলা পালটে বললেন,—সব চেনা হয়ে যাচ্ছে, বুঝলি। মনে হচ্ছে না চিনলেই ভালো হত। টাকা! টাকার লোভে মানুষ যে কত নীচে নামতে পারে! বন্ধুকে খুন করতে হাত কাঁপছে না।

—বন্ধুটি কে মামা?

—ওই যে ছবিলের লোকটা, শুনলি না? একটু ধৈর্য ধর না বাবা। সব বলব। এখন রেডি হয়ে নে। ওরা এসে পড়ল বলে। দিদিকে বলেছি, আজ আমরা বাইরে খেয়ে নেব।

অমনি কলিংবেল বেজে উঠল।

ঠিক দু-মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি।

আজ প্রণবেশবাবু নিজেই গাড়ির চালক, পাশে জগুমামা। পিছনে অনন্তবাবু, আমি। সাদা মারুতি ভ্যান।

এ জে সি বোস রোডে পড়ে প্রণবেশবাবু বললেন,—দাদা, রহস্যের পরদাটা একটু সরান। ধৈর্যের পরীক্ষা আর নেবেন না। প্লিজ।

মামা সিগারেট ধরালেন। গলগল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—ঠিক আছে। তবে শর্ত হচ্ছে, শেষ করব ট্যাংরায় গিয়ে।

—ট্যাংরায়?

—ওহো, সরি। তোদের বলা হয়নি, ধাপার মাঠে টেস্ট করা হবে। প্রণবেশ, সাকশন পাইপের ব্যবস্থা থাকছে তো?

—সব থাকবে। প্লিজ শুরু করুন।

মামা তাকালেন জানালার বাইরে। নিজের মনেই যেন বলতে শুরু করলেন,—টুকলু জানে, শান্তর হঠাৎ মৃত্যুতে আমি এমন বিচলিত হয়ে পড়ি, পরদিন সাতসকালে হাজির হই ওর গড়িয়ার বাড়ি। সেখানে গিয়ে ওর স্ত্রী-ছেলের সঙ্গে কথা-টথা বলে আমার মনে একটা সন্দেহ ঢুকে যায়, শান্ত আত্মহত্যা করেনি। ওকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু যদি খুন হয়, তা হলে কেন খুন? কে বা কারা করল? কীভাবে খুনটা হল?

এই মোক্ষম তিনটে জিজ্ঞাসার প্রথমটার জবাব মোটামুটি তোমরা পেয়ে গেছ। তবু তোমাদের সুবিধের জন্যে বলি সামুদ্রিকার ডিরেক্টরের সঙ্গে প্রথমদিন কথা বলে আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, বেচারি শান্ত ওর

গবেষণার সাফল্য উৎসাহের আবেগে ঘনিষ্ঠ দু-একজনকে বলেছে। স্বভাবত খবর পাঁচকান হয়ে চলে যায় এমন এক বিজনেস ম্যাগনেটের কাছে, যে টাকা দিয়ে মানুষের দাম মাপতে অভ্যস্ত। সে কোটি টাকার বিনিময়ে এই আবিষ্কার কিনতে চায়। শান্তর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারফত প্রস্তাব পাঠাল। শান্তশ্রী বরাবরই আইডিয়ালিস্ট। স্ট্রেট রিফিউজ করল।

তখন শুরু হয় কখনও লোভ দেখানো, কখনও শাসানি। উড়ো ফোনে, চিঠিতে। এসব তথ্য আমি জেনেছি শান্তর নিজস্ব ডায়েরি পড়ে। মৃত্যুর সময়ে যে চিঠি শান্তর পকেটে ছিল, সেদিনই সেটা পোস্টে এসেছিল। বিকেলে খুন হল শান্ত। ততদিনে খুনিরা বুঝে গেছে, শান্ত কিছুতেই রিসার্চ পেপার দেবে না। উলটে পুরো বিষয়টা গভর্নমেন্ট-পুলিশকে জানিয়ে দিতে পারে। হয়তো এটাও ভেবেছিল, গবেষণা-বিক্রির ব্যাপারটা যখন স্ত্রী ঠিক জানে না, তখন শান্তর মৃত্যুর শোক থিতিয়ে এলে ওরা স্ত্রীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনওভাবে ওটা হাতিয়ে নেবে।

—মামা একমিনিট! প্রথমে যেটা শুনেছিলাম, শান্তশ্রীবাবুর সঙ্গে ওর স্ত্রীর বোঝাপড়ায় সমস্যা ছিল, এটা কি ঠিক?

—না, পুরো ঠিক নয়। এটা ঠিক, শান্ত ছিল ফামিলির প্রতি উদাসীন। চৈতালীর সঙ্গে একেবারেই মিলত না। তবে ওদের মধ্যে অলিখিত একটা চুক্তি ছিল বলে মনে হয়। ওরা কেউ কারও ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করত না। ফ্যামিলির ব্যাপারে চৈতালী যেমন ওকে কিছু বলত না, শান্তও রিসার্চের ব্যাপার ওকে খুলে বলেনি। এও হতে পারে, চৈতালীকে চমকে দেবে বলেই শান্ত সব চেপে রেখেছিল।

আমরা ইস্টার্ন বাইপাসে ঢুকে পড়েছি। প্রণবেশবাবু মারুতিকে বাঁ-দিকে ঘোরাতেই দেখলাম, একটা মাঝারি মাপের ফাঁকা মাঠে জনাদশেক আর্মড পুলিশ দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ি থামল।

একজন অফিসার এগিয়ে এসে লম্বা স্যালুট ঠুকলেন,—গুড আফটারনুন স্যার!

প্রণবেশবাবু নামতে-নামতে বললেন,—সব রেডি?

—ইয়েস স্যার।

আমরা দেখলাম, ফাঁকা মাঠে নানারকম যন্ত্রপাতি থরে-থরে সেখানে সাজানো আছে।

—প্রণবেশ, করেছটা কী? এ তো এলাহি ব্যাপার। এতসব কিচ্ছু লাগবে না। আমার বস্তুটি দেখতে এক্কেবারে ছোট। তবে হ্যাঁ, এর ক্ষমতা অসীম! সাক্ষাৎ শমন!...এই দ্যাখো!

—এটা কী?

—দাদা, এটা তো একটা কিংসাইজ সিগারেট! বিদেশি ব্র্যান্ড।

—তোমরা খুব অবাক হয়ে গেছ, না? এর ক্ষমতা এবার স্বচক্ষে দ্যাখো।

সিগারেটটা দু-আঙুলে ধরে মামা এগিয়ে গেলেন মাঠের মাঝখানে।

—সাকশন পাইপ কোথায়? পাইপের মুখে একে লাগাতে হবে। তারপর এতে আগুন লাগিয়ে দূর থেকে আস্তে-আস্তে টানতে হবে।

কয়েকমিনিটের মধ্যে সব রেডি।

পুলিশের মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে কাঠের স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো পাইপের মুখে ফিট করলেন। তারপর সিগারেটে আগুন দিয়ে পিছিয়ে এলেন। মামা বললেন,—স্টার্ট! সাকশন স্টার্ট!

সিগারেট জ্বলতে শুরু করেছে।

আমরা কিছু দূর থেকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি...

পাম্পের টানে লম্বা সিগারেট নিরীহভাবে পুড়ে চলেছে...একটু-একটু করে ছোট হয়ে আসছে...

দ্রাম-ম-ম! সকলেই থরথর করে উঠল। প্রচণ্ড জোরালো বোম-পটকার আওয়াজ। সাপের ফণার মতো নেচে-নেচে উঠল আগুনের শিখা। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপর নিভে গেল।

মি-রা-কু-লা-স!—অস্ফুটে বললেন প্রণবেশ সেন।

—টিএনটি। পুরো নাম ট্রাই-নাইট্রোটলুইন! বুঝলে প্রণবেশ, এ হল প্রাণঘাতী রাসায়নিক বিস্ফোরক। ভয়ংকর ক্ষমতা। নিজের চোখেই দেখলে। এই এক্সপ্লোসিভটিই অল্প একটু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সিগারেটের মাঝামাঝি জায়গায়।

—আনচিঙ্কেবল স্যার!

হ্যাঁ, অনন্তবাবু। ঠিক বলেছেন। আনথিঙ্কেবল।—মামা কেন যে অনন্তবাবুর বিকট ইংরেজি ক্ষমা করে দিলেন, সেটা ওঁর পরের কথাতেই স্পষ্ট হল।

আমি এই ব্যাপারে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি চাঁদিপুর সি-বিচে অমাবস্যার রাতে আপনার ভাইয়ের পাগল হওয়ার ঘটনা না বললে আমার মাথাতে আসত না মানুষ মারার এই ভয়ঙ্কর কৌশল। আমি তখনও অন্ধকারে হাতড়ে মরছি।

—কী যে বলেন স্যার! আপনার কাজে যে লাগতে পেরেছি, এটা স্যার আমার ফোরটিনথ জেনারেশনের ভাগ্য।

সদানন্দর সঙ্গে যেদিন আমাদের প্রথম দেখা হয়, আমায় ও দিল বিধান চৌধুরীর কলকাতার গেস্ট হাউসের কার্ড।—চাউমিনে সয়াসস ঢালতে-ঢালতে জগুমামা বললেন, ওই কার্ডটার পেছনে নিজের ও হাতে লিখে দেয় ওর ভুবনেশ্বরের ঠিকানা। এদিকে শান্তর কাছে সেই 'ব্লু ক্র্যাব'-এর সাদা খামে হাতে লেখা ছিল 'পার্সোনাল'। দুটো হাতের লেখা একই লোকের।

আমরা তিনজনে উদগ্রীব। ট্যাংরার ব্লু-ড্রাগন রেস্তোরা এই অবেলায় বেশ ফাঁকা।

মামা বললেন,—কিন্তু হুমকি দেওয়া আর খুন করায় আকাশপাতাল ফারাক। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে খুনের প্রমাণ এসে গেল আমার হাতে। অজান্তে ঠিক এসে গেল বলা চলে না, কিছুটা সন্দেহের বশে সেদিন চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছিলাম।

টুকলু, মনে করে দ্যাখ, সদানন্দ যেদিন প্রথম আমাদের সঙ্গে গাড়িতে ওঠে, শান্তর পারিবারিক অশান্তির গল্প শোনাতে-শোনাতে আবেগের সঙ্গে ও আমায় সিগারেট অফার করে। দেখলাম, বিদেশি ব্র্যান্ডের ওই সিগারেটের প্যাকেটে অন্য বিদেশি ব্র্যান্ডের তিনটে সিগারেট রয়েছে। ভাবলাম, হয়তো মুখ বদলাবার জন্যে রেখেছে। ফের ওর সঙ্গে দেখা হল ধৌলি এক্সপ্রেসে। সেদিনও নিজে প্যাকেট থেকে বের করে একটা সিগারেট আমায় অফার করল। আমি আড়চোখে দেখে নিয়েছি, সেই প্যাকেটেও তিনটে সিগারেট অন্য। বিদেশি ব্র্যান্ড। সন্দেহ হল। সবসময় এক প্যাকেটের মধ্যে অন্য ব্র্যান্ড নিয়ে ঘুরছে কেন? ব্যাপারটা কী? প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কথা বলতে-বলতে চট করে হাতসাফাই করে ফেললাম। আমিও ওর ব্র্যান্ড খাই। সুতরাং সিগারেটের প্যাকেট বদলে গেল।

মামা জল খেলেন।

অনন্তবাবু বলে উঠলেন,—বুঝেছি স্যার। তাই এরপর থেকে নচ্ছারগুলো আমাদের পেছনে পড়ে গেছিল।

—রাইট। আমি কনফার্মড হলাম, সদানন্দর সিগারেটের প্যাকেটে এমন কিছু আছে, যেটা স্বাভাবিক নয়। সদানন্দ, সদানন্দ কি তবে কোনওভাবে শান্তশ্রীর খুনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত? তবে—

তখনও আমি একটা কথাই ভাবছি, সদানন্দ নিজে ওই আবিষ্কার হাতিয়ে করবে কী? বিদেশে বেচে দেবে? মনে ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিল আর একজনের দিকে। কারণ প্রথম আলাপে সে আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। বলেছে শান্তর রিসার্চের সাবজেক্ট কী, সে জানে না! অন্যদিকে আবার সদানন্দর স্কুল ফ্রেন্ড।

—বিধান চৌধুরী!

চুপ!—মামা মুখে আঙুল দিলেন, টুকলু, কোনওভাবে নামটা লিক আউট হয়ে গেলে আর ধরা যাবে না। কারণ, এইমুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। তবে হ্যাঁ, সদানন্দকে ফাটকে পুরে পুলিশি দাওয়াই দিলে ওর নাম

বলে দিতে পারে। আরেকটা চান্সও আমি নিতে চাই। যদি মিলে যায়—

—চান্স! কী চান্স?

—পরে বলছি। তার আগে ডায়েরির কথা বলে নিই। শান্তর ডায়েরি পড়ে বিধান চৌধুরী যে নাটের গুরু, নিশ্চিত হয়ে গেলাম। সদানন্দ বিধান চৌধুরীর দালাল। শান্তকে কোটি টাকার লোভ দেখাচ্ছে। এ সব শান্ত লিখে গেছে তার ডায়েরিতে। এর পেছনে যে বিধান সুতো টানছে, তাও শান্ত বুঝেছিল।

—তবু উনি পুলিশে গেলেন না? আশ্চর্য!

—আশ্চর্যের কিছু নেই প্রণবেশ।—আমাদের দেশে পুলিশ সম্পর্কে মানুষের কী ধারণা, সে কি তুমি জানো না? বেশিরভাগ মানুষ ভাবে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। আর শান্ত যে ধরনের লোক ছিল তাতে এটা স্বাভাবিক। তুমি শান্তর ডায়েরি পড়লে অবাক হতে প্রণবেশ, একজন বিজ্ঞানী হয়ে পাকা গোয়েন্দার মতো কী সুন্দর অ্যানালিসিস করেছে। অঙ্কের ইকুয়েশনের মতো। একজায়গায় লিখেছে : 'BLUE CRAB'! বিধান চৌধুরীর নাম-পদবির আদ্যক্ষরও BC। তাহলে কি দাঁড়াল? 'আমায় খুব সাবধানে থাকতে হবে, শয়তান জাল গুটোচ্ছে।'

প্রণবেশ সেন নিশ্চুপ। ওঁর ফরসা মুখে লজ্জা-রাগ-হতাশা পরপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

—বিধান চৌধুরীকে হাতেনাতে ধরার কী চান্স নেবে বলছিলে?

—দেখলি না, দুপুরে চাঁদিপুরে এসটিডি করলাম। বিধান চৌধুরীর ছেলের মৃত্যুদিন, যদ্দুর মনে পড়ছে পরশুর পরদিন।

—ছেলে মানে রঞ্জনের? কিন্তু দাদা, ওর মৃত্যুদিনের সঙ্গে বিধান চৌধুরী—

—আছে প্রণবেশ, আছে। তুমি তো জানো, যে-কোনও মানুষের চরিত্রে একটা-না-একটা দুর্বলতা থাকেই। ওই দুর্বলতার জায়গা যদি খুঁজে বের করা যায়, তাহলে যত ধুরন্ধর অপরাধীই হোক, ধরা পড়বে। কী, ঠিক বলছি প্রণবেশ? বিধান চৌধুরীর সবচেয়ে দুর্বল জায়গা তার একমাত্র সন্তান রঞ্জন।

জগুমামা বললেন, চাঁদিপুরে 'সি ভিউ' হোটেলে আমার আলাপ হল রতনের সঙ্গে। ম্যানেজারের কাছে জেনে নিয়েছি রতন পেঁড়া সম্পর্কে। রতনের সঙ্গে আলাপ জমালাম। তাকে দামি সিগারেট খাওয়ালাম। একটা গ্যাস লাইটার প্রেজেন্ট করলাম। উদ্দেশ্য একটাই, ওর পেট থেকে ওর মালিক সম্পর্কে কথা বের করতে হবে। কথায়-কথায় রতন বলে ফেলল, বিধান চৌধুরীর জীবনের এক গোপন কথা। একটি বিশেষ দিন উনি প্রতিবছর চাঁদিপুরে থাকেন। যত কাজই থাক, বিধান চৌধুরীকে সেদিন 'সি ভিউতে' পাওয়া যাবে।

—নিশ্চয়ই সেটা ছেলের মৃত্যুদিন?

—ঠিক বলেছিস। ওইদিন ভোরে চানটান করে ধুতি পরে উনি গিয়ে ঢোকেন রঞ্জনের বন্ধ ঘরে। উনি ঢোকার পরে ঘর বন্ধ হয়ে যায়। সারাটা দিন ওই ঘর থেকে বিধানবাবু বেরোন না। কোনও খাবার তো নয়ই, জলও স্পর্শ করেন না। রঞ্জনের ফটোকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে তার সামনে উনি বসে থাকেন।

ওই নস্টোরিয়াস লোকটা ছেলের ফটোর সামনে বসে থাকে?—অনন্তবাবু চোখ বড় করে বললেন।

—হ্যাঁ। অন্য সকলে অবশ্য এটুকুই জানে। রতন জানে গোপন কথা। কোনও এক বছর ওইদিনে বিধান চৌধুরী দরজায় ছিটকিনি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। কৌতূহলে রতন দরজা ফাঁক করে উঁকি মারে। অবাক হয়ে দেখে, তার মালিক ছেলের ফটোর সামনে বসে হাউহাউ করে কাঁদছে আর বিড়বিড় করে কীসব বকে যাচ্ছে। রতন শোনে, একবছর ধরে উনি যেসব গর্হিত কাজ করেছেন, সেগুলো বলে যাচ্ছেন। মাঝে-মাঝে শুধু বলছেন, রঞ্জু, আমি তোকেই সব বলি। তুই আমার যিশু, তুই আমার কৃষ্ণ। তুই আমায় ক্ষমা করিস বাবা।...

—দ্য আইডিয়া! ওই কনফেসন আমাদের রেকর্ড করতে হবে।

—অকারণ একসাইটেড হয়ো না প্রণবেশ। ব্যাপারটা সোজা নয়। ঠান্ডা মাথায় আমাদের এগোতে হবে।

১০

শেষ অংশটাকে কি কোনও পর্ব বলা চলে? জগুমামাকে জিগ্যেস করেছিলাম। উনি বললেন, —বড়জোর পরিশিষ্ট বা উপসংহার বলে চালাতে পারিস।

আসলে আমাদের আগের রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারে উপসংহার লিখতে হয়নি। কারণ কোনওটাতেই, শেষে না পৌঁছে, জানতে পারিনি আসল অপরাধী কে বা কারা।

এই 'নীল কাঁকড়া' রহস্যতে সেসব আগেই চুকে গেছে। তাই খুব সংক্ষেপে পরের ঘটনাপ্রবাহ বলে যাচ্ছি।

রাতে চাঁদিপুর থানার ওসি জানালেন, রতনের গ্রামে থাকে ওর একমাত্র বছর চোদ্দোর মেয়ে। পরদিন সকালেই আইজি প্রণবেশ সেন সহ আমরা চারমূর্তি পৌঁছে গেলাম চাঁদিপুর। মামার নির্দেশমতো গোপনে লোক লাগিয়ে সেই মেয়েটিকে লুকিয়ে ফেলা হল।

রতনকে ডেকে আনা হল থানায়। ওকে ও.সি. ঠান্ডাগলায় বললেন, তিনি জানেন, রতনের মেয়েকে কেউ বা কারা গুম করেছে। যদি সে আমাদের কথামতো কাজ না করে, মেয়েকে ফেরত পেতে পুলিশ চেষ্টা করবে না।

কাজটা অন্যায়। মামাকে বলেছিলাম। মামা বললেন, মেয়েটিকে সত্যি তো আর লোপাট করা হচ্ছে না। খুনিকে ধরতে গিয়ে এটুকু বেঠিক আমাদের মেনে নিতে হবে।

রতন নিখোঁজ মেয়ের শোকে দিশেহারা। ওসি-র শর্তে সে রাজি হয়ে গেল। ওকে বলা হল, রঞ্জনের মৃত্যুদিনের আগের রাতে একটা মিনি ক্যাসেট রেকর্ডার রেখে আসতে হবে ওই ঘরে। রঞ্জনের ছবির পেছনে।প্লাগ পয়েন্ট পর্যন্ত একটা লুকোনো তার চলে আসবে বাইরে। সুইচ বোর্ডের কাছে। পরদিন সকালে বিধান চৌধুরী ছেলের ঘরে ঢোকার ঠিক দশ মিনিট পরে কানেকশন চালু করা হবে।

আধুনিক টেপ রেকর্ডার যন্ত্রটি জগুমামার। সিগারেটের প্যাকেটের মতো সাইজের। মামা জাপান থেকে এনেছিলেন। অবিশ্বাস্য ক্ষমতা। দশ ফুট দূরে কেউ নি:শ্বাস ফেললে সেই শব্দও ধরে নেয়। শুধু তাই নয়, জাপানি ক্যাসেটের বিশেষত্ব হল, তার ফিতেয় ছরকম লাইনিং বা ট্র্যাক বসানো হয়েছে। প্রতিটি ট্র্যাক এক ঘণ্টার। একটা ট্রাক শেষ হলে পরেরটা চালু হয়ে যায় আপনা থেকে। রেকর্ডার একটানা ছ'ঘণ্টা চালু থাকে।...

সব কাজ নিখুঁতভাবে সাজিয়ে পরের দিন প্রায় দম আটকে কাটিয়েছি।

সারাদিন একরকম বন্দি হয়েই কেটেছে থানার কোয়ার্টারে। বাইরে বেরোতে ভরসা হয়নি। যদি কারও চোখে পড়ে যাই!

পরদিন খুব ভোরে রতন ফিরল রেকর্ডারটা নিয়ে। রিওয়াইন্ড করে চালু করা হল। ওসি-র ঘরে আমরা বসে। বুক কাঁপছে উত্তেজনায়, কী আছে ক্যাসেটে?...

ক্যাসেট যখন শেষ হল, প্রণবেশ সেন দু-হাত তুলে প্রায় নাচছেন। শুধু শান্তশ্রী খুনের এপিসোড নয়, ছ'ঘণ্টার এই ক্যাসেটে রয়েছে বিধান চৌধুরীর অন্যান্য অনেক অপরাধের ফিরিস্তি। নিজের মুখে স্বীকারোক্তি করেছে লোকটা। থেমে-থেমে, কাঁদতে-কাঁদতে। মাঝে-মাঝে দু-পাঁচ মিনিটের বিরতি।

এই ক্যাসেট থেকেই জানতে পারলাম, বিধান চৌধুরীর বাইরের শো-কেস হোটেলের ব্যাবসা। লোকটা আসলে অন্ধকার জগতের জীব। স্মাগলিং, ডাকাতি-রাহাজানি, খুন-জখম সবরকম অপরাধ করার জন্যে তার নিজস্ব গ্যাং রয়েছে।

সুতরাং এর পরে কী ঘটবে, সকলেই জানি। সেটা পুরোপুরি পুলিশের ডিউটি।

তবে ফিনিশিং টাচ দিলেন আমাদের আদি ও অকৃত্রিম মহাপ্রভু। শ্রীল শ্রীযুক্ত অনন্ত সরখেল।

ক্যাসেট বাজা শেষ হয়েছে। সকলেই চুপ। হজম করতে চেষ্টা করছি বিধান চৌধুরীর অকপট স্বীকারোক্তি।

হঠাৎ অনন্ত সরখেল উঠে দাঁড়ালেন। দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে নিজস্ব স্টাইলে ও কথায় সুমনের গান গেয়ে উঠলেন :

স্যার, প্রথমত : আমি আপনাকে চাই...

দ্বিতীয়ত : আমি আপনাকে চাই...

তৃতীয়ত : আমি আপনাকে চাই...

শেষ পর্যন্ত আপনাকে চাই...!

শারদীয়া ১৯৯৩

জগুমামার বিপক্ষে জগুমামা

১

হোয়াটস দিস মিস্টার সারখাল?

—ইট...ইট আমসত্ব।

—হোয়াট আমসা-ট্টা?

—ইয়া ফ্রম আম, মানে ম্যাঙ্গো...আন্ডার স্ট্যান্ড, ফার্স্ট টেকিং রস, ইয়ে জুস...সান ড্রাই অন ন্যাকড়া, ইয়ে ন্যাপকিন, অ্যান্ড প্রিপেয়ারিং! ভেরি টেস্টফুল।

—ওয়াহ! ইন্টারেস্টিং!

ছোকরা সায়েব চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইল। তারপর ভাঙা ইংরেজিতে বলল, —ক্যান আই বাই ওয়ান?

নো-নোও নেভার!—অনন্ত সরখেল সজোরে বললেন,—নট ফ্রম হিয়ার। দিস অল ব্যাড।

—দেন হাউ ক্যান আই গেট ইট?

—নো প্রবলেম, আই ট্রাইং। গিভিং মি টেন রুপি। অর্ণব!

যা ভাবছিলাম, তাই ঘটল। কামরার হকার এতক্ষণ বিদেশি খদ্দেরের গলা কাটার আশায় জুলজুল চোখে তাকিয়ে ছিল। অনন্তবাবুকে অস্ফুটে গালাগাল দিতে-দিতে নেমে গেল কামরা থেকে। আর সায়েব 'থ্যাঙ্কিউ-থ্যাঙ্কিউ' করতে-করতে বুকপকেট থেকে একখানা চকচকে পঞ্চাশ টাকার নোট বার করল।

আমি চোখ বুজে ফেলেছি।

ফালতু ঝামেলা! একেই ভ্যাপসা গরমে সিদ্ধ হচ্ছি, ট্রেনও চলছে টিকিয়ে-টিকিয়ে। সেধে কেউ এসব উটকো বাঁশ নেয়!

অবশ্য চোখ বুজেও যে রেহাই পাব না, জানতাম। উপকার করার সুযোগ পেয়ে বুড়োর প্রেম উথলে উঠেছে! ঘাড়ের কাছে এসে মধুর গলায় ডাকছেন,—টুকলু, ও টুকলু...! ঘুমিয়ে পড়লে? একটু ওঠো ভাই!

আর মটকা মেরে থাকা যায় না। ট্রেনের অন্য যাত্রীরা দেখছেন।

—অ্যাঁ? হ্যাঁ, কী বলছেন?

—একটু চলো মাস্টার! এনারা আমাদের দেশের গেস্ট। ভালো আমসত্ব পাই কিনা দেখে আসি! খারাপ হলে দেশের বদনাম!

—টুকলু,প্ল্যাটফর্মে নেমে টি.টি.-কে জিগ্যেস করে নিস, ট্রেন ছাড়তে আর কতক্ষণ বাকি। এখানে সেডিউলড স্টপ পনেরো মিনিট। অলরেডি সাত-আট মিনিট হয়ে গেছে।

আপার বার্থ থেকে জগুমামা বললেন। আধশোয়া হয়ে একটা বই পড়তে-পড়তে ঠিক খেয়াল রেখেছেন!

প্ল্যাটফর্মে নেমে এগোতে কালো কোটকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন,—কিষেণগঞ্জে একটা মালগাড়ি উলটে গেছিল। লাইন ক্লিয়ার হতে এখনও কম করে আধঘণ্টা।

ভেরি গুড!—অনন্ত সরখেল হতভম্ব টিটি-কে 'ধন্যবাদ-ধন্যবাদ' জানিয়ে সবেগে এগোলেন বেরুবার গেটের দিকে,—টুকলু, চটপট—!

—আরে, দাঁড়ান, দাঁড়ান। আগে জানুন, স্টেশনের বাইরে কাছে-পিঠে কোথায় দোকান পাবেন।

ঠিক-ঠিক!—অনন্তবাবু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আরেক চেকারকে ধরলেন,—একটা ইনফর্মেশন দেবেন?

—বলুন।

—কাছে-পিঠে কোথায় আমসত্বের দোকান পাব?

—আমসত্ব? ওই তো বেচছে!

—ও চলবে না। মানে স্টেশনের জিনিসের দোকান কদ্দুরে?

—সে তো শহরের ভিতরে। কাছাকাছি দোকান পাবেন না!

—ধরুন, আমরা যদি সাইকেল-রিকশায় যাই?

—যাতায়াত আধঘন্টা লেগে যাবে। একবার ট্রাই করতে পারেন। আজ ট্রেন লেট—

আমাকে নিয়ে ততক্ষণে রিকশায় চেপে বসেছেন অনন্ত সরখেল। বলেছেন,—আমসত্বের দোকান! জলদি!

এর পরের ঘটনা বলার আগে ফেরার সময়কার ছোট্ট অভিজ্ঞতাটুকু বলে নিই।

রিকশাওয়ালার পরিচিত দোকানে ঝটিতি আমসত্ব কিনে, ততোধিক ঝটিতি আমরা তখন স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছি। হঠাৎ আমাদের পাশ দিয়ে একখানা অটো চলে গেল।

স্পষ্ট দেখলাম, জগুমামা অটোতে বসে আছেন!

সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছি,—জগুমামা, জগুমামা!

অশ্চর্য ব্যাপার, সেই অটোটা একবারও থামল না।

অনন্ত সরখেলও দেখেছেন। উনিও বললেন,—তাজ্জব! স্যার আমাদের ডাক শুনেও থামলেন না!

সাইকেল-রিকশার ভাড়া মিটিয়ে ছুটতে-ছুটতে আমরা প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকেছি। স্টেশনের মাইকে তখন বলছে,—কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের ড্রাইভার, আপনি স্টার্ট করুন।

ও:! আরেকটু হলেই—! বুড়োর মুন্ডুপাত করতে করতে উঠে পড়লাম। শরীর ঘামে জ্যাবজ্যাব করছে।

চোখ গেল আপার বার্থের দিকে। জগুমামা পড়ে চলেছেন। বললেন,—যাক, ফিরে এসেছিস! টেনশন হচ্ছিল।

আমি কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। দেখি, জগুমামা নিজে থেকে বলেন কিনা?

অনন্ত সরখেল বিজয়ীর মতো ঝোলা-জামার পকেট থেকে আমসত্বের দু-দুটো সুদৃশ্য প্যাকেট বের করলেন। এগিয়ে দিলেন সায়েব ছেলেটার দিকে,—টেক ইট! এসকেলেন্ট টেস্ট!

ছেলেটির চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। একটা প্যাকেট খুলে সে দু-পিস আমসত্ব বের করল। একটা বাড়িয়ে দিল সঙ্গিনীর দিকে।

তারপর একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার ঘটে গেল।

আমসত্বে কামড় মেরেই দুজনেই চোখ কপালে তুলে ফেলল, 'থু-থু' করে সবটা ফেলে দিল মেঝেতে। শুধু তাই নয়, ছোকরাটা লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে অনন্তবাবুর ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখে সজোরে গুঁজে দিল আধ খাওয়া আমসত্বটা। সেই সঙ্গে বিচ্ছিরি গালাগাল শুরু করল,—ইউ চিট! ইউ ইন্ডিয়ান...

স্টপ ইট! আই সে, স্টপ ইট!—জগুমামা ঝট করে নীচে নেমে দাঁড়িয়েছেন।

—ইউ পিপল, ডোন্ট ক্রস ইয়োর লিমিট। দিস গাই হ্যাজ বিন চিটেড।

নো—নো। মাই ফিফটি রুপিস।—ছোকরাটা মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল,—দিস, ওল্ড হ্যাগার্ড—

টেক ইট।—জগুমামা পকেট থেকে একখানা পঞ্চাশটাকার নোট এগিয়ে দিলেন তার দিকে। বললেন,—ওকে, লেট বি কোয়ায়েট!

বেচারি অনন্ত সরখেলের অবস্থা বলার নয়! সারা মুখময় আমসত্ব, দাড়ি-গোঁফের গায়ে টুকরো-টাকরা ঝুলেছে। কেঁউ-কেঁউ করে বললেন,—হারামজাদা রিকশাওয়ালাটা শেষ করে কুপিয়ে দিয়েছে। আর যদি কোনওদিন এদিকে—

থামুন!—জগুমামা বললেন,—আগ বাড়িয়ে উপকার করার অভ্যেস ছাড়ুন। বয়েস কম হল না।

বলতে-বলতে মামা বার্থের এয়ারপিলোর তলা থেকে একটা আমসত্বের প্যাকেট বের করে অনন্তবাবুর হাতে দিলেন। বললেন,—এটা প্রেজেন্ট করুন।

এইবার জগুমামা হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন। বললাম, তোমায় তখন অতবার ডাকলাম, উত্তর দিলে না কেন?

—আমায়? কখন?

—যখন তুমি অটো করে স্টেশনের দিকে ফিরছিলে!

—আমি-আমি তো শুয়েই ছিলাম।

—মামা! আশ্চর্য! শুধু-শুধু চেপে যাচ্ছ! তা হলে আমসত্ব আনলে কোত্থেকে?

—কী বাজে বকছিস! আনব কেন? তোরা নেমে যাওয়ার পর আরেকজন হকার উঠল, তার সঙ্গে কথা বলে বেশি দামের প্যাকেট নিলাম। এই ক্যুপেতে অনেকে আছেন, জিগ্যেস করে দ্যাখ।

আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে অনেক সহযাত্রীই মামার কথায় সম্মতি দিলেন। একজন বললেন,—তোমার মামা ওপরেই শুয়ে ছিলেন ভাই। কোত্থাও বেরোননি।

এদিকে দেশি-বিদেশি দোস্তি আবার জমে উঠেছে। নতুন আমসত্ব খেয়ে সায়েব-মেম উচ্ছ্বসিত। অনন্তবাবুর দু-হাত জড়িয়ে ধরে কেবল 'সরি-সরি' বলে চলেছে।

২

ঠিক যেন দার্জিলিং-এ চড়ার পাহাড়ি রাস্তা। দুপাশে তার চেয়েও ঘন সবুজ পাহাড়। মাঝেমধ্যে ঝুরঝুরে বৃষ্টি হচ্ছে।

আটটা বাজে। গুয়াহাটি থেকে রওনা হয়েছি ঘন্টাখানেক আগে। অসম সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি, এখন মেঘালয়ে।

মেঘালয়, মেঘের রাজ্য! যথার্থ নাম এই রাজ্যের। প্রথম আলাপে মুগ্ধ হয়ে গেছি। পাহাড়ে অগুনতি ঢেউ, মেঘের খেলা, সবুজ বনের মাঝে নাচছে অজস্র রুপোলি ঝরনা।

এখানে আসাটা নির্ভেজাল বেড়ানো। হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেষ পরীক্ষা দিয়ে তেমন কোনও চাপ ছিল না। এই সময় সরকারি গবেষণার কাজ শেষ করে চণ্ডীগড় থেকে জগুমামা এসে পৌঁছোলেন আমাদের বাড়ি। আর টেলিপ্যাথি কিনা জানি না, আমাদের পার্মানেন্ট সঙ্গী অনন্ত সরখেলও রাঁচি থেকে এসে উপস্থিত হলেন তার পরদিনই। অতএব ত্র্যহস্পর্শ যোগ!

জগুমামার সঙ্গে কোথাও ঘুরে আসা যায় কিনা,প্ল্যান কষছিলাম। মামা বললেন, ওর এক বন্ধু আছেন শিলং-এ। শ্যামদাস শর্মা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। বায়োফিজিক্সের বিজ্ঞানী। প্রায়ই বিজ্ঞানের কনফারেন্সে দেখা হয়, প্রতিবার উনি শিলং-এ যাওয়ার নেমতন্ন করেন।

শুনেই অনন্ত সরখেল তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন,—ফাইন স্যার। আমার বুজুম ফ্রেন্ড গজু মানে গজবন্ধুও রয়েছে গৌহাটিতে।

—কে?

—হেঁ-হেঁ মাস্টার! স্যারের সঙ্গে আমার বন্ধুর নামের খুব মিল। স্যার হলেন জেবিএম। জগবন্ধু মুখার্জি। আমার গজু জিবিএম। গজবন্ধু মহান্তি। বিরাট বড়লোক।

অতএব আর কী চাই? ফোন করে আমাদের ইচ্ছেটা যথাস্থানে জানিয়ে দেওয়া হল। ভিআইপি কোটাতেও কামরূপ এক্সপ্রেসের টিকিট পাইনি। তাই যাচ্ছি কাঞ্চনজঙ্ঘায়। অনন্তবাবু ফার্স্ট ক্লাসের কথা বলেছিলেন। মামা সোজা নাকচ করে দিলেন। বলেছেন,—এদেশের আশিভাগ মানুষ যেভাবে যাতায়াত করে, সেভাবেই যাব।

তবে আমাদের দুর্ভোগ হয়েছে খুব। মালদা ছেড়ে সন্ধেয় নিউজলপাইগুড়ি জংশনে গিয়ে আবার ট্রেন থেমে ছিল ঝাড়া দু-ঘণ্টা। মুষলধারে বৃষ্টি, কামরার মেঝে জলে ছপছপ। পরদিন ন'টায় নিউবঙ্গাইগাঁও অবধি তবু ট্রেনটা এল কোনওক্রমে। তারপর যেন আর চলেই না!

যাবে কী করে? বন্যার ভয়াবহ ছবি গোটা অসম জুড়ে। যতদূর চোখ যায় জল। ঘোলা জল পাক খাচ্ছে। বাড়িঘর, খেতখামার সব জলের তলে। শুধু উঁচু-উঁচু তাল-নারকেল-খেজুর গাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা জেগে আছে। জল এসে ধাক্কা মারছে অনেকটা উঁচু রেললাইনেও।

শেষ পর্যন্ত থেমে-থেমে, সন্তর্পণে কাঞ্চনজঙ্ঘা গুয়াহাটি পৌঁছোল বেলা তিনটের পরে। বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, এত দেরি পর্যন্ত কি আর অনন্তবাবুর বন্ধু থাকবেন?

সে ধারণা ভুল। গজবন্ধু দাঁড়িয়ে ছিলেন।

রাত কেটেছে গজবন্ধুর বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে। আজ ভোর সাতটায় রওনা হয়েছি শিলং-এর দিকে। ওঁরই অ্যাম্বাসাডারে। উনিও চলেছেন আমাদের সঙ্গে। ওর কিছু জরুরি কাজ আছে।

পাহাড়ি পথের ধার দিয়ে লোকেরা প্রচুর গরু নিয়ে চলেছে লাইন দিয়ে।

—এত গরু! যাচ্ছে কোথায়?

কেন, শিলং-এ!—গজবন্ধুবাবু বললেন,—গরুর মাংস খাসিদের প্রিয় খাদ্য। ওদের বেশিরভাগ খ্রিস্টান, খাওয়ার কোনও নিয়মনিষেধ নেই। শীতের দেশ। বিফ সস্তায় হাই প্রোটিন।

অ্যাম্বাসাডার থেমে গেছে। চেক পোস্ট।

দুজন খাসি পুলিশ এগিয়ে এল। নি:শব্দে কয়েকসেকেন্ড দেখল আমাদের, ভিতরে উঁকি মারল। তারপরে ইশারা করল, পোস্ট উঠে গেল।

—কী ব্যাপার গজুবাবু? কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

—না ডক্টর মুখার্জি। এটা রুটিন চেকিং। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে চায়।

— অনুপ্রবেশ! লুকিয়ে আসে নাকি?

—হ্যাঁ। নেপালিরা। দলে-দলে নেপালি বর্ডার পেরিয়ে চলে আসছে। অভাবের তাড়নায়। ওদের দেখতে খাসিদের মতোই। একবার শিলং-এ ঢুকতে পারলে মিশে যাবে।

ক্যাঁচ-চ! যা:, টায়ার পাংচার।

গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। ডানদিকে বিশাল বড়াপানি লেক। এখান থেকে জল সাপ্লাই হয় শিলং-এ। শিরশিরে বাতাস বইছে।

পিঠে হাত দিলেন অনন্তবাবু। বললেন,—কী ফাইন, জায়গা! চলো একটু ওয়াক করে আসি।

বাঁ-দিকে খাড়া পাহাড়, ডানদিকে সবুজ ঢাল নেমে গেছে তার মাঝে জল, আবার কুয়াশামাখা বিস্তীর্ণ পাহাড়। রোদ্দুর-মেঘ-কুয়াশা মাখামাখি।

অনন্ত সরখেল গেয়ে উঠলেন,—আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ... হেসে যায় রৌদ্র ছায়া...বর্ষা নামে...

ওফ, আবার!—আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। রবীন্দ্রনাথ ফিনিশ! কতবার বলেছি অনন্তবাবু কথাগুলো—

—হাই! হাই সারখাল!

হেঁড়ে বিদেশি-গলার ডাক!

অনন্তবাবু চলে গেছেন ট্যাক্সিটার কাছে। ট্রেনের দুই সায়েব তরুণ-তরুণী। সাদা চামড়া হলেই বুড়ো এমন আদেখলাপনা শুরু করেন।

—হোয়ার ইউ গোয়িং?

—শিলং। ইউ?

—শিলং।

—ওকে। সি ইউ, বা-ই!

ওরা হাত নাড়ল। ট্যাক্সি স্টার্ট দিল। পিছনে বেজে উঠেছে আমাদের গাড়ির হর্ন। চাকা পালটানো হয়ে গেছে।

আবার গাড়ি ছুটেছে। একটা পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই গজবন্ধু বললেন,—ওই যে দেখুন। শিলং পাহাড়।

দূর পাহাড়ের গায়ে পুতুলের মতো ছোট্ট-ছোট্ট বাড়িঘর। মেঘে আবছা। গজবন্ধু বললেন,—শিলং-এ বৃষ্টি হচ্ছে।

ঢুকে পড়লাম শিলং-এ। ঝিরঝির বৃষ্টি। ছবির মতো রঙিন নানা চেহারার বাড়ি-বাংলো, ঝকঝকে তকতকে চওড়া সব রাস্তা। বিট্রিশদের প্রিয় হিল-স্টেশন 'স্কটল্যান্ড অফ দা ইস্ট!'

—ডক্টর মুখার্জি, ডক্টর শর্মার বাড়ির অ্যাড্রেস আছে তো?

—হ্যাঁ, আপল্যান্ড রোড, লাইমুখরা, শিলং।

ড্রাইভারের এই শহর অতি চেনা। অ্যাম্বাসাডার ডানদিকে ঘুরল, তারপর একটা টিলাকে পাক দিয়ে উঠতে শুরু করল।

গোঁ-গোঁ শব্দে গাড়ি পনেরো মিনিট ধরে উঠল। খানিকটা চাতালের মতো জায়গা। দু-চারটে দোকানপাট, বাজার।

ড্রাইভার বলল,—এটাই লাইমুখরা। কোন বাড়ি যাবেন, পুছুন সাব।

গজবন্ধু পানবিড়ির দোকানদারকে শ্যামাদাসবাবুর নাম বললেন। সে বাঁ-দিকে হাত দেখাল।

কিন্তু আধমিনিট যেতে না যেতে গাড়ি আটকে গেল। আর এগোবার পথ নেই। সরু রাস্তা। পুলিশের জিপ, মারুতি, অ্যাম্বাসাডারে একেবারে ভরতি। দু-চারটে লালবাতি লাগানো গাড়িও রয়েছে।

—নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে!—চলুন, হেঁটে যাওয়া যাক।

সামনে পুলিশ ভ্যান পড়ল। ড্রাইভারকে গজবন্ধু জিগ্যেস করলেন,—এখানে কী হয়েছে?

সে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলল,—খুব নামকরা একজন লোক কাল রাতে কিডন্যাপ হয়েছে। মিনিস্টার এসেছেন।

—নামকরা লোক? কী নাম তাঁর?

—কোনও শর্মা।

শর্মা!!! সে কী!

আমরা কিংকতর্ব্যবিমূঢ়।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জগুমামা সামলে নিলেন। ছুটলেন বাড়ির দিকে।

সায়েবি বাংলো, ধবধবে সাদা রং। পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ।

মামা স্ট্রেট ঢুকে পড়লেন বাড়ির ড্রইংরুমে।

ড্রইংরুমে চিন্তিত মুখে সুট-টাই সজ্জিত মানুষ ও ইউনিফর্ম পরা পুলিশকর্তা কয়েকজন বসেছিলেন। তাঁদের একজন পাশের পুলিশ কর্তাকে বললেন,—হু ইজ দিস ফেলো? হাউ হ্যাজ হি এনটারড?

—ওয়ান মিনিট। আয়াম কামিং ফ্রম ক্যালকাটা। ডক্টর শর্মা ইনভাইটেড আস। হি হিজ মাই ফ্রেন্ড।

মানুষটার মুখের চেহারা বদলে গেল। বললেন,—সরি প্লিজ টেক য়োর সিট।

সবার ওপর চোখে বুলিয়ে নিয়েছি। একদম কোণের একজন ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ে পুলিশের একজনকে ফিসফিস করে কিছু বললেন। তিনি আবার পাশের জনকে সেটা বললেন।

মামা কথা শুরু করে দিয়েছেন। বললেন, ঘটনাটা কখন ঘটল? কীভাবে?

—যতদূর জানি, কাল রাত দশটা নাগাদ ডক্টর শর্মার একজন পরিচিত লোক এসেছিল। তাকে দেখে উনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তার পরেই—

স্যার।—বয়স্ক এক পুলিশ কর্তা বাধা দিয়ে বললেন,—আমি ওঁকে দুয়েকটা প্রশ্ন করব।

—ওহ, সিওর!

লক্ষ করলাম, ঘরের মধ্যে একজন খাসি লোক এসে দাঁড়িয়েছে। পোশাক, হাবভাব দেখলে বোঝা যায়, কাজের লোক।

—আপনার নাম?

—জগবন্ধু মুখার্জি।

—নাইস! আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। নেমকার্ডটা আপনার তো?

একটা ভিজিটিং-কার্ড মামার দিকে এগিয়ে দিলেন। মামার কার্ড, দিল্লির ঠিকানা, ফোন আর ডিগ্রি লেখা।

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

পুলিশকর্তা এবার দুর্বোধ্য খাসিয়া ভাষায় কাজের লোকটিকে অনেক কিছু জিগ্যেস করলেন। সে ঘাড় নাড়ছিল।

পুলিশকর্তা খাসিয়া ভাষায় সকলকে বললেন, তারপর শান্তগলায় বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, নাও উই আর কনফার্মড। আমাদের সঙ্গে চলুন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!

জগুমামা অ্যারেস্টেড? ক্রিমিন্যাল টেররিস্ট? বজ্রপাত হলেও এত হতভম্ব হতাম না। কী বলছে?

মামা স্তম্ভিত! কথা বলতে পারছেন না। একটু পরে কাঁপাগলায় বলতে পারলেন,—মানে? চ-চার্জটা ক-কী?

—ভেরি সিম্পল। ফর কিডন্যাপিং ডক্টর শর্মা।

—মানে? আমরা এইমাত্র শিলং-এ ঢুকছি। সঙ্গে আমার ভাগ্নে। তা ছাড়া—

ওসব কোর্টে বলবেন।—পুলিশকর্তা বললেন,—কাল রাতে ডক্টর শর্মাকে তুলে নিয়ে কোথাও রেখে আসা হয়! ডক্টর শর্মার সার্ভেন্ট আপনাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলেছে। হিয়ার ইট এন্ডস। চলুন!

৩

কোনওভাবেই আমার এখনকার মানসিক অবস্থাটা বোঝাতে পারব না। ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, সব বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছে! কী করব, কোথায় যাব, কাকে ধরব কিছুই মাথায় আসছে না।

এরকম যে কখনও ঘটতে পারে, দু:স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার মামা, ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি, যাঁর বন্ধু সিবিআই-এর ডিজি সত্যসাধন পট্টনায়েক—

হ্যাঁ, পেয়েছি! পেয়েছি!

অনন্ত সরখেল এসে অবধি সেই যে ইয়ুথ হোস্টেলের বিছানায় চিতপাত হয়েছেন, আর নড়াচড়া নেই। ঘরের ছাদের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ফোন ডায়েরি বের করলাম। অনন্তবাবুকে বললাম,—একটা ফোন করে আসছি।

অনন্ত সরখেল তাকালেন। শূন্য দৃষ্টি। জবাব দিলেন না। রাস্তার উলটোদিকে টেলিফোন একসচেঞ্জ।

পরপর তিনটে ফোন করে ফিরছি। মন কিছুটা শান্ত। প্রথম ফোন, পট্টনায়েক আঙ্কলকে। উনি আজকেই আসছেন। যেভাবেই হোক!

দ্বিতীয় ফোন করেছি বাড়িতে। বাবাকে পেয়ে গেছিলাম! হালকা করে বললাম। না বলে উপায় নেই। কারণ নিশ্চিতভাবে কাল সকালে এটা নিউজ হবে। এটাও বলেছি পট্টনায়েক আসছেন। একটা ব্যবস্থা হবে।

তৃতীয় ফোন করেছি মেঘালয় রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি সুবীর চ্যাটার্জিকে, পট্টনায়েকের কথামতো। ওঁর বিশেষ বন্ধু, জগুমামাকে নামে চেনেন। শুনেই আঁতকে উঠেছেন। বললেন,—দেখছি।

হোস্টেলের দোতলায় উঠতে-উঠতে কানে ভেসে এল কথাবার্তা।

আমাদের রুমে গজবন্ধুবাবু ও আরেকজন ভদ্রলোক। কুর্তা জ্যাকেট পাজামা পরনে। চোখে সরু চশমা, ব্যাকব্রাশ চুল। ভদ্রলোককে কোথায় যেন দেখেছি।

গজবন্ধু বললেন,—তোমার জন্যেই ওয়েট করছিলাম। আলাপ করিয়ে দিই। মাস্টার অর্ণব ভট্টাচার্য, ডক্টর মুখার্জির ভাগ্নে। ইনি প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর, ডক্টর শর্মার মোস্ট ক্লোজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট।

—নমস্কার। আপনাকে খুব চেনা-চেনা লাগছে।

আজ সোকালেই দিখেছেন!—ভাঙা-ভাঙা বাংলায় প্রাণকৃষ্ণ বললেন,—শর্মাজির ড্রোইংরুমে।

—হ্যাঁ, ঠিক। এককোণে বসেছিলেন।

—হামার ভি ইতো খারাপ লাগিতেছে! ডক্টর মুখার্জির মোতোন সায়েন্টিস্ট, ত...ত...ত..., লেকিন যো সাচ উ তো প্রুফ হইবেই।

—সাচ? কোনটা সাচ?

—ই কিডন্যাপিং কেসটা। এক উইক পহলে ভি ইখানে আসিয়েছিল তুমার মামাজি। শর্মাজির ঘরে বহোত সা কোথাবার্তা হল হামার সাথে। ফির কাল ভি সনঝায়, হামি শর্মাজির ঘরসে চলিয়া আসিল, তব পর ভি উ দোনো বাতচিত করিতেছিল।

—কী বলছেন, এসব? এ হতেই পারে না! অ্যাবসার্ড! এই যে গজবন্ধুবাবু, ওর সঙ্গে আজ শিলং-এ ঢুকেছি।

—ওহি তো হামি ভি শোচছে। ব্রাদার! ইকটা কথা বোলো। মুখার্জিসাব কোই ওকাল্ট-সায়েন্স লিয়ে রিসার্চ কোরতেন?

ওকাল্ট-সায়েন্স! তাঁর মানে ভূতপ্রেত চর্চা, তন্ত্রমন্ত্র, ডাকিনী বিদ্যা! রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল।

—মামা ওসব মোটেই বিশ্বাস করেন না।

—বুঝলম। তব তো বোলার কুছু নাই। গজুবাবু, অরণবের উমর তো ওল্লো, শায়দ, গুসসা হোসসে। তুমহি বোলো, ইসব বহোত গুপৎ বিদিয়া হ্যায় না?

—রাবিশ! একটা কথা বলবেন মিস্টার ঠাকুর? আমার মামা তাঁর বন্ধুকে শুধু-শুধু কিডন্যাপ করতে যাবেন কেন?

ইটা মৎ বোলো তুম!—প্রাণকৃষ্ণ বললেন,—উনকা মোটিভ বহোত স্ট্রং। শুনো, শর্মাজিকা রিসার্চ সাবজেক্ট ইউনিক থা, সে সাকসেসের নজদিক পহুঁছে গিয়াছিল। উস পেপার যিসকো মিলে যাবে, উ তো রাজা। এক সেকেন্ডে ওয়র্ল্ড ফেমাস হোয়ে যাবে।

ছি:-ছি:, ভাবতেও আমার শরীর ঘিনঘিন করছে! জগুমামার মতো বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী অন্যের গবেষণা চুরি করবেন, এরকম ভাবা হচ্ছে?

প্রাণকৃষ্ণ আবার বললেন,—তুমার মামাজি, তুমার কষট হামরা বুঝছে। ইক কাম করো, সিধা মামাসে মিলো। বোলো, খুল্লামখুল্লা সোব বোলতে। তোবেই সোব মিস্ট্রি সলভ হইবে। গজু হামরা দোস্ত। অব গজুর দোস্ত তুমরা। ইসিলিয়ে হামি এসেছে তুমাদের এডভাইস করতে। হামার কি দোরকার বোলো? হাঁ, কুছু জরুরত পড়ে তো চলিয়া আসবে। পুলিশ বাজারে, জেল রোডে হামার মকান।

—প্রাণকৃষ্ণ এগোলেন দরজার দিকে। পিছন-পিছন গজবন্ধু।

এই সময় নেপালি বয় এসে বলল,—সাব, অফিসে আপনার ফোন এসেছে।

আমি গিয়ে ফোন তুললাম,—হ্যালো।

—হ্যালো। অর্ণব? আমি সুধীর চ্যাটার্জি বলছি।

—বলুন সুধীরদা। কিছু উপায় বেরোল?

—না রে ভাই! যতক্ষণ না ডক্টর শর্মাকে খুঁজে বার করা যাচ্ছে, ততক্ষণ সাক্ষিসাবুদ, ঘটনা পরম্পরা সব সন্দেহ ডক্টর মুখার্জির দিকে যাচ্ছে। পট্টনায়েক সায়েবকে আসতে দাও, তারপর দেখা যাবে। তবে আমি ডিজি জেলকে ফোনে বলে দিয়েছি, ওঁকে মেন্টাল বা ফিজিক্যাল টর্চার যেন না করা হয়। ভিআইপি প্রিজনারদের সুযোগসুবিধে যেন দেওয়া হয়।

—কোনওরকম জামিনের ব্যবস্থা করা যায় না?

—না ভাই! অ্যারেস্ট করা হয়েছে নন-বেলেবল পেনাল সেকশনে।

—আজ বিকেলে মামার সঙ্গে দেখা করতে চাই। করা যাবে কি?

—ব্যবস্থা করছি। ড্রাইভারকে চারটেয় ইউথ হোস্টেলে পাঠিয়ে দেব। রেডি থেকো।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একজনের চেহারায় যে এতখানি পরিবর্তন হতে পারে, জগুমামাকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যে সেলে মামাকে রেখেছে, সেটা ওয়েল ফার্নিশ্ড। সাধারণত ভিআইপি রাজনৈতিক নেতারা থাকেন। কিন্তু তাতে কী, আফটার অল জায়গাটা জেল! কয়েক ঘণ্টায় জগুমামার বয়স বেড়ে গেছে কয়েক বছর! তবে চোখ দুটোয় এখনও বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।

এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি দেখে এক অদ্ভুত হাসিতে মুখ ভরে গেল জগুমামার। বললেন,—কিরে ভাগ্নে কী দেখছিস? জগবন্ধু মুখার্জি এত সহজে হার মানে না। ষড়যন্ত্র, জঘন্য ষড়যন্ত্র! তবে এ জাল আমি ফাঁস করবই।

আমি জানি মামা।—আবেগে আমার গলা বুজে আসছিল। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে সারাদিনের সবকিছু রিপোর্ট করলাম। এমনকী প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুরের ওকাল্ট সায়েন্সের ব্যাপারটাও।

অনন্তবাবু সঙ্গে ছিলেন। সকালের মৌনী দশা কাটিয়ে উঠলেও বিশেষ কথা বলেননি।

ফিরতে-ফিরতে এসব কথা ভাবছিলাম। এই রহস্যের তদন্ত কোনদিক দিয়ে শুরু হবে?

হঠাৎ অনন্তবাবু ফিসফিস করে বললেন,—গজুর বন্ধু সকালে যা বলে গেল, ওরকম হতে পারে না? ও-ও তো বিজ্ঞানী।

—মানে?

—না, মানে বলছিলাম কী।—শরীরটা একজায়গায় আর ধরো উইল ফোর্স দিয়ে মনটা, মানে আত্মা অন্য জায়গায় গিয়ে—

—ধ্যাৎ। কী আবোলতাবোল বাজে বকছেন! জগুমামা মানে সায়েন্টিস্ট জগবন্ধু মুখার্জি এই ভাবে ক্রাইম করে বেড়াচ্ছেন, বলতে চান?

—ছি:-ছি: সেটা বলিনি। বলছি, এরকম কি কোনওভাবে সম্ভব?

—বিজ্ঞান মানে না! বিজ্ঞান বলে, এ বুজরুকি।

ফিরে হোটেলে ঢুকছি, নেপালি ছেলেটা বলল—সাব, টেলিফোন।

—হ্যালো।

—হ্যালো। পট্টনায়েক বলছি। টুকলু?

—হ্যাঁ। আঙ্কল...আপনি কোথায়?

—গৌহাটি। এইমাত্র পৌঁছেছি। কোনও গাড়ি এই রাতে যেতে চাইছে না। কী খবর? ডক্টর মুখার্জির—? এনি ডেভেলপমেন্ট?

—না। পুলিশ কাস্টডিতে আছেন। তবে সুধীরবাবু বলে দেওয়ায় ভি. আই. পি. ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন। এইমাত্র দেখা করে এলাম।

ঠিক আছে। কাল সকালে পৌঁছচ্ছি। চিন্তা কোরো না।...

এই সময়—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ দোতলা থেকে বুকফাটা আর্তনাদ ভেসে এল।

আমি তিনলাফে দেতালায়। সর্বনাশ! চিৎকার আসছে আমাদের ঘর থেকে।

ভেজানো দরজা খুলে আমার চক্ষুস্থির।

অনন্ত সরখেল কাটা কলাগাছের মতো পড়ে আছেন মেঝেতে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, মুলোর মতো দাঁতগুলো ছেতরে আছে। একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে—অঁ...অঁ...অঁ...অঁ...!

—অনন্তবাবু! ও অনন্তবাবু কী হল?

অঁ...অঁ...অ্যাঁ...ক-কে-কে? ট-টুকলু?

অনন্ত সরখেলের চোখ স্বাভাবিক হয়ে এল, মুখ বন্ধ হল। উঠে বসলেন। ঢকঢক করে জল খেলেন।

তার পরেই আমার হাত জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠলেন,—ভাই রে! এখনি মরে যাচ্ছিলুম। চলো পালিয়ে যাই।

—আশ্চর্য! কী হয়েছে বলবেন তো?

—স-স্যার!

স্যার! মানে মামা! কোথায়?

—এইখানে! হ্যাঁ, এইখানে! এইমাত্তর এসেছিলেন, তুমি ফোন ধরতে ঢুকলে। আমি ঘরে এসে সবে লাইট জ্বালিয়েছি। বিশ্বাস করো ভাই, উনি আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় বললেন,—অনন্তবাবু কেমন আছেন? আমি চমকে উঠেই, উরিব্বাপ! স্ট্রেট ননসেন্স!

—কী বলছেন যা-তা? ইমপসিবল!

পসিবল ভাই, বিলকুল পসিবল। আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভাই—

—মামা কী পরেছিলেন?

—অত কি দেখার মতো অবস্থায় ছিলুম নাকি? তবে...হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে —বোধহয় লাল জামা সাদা প্যান্ট।

—চলুন তো।

—ওঁকে টান মেরে ছুটলাম গেটের দিকে। গেট পেরিয়ে সোজা বড় রাস্তায়।

কোত্থাও কারও চিহ্ন নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল দূ-রে একটা চলমান বিন্দু। আমরা আন্দাজে ওইদিকেই ছুটলাম।

সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প জ্বলছে। বিন্দু এখন মানুষের চেহারা নিয়েছে। ছুটে চলেছি...লোকটাও কি হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে...?...

পরের লাইট পোস্টের কাছে পৌঁছেছি। সরখেল বলে উঠলেন,—ওই! ওই যে লাল জামা সাদা প্যান্ট। ডাকব?

—দাঁড়ান। অন্য কেউ হলে বাজে ব্যাপার হবে। পিছন থেকে অনেককেই একরকম লাগে।

একেবারে কাছাকাছি...মানুষটা একমনে হেঁটে যাচ্ছে...ও কি মানুষ?

বুক ছ্যাৎ করে উঠল। সামলে নিয়ে পিছন থেকে স্পর্শ করলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

যা ব্বাবা! অন্য মানুষ। পরিষ্কার কামানো মুখ চশমা নেই। ব্যাক ব্রাশ চুল। ভ্রু কুঁচকে বলল,—কে আপনারা?

—সরি স্যার। অন্য কেউ ভেবেছিলাম।

মানুষটি একবার দেখল। তারপরে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। অনন্ত সরখেলের উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। বুড়োটা দাড়ি চুলকোচ্ছে।

যতটা এসেছি, ততটাই পিছনে হাঁটা। খুব ক্লান্ত লাগছে।

দূরে ইয়ুথ হোস্টেলের আলো জ্বলছে। জুতোর নীচে কিছু ঠেকল। ছোট্ট নীল ডায়েরি।

ডায়েরি নয়, ড্রাইভিং লাইসেন্স। প্রথম পাতাতেই মালিকের ছবি। আশ্চর্য! ওই লোকটা, যার পিছনে ছুটছিলাম। বেচারির পকেট থেকে পড়ে গেছে।

থাক, এটা। কাল সকালে ঠিকানা দেখে পৌঁছে দেব।

৪

ছুটছি। ছুটছি ঝড়ের বেগে। জগুমামাকে ধরতেই হবে। কিন্তু কিছুতেই দূরত্ব কমছে না।...প্রাণপণে ডাকছি, —মামা! দাঁড়াও দাঁড়াও!...

মামা থামছেন না। ছুটে চলেছেন। পিছনে আমিও। এ রহস্যের শেষ কোথায়, দেখতেই হবে।

দুপাশে ঘন জঙ্গল। বিকেলের আলো মরে আসছে, দ্রুত অন্ধকার নামছে। পাহাড়ি পথ!...

জঙ্গল শেষ হয়েছে, এবার শহর। কিন্তু মামা দূরেই থেকে যাচ্ছেন...

পুরো ফাঁকা রাস্তা। একটাও লোক নেই।...জগুমামা ঢুকে গেলেন একটা বাড়ির ভিতরে। এটা জেলখানা। আমিও ঢুকে পড়লাম।

জেলের মধ্যে ছোট-ছোট খুপরি...মামা খুপরিগুলোকে ডানে, বাঁয়ে রেখে ঢুকে পড়লেন একটা খুপরিতে। পিছন-পিছন আমিও।...

ঢুকেই আতঙ্কে শিউরে উঠেছি। এ কী! দুজন জগুমামা। একজন বসে বই পড়ছিল, অন্যজন পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর?...তারপর...দাঁড়ানো জগুমামা ধীরে-ধীরে ঘেঁষে এল বসে থাকা জগুমামার কাছে। আচমকা এ-ওর শরীরে মিশে গেল। দুজন এক হয়ে গেল।

তারপর জগুমামা বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন,—টুকলু, ভালো আছিস?...

—আঁ...আঁ...বাঁ...চাঁ...ও...ও...ও...

চোখ খুলে গেল। উ:, কী ভয়ংকর স্বপ্ন! শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

বাঁ-হাতের কবজি তুললাম। ন'টা বেজে গেছে! জানালায় ভারী পরদা টানা, ঘরের ভেতর অন্ধকার।

অনন্তবাবু নাসিকা গর্জনে অঘোর।

—অনন্তবাবু, উঠুন! অনন্তবাবু!

—ওরে বাবা! আর করব না। এবারের মতো ছেড়ে দাও!

—কী ছেড়ে দাও? ধ্যাৎ! উঠুন। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

অনন্তবাবু প্রথমে বাঁ, তারপর ডান চোখ খুললেন। বললেন,—অ! আমি ভাবলুম—

—জগুমামার ভূত? ভিতুর ডিম! উঠে পড়ুন।

ব্রাশ-ট্রাশ করে, বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

কিন্তু পট্টনায়েক আঙ্কলের কী ব্যাপার? ভোর পাঁচটায় যদি গৌহাটি থেকে রওনা হন, তবে আটটার মধ্যে শিলং এসে যাওয়ার কথা। আবার কি কোনও ঝামেলায় পড়লেন?

নেপালি বয়কে ব্রেকফাস্ট দিতে বলে অফিসে ঢুকে পড়লাম। এখানে টেলিফোন আছে, কিন্তু চাবি দেওয়া থাকে। কেবলমাত্র রিসিভ করা যায়। তবে এই সময়ে চিফ ওয়ার্ডেন মহিলা থাকেন।

—গুড মর্নিং ম্যাম।

মর্নিং।—মহিলা ফাইল থেকে মুখ তুললেন। বললেন,—প্লিজ টেক য়োর সিট। টেল, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর যু?

—ম্যাম, চিফ সেক্রেটারি সায়েবকে একটা আর্জেন্ট কল করতে চাই। উনি আমার আঙ্কলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু...একটা বিপদে পড়ে গেছি।

মহিলা নি:শব্দে আমায় মাপলেন। ফোনের লক খুলে দিলেন।

—হ্যালো, অর্ণব বলছি। সুধীর চ্যাটার্জি আছেন?

—হ্যাঁ অর্ণব। বলো।

—সুধীরদা, পট্টনায়েক আঙ্কল এখনও আসেননি!

—আসেননি? এসে পড়বেন।....আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে তোমায় জানাচ্ছি।

ফোন রাখলাম। সঙ্গে-সঙ্গে চোখ চলে গেল সেন্টার টেবিলে রাখা লোকাল কাগজগুলোর ওপর। প্রায় সবগুলোর প্রথম পাতায় খবরটা ছাপা হয়েছে।

Scientist Arrested!...

বুক কেঁপে উঠল। বোধহয় দেশের প্রায় সব কাগজেই আজ মুখরোচক খবর হিসাবে ছাপা হয়েছে।

—ক্যান য়ু হেল্প মি?

—ছিটকে বাইরে চলে এসেছি। গলা আমার এত চেনা!

সত্যসাধন পট্টনায়েক। সঙ্গে এক ভদ্রলোক। চিনি না। মনে হল, যেন মরুদ্যান পেয়ে গেছি। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছিল। ছুটে গিয়ে ওঁর দু-হাত জড়িয়ে ধরলাম।

পট্টনায়েক হাসলেন। বললেন,—বেরোতে লেট হয়ে গেছে। রাস্তায় এত ফগ...চলো। সব শুনব। তার আগে—

বলে পাশের ভদ্রলোকের পরিচয় দিলেন,—ইনি আমাদের* 'র-র' ডিজি। ডক্টর মোহন দ্বিবেদী। আমার কাছে খবরটা শুনে হি ওয়জ সো শকড, চলে এলেন, ডক্টর মুখার্জির খুব পরিচিত।

নমস্কার!—নামটা মনে পড়ল না।

আরে বেটা, সব ঠিক হো যায়েগা।—ভদ্রলোক বললেন,—তুমিই তো টুকলু। তুমাকে হামি কোতো ছোটো দিখেছে।

একমাথা কাঁচাপাকা উস্কোখুস্কো চুল, মুখভরতি পাকা দাড়ি, চোখে গোল-গোল চশমা, নাহ জীবনে কোনওদিন এঁকে দেখিনি।

দ্বিবেদী মুখ দেখে আন্দাজ করলেন। বললেন,—আরে বেটা, মোনে ক্যায়সে পড়বে? হামি যেখোনে তুমাদের ঘর গিয়েছিল, তব তুমি ইত্তোটুক, মুখার্জির গোদমে ছিলে।

অনন্তবাবুর সঙ্গে শুভেচ্ছাপর্ব শেষ করে চারজনে ঘরে বসেছি। পট্টনায়েক বললেন, —কাল ফোনে তুমি আচমকা বলতে, মনে হল চোখে অন্ধকার দেখছি। তারপর ভাবলাম—

—দুষমন তো কমতি নেই মুখার্জির। উদের মধ্যে কোই না কোই রিভেঞ্জ লিয়েছে।

—হতে পারে। টুকলু, এবার বলো, পরপর কী-কী ঘটেছে।

দ্বিবেদী বললেন,—হাঁ—হাঁ, কুছু বাদ দিবে না।

ট্রেনে ওঠা থেকে শুরু করে সব বলে গেলাম। কাল পর্যন্ত।

ব্রেকফাস্ট এসে গেছে। টোস্টে কামড় দিয়ে অনন্তবাবু বললেন,—ভাই টুকলু, তুমি মালদার ঘটনাটা বললে না? আমরা আমসত্ব আনতে গিয়ে স্যারকে—

বোলেন। সোব খুলে বোলেন।

অনন্তবাবু মালদার ঘটনাটা বললেন। তার সঙ্গে বিদেশি তরুণ-তরুণীর শিলং-এ আসার ব্যাপারটাও যোগ করলেন।

পট্টনায়েক চুপ। ঘন-ঘন সিগারেট খাচ্ছেন আর বাঁ-হাতে টেবিলে টোকা দিচ্ছেন। একটু পরে বললেন,—অনন্তবাবু, আপনি গজবন্ধুবাবুকে কদ্দিন চেনেন?

—অনেকদিন। বছর কুড়ি।

—মোহনলাল দ্বিবেদী কিন্তু এইসব কথাবার্তা খুব আমল দিচ্ছেন না। বুড়ো হলেও লোকটা বেজায় ছটফটে। মুখে একটা আধপোড়া চুরুট ঝুলিয়ে সারাঘর ঘুরছেন।

হঠাৎ টেবিল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্সটা তুলে চোখের সামনে ধরলেন। বললেন,—টুকলু ইটা কার আছে? তুমার কোই দোস্ত-উস্ত—?

—না-না—। কাল সন্ধেয় যাকে মামা ভেবে ফলো করেছিলাম, তার। মনে হয়, পকেট থেকে পড়ে গেছিল।

—ইটা আমার কাছে থাক। পটনায়েকজি পুলিশকো দে দেগা।

বলেই কোটের পকেটে পুরে ফেললেন। ফের বললেন,—হাঁ ওহি যো সায়েন্টিস্টি-এর কথা বোললে, যো ওকাল্ট-সায়েন্সের কোথা বোললো, উসকা পাতা হ্যায়? ওহি অ্যাঙ্গেলেও শোচনা পড়েগা।

ওকাল্ট সায়েন্স?—পট্টনায়েক বিরক্তির সুরে বললেন,—কী বলছেন, বুঝতে পারছি না। যত্তসব বোগাস ব্যাপার।

—নোও, নো সার! আঁখ অওর কান সোবসময় খুলা রাখিবেন। হামাদের ইনভেস্টিগেশনে সোব কুছ অ্যানলিসিস করনা পড়তা। টুকলু, অ্যাড্রেসটা বোলো। হাঁ, জগুবাবুর সামান কুথায়?

—ওই যে।

—ডক্টর মুখার্জির লাগেজ নিয়ে আপনি কি করবেন? একটু ঠান্ডা হয়ে বসুন না!

তাজ্জব বাত! আরে পট্টনায়েকজি আপনি গুসসা হোচ্ছেন কেনো? হামায় কাম করতে দিন।

সত্যসাধন অসহায়ভাবে বললেন,—কপালে গভীর দুর্ভোগ আছে!

জগুমামার ব্যাগ নিয়ে বুড়ো ব্যস্ত। পট্টনায়েক বললেন,—টুকলু, আমরা দুজন ডক্টর মুখার্জির সঙ্গে দেখা করে আসছি। তারপর আমাদের ডেফিনিট লাইন ধরে প্রসিড করতে হবে। আমার মনে হয়, প্রথমেই যাওয়া উচিত—

লাইমুখরায়!—ব্যাগ ঘাঁটলে কী হবে, বুড়োর কান এদিকে। বলতে শুরু করলেন, ডোক্টোর শর্মার মাকান ঘুরে সেকেন্ড যাবে উনকা ডিপার্টমেন্ট। থার্ড—

—আপনি এখন উঠুন!

৫

অভিশপ্ত লাইমুখরা!

শিলং-এর এই শহরতলি দেখতে যতই সুন্দর হোক, যতই এখানে পাহাড়ের বুকে মেঘ-রোদ্দুরের খেলা চলুক, আমার কাছে 'লাইমুখরা' অভিশপ্ত।

সেখানেই দ্বিতীয়বার এলাম।

ডক্টর শ্যামাদাস শর্মার সাদা বাংলোর চারপাশে পুলিশ প্রহরা।

পট্টনায়েক জিপ থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন। পুলিশ অফিসার এসে স্যালুট ঠুকলেন,—স্যার! আসুন!

—বাংলো পুরো ভ্যাকেন্ট তো?

—হ্যাঁ স্যার। সব ঘরই আন্ডার লক অ্যান্ড কি।

—কেয়ারটেকার কোথায়?

—পাশের বস্তিতে থাকে স্যার, খবর দেব?

—হ্যাঁ।

চারজন ঢুকে পড়েছি ডক্টর শর্মার শোবার ঘরে। পাশেই ল্যাবরেটরি কাম স্টাডি।

শোওয়ার ঘরে ফার্নিচার তেমনকিছু নেই। একটা দেয়ালজোড়া ওয়ার্ড্রোব সারি-সারি জামা-প্যান্ট, অ্যাপ্রণ ঝুলছে। ছোট একটা ড্রেসিং টেবিল। দেওয়াল-আলনায় তোয়ালে, রুমাল টুকিটাকি। চওড়া খাটে নিভাঁজ বেডকভার।

পট্টনায়েক বললেন,—কী বুঝছেন দ্বিবেদীজি?

—আভি কুছু বুঝছে না। ল্যাবরেটরিতে যাই।

হনহন করে এগোলেন। অনন্ত সরখেল আমার কাঁধ খিমচে বললেন,—আমার ভাই এই লোকটার হাবভাব সুবিধের লাগছে না।

—ধুর। দিনের বেলা। এত পুলিশ।

ল্যাবরেটরিতে নতুন কিছু চোখে পড়ল না। সারি-সারি ফানেল-বিকার, টেস্টটিউব আর প্রচুর ইলেকট্রিক তার। টেবিলে একটা খাতা, তাতে প্রচুর অঙ্ক। একধারে একগাদা বই। মোহনলাল ঝুঁকে পড়ে বইগুলো উলটোপালটে দেখতে লাগলেন। পুলিশ অফিসার এসে বললেন,—স্যার, কেয়ারটেকার এসেছে।

সেই লোকটা! পরশুদিন যে আইডেন্টিফাই করেছিল বলে জগুমামার মাথায় চরম কলঙ্কের বোঝা! মোহনলাল দ্বিবেদী আলাপ শুরু করে দিলেন।

—তুমি কোতোদিন আছে?

—দু-বছর।

—তুমি রাতে ইখানে থাকতে?

—না বাবু। দিনে আসতাম। সারাদিন কাজ করে বস্তিতে শুতে যেতাম।

—যেদিন বাবু গায়েব হোলো, উসদিনকি বারেমে বোলো।

—সন্ধেবেলা বাবু আর ঠাকুরবাবু দুজনে এল কলেজ থেকে। চা-টা খেল, গল্প করল। তারপর সন্ধে গড়িয়ে যেতে আরেক বাবু এল। ওই যাকে কাল পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। তিনজনে খানিকক্ষণ গল্প করার পর ঠাকুরবাবু চলে গেল। বাবু আমায় বলল, দুজনের রান্না করতে। ওই বাবু খাবেন। রাতে থাকবেন। রান্না করে খাবার ঢাকা দিয়ে চলে গেলাম। পরদিন ভোরে এসে দেখি, দরজা খোলা। বাড়িতে কেউ নেই। খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। তখন আশপাশের বাড়িতে খবর দিলাম। পুলিশ এল। ঠাকুরবাবু এল।

—ঠিক আছে। তুম আভি যাও।

পট্টনায়েক বললেন,—কিছু বুঝলেন?

বুঝল।—মোহনলাল বললেন,—উস রাতে মুখার্জি ইসেছিল। শর্মার দোস্ত। গপ-উপ করেছে, তারপর ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেছে।

—কী বলছেন যা-তা? জগুমামা আমাদের সঙ্গে—

—বেটা, শান্ত হো। তুমি যা বোলছে, উ যেমন সাচ, কেয়ারটেকার যো বোলছে, উ-ভি সাচ। ই বাত পাক্কা হ্যায়, শর্মা আপনা মর্জিসে উসকা সাথ গেছে। আনজানে আদমি হোলে শর্মা যাইত কি?

তারপর বললেন,—পট্টনায়েকজি, ইখানে কাম খতম। ঠাকুরসাবের কাছে চোলেন। ইয়ে পুছনা বহোত জরুরি, ওকাল্ট সায়েন্সে আই মিন, মুখার্জির ডাবল এক্সিসেটেন্সের বেপারে সে কী বিচার কোরছে। হাঁ, হামি ই কিতাবটো লিচ্ছে।

বইয়ের নাম ENERGY, A NEW DIMENSION।

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ মোহনলাল থমকে দাঁড়ালেন। দ্রুত ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, —ভুলে গেছে। ইকটা কাগাজ।

টেবিলের ওপর থেকে উনি স্লিপ প্যাডের একটা টুকরো তুলে নিলেন। ভাঁজ করার আগে শুধু পড়তে পারলাম,—'...বলতে হবে প্রাকৃতের সঙ্গে।'

কাগজটা ঢুকে গেল মোহনলালের পকেটে।

জেলরোড পুলিশবাজার।

শিলং শহরের সবচেয়ে জমজমাট এলাকা। হোটেল, রেস্তোরাঁ, স্টুডিয়ো হাজাররকম দোকান পাট।

অ্যাম্বাসাডার ওয়ার্ড লেক পেরিয়ে চৌরাস্তার কাছাকাছি এসে পড়েছে। বাস-ট্যাক্সি-দোকানপাট-পাথচারী-বিক্রেতা গিজগিজ করছে। অনন্তবাবু গাড়ির জানলা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন,—গজু! গজু!

আমাদের গাড়ির গতি এমনিতেই মন্থর হয়ে পড়েছে।

গজবন্ধু অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে তর্কে মশগুল। অনন্তবাবুর গলা তাঁর কানে গেছে বলে মনে হল না।

অনন্তবাবু আরও জোরে ডাকলেন।

কাজ হল। গজবন্ধু আমাদের দেখে সেই ব্যক্তিকে কিছু বলে সোজা চলে এলেন গাড়ির কাছে।

—আরে অন্তা! কোথায় যাচ্ছিস?

উঠে পড়।—অনন্ত সরখেল সামনের দরজার দেখিয়ে দিলেন। গজবন্ধু উঠে পড়লেন।

সত্যসাধন ও মোহনলালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অনন্তবাবু। তারপর বললেন, —কার সঙ্গে বকছিলি? গৌহাটি ফিরিসনি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাল ফিরে গেছিলাম। আজ আবার এসেছি। একটা টেন্ডার জমা দিলুম। তিনটেয় খুলবে। ব্যাটা আমারই মতন ব্যবসায়ী। অরিজিন্যালি রাজস্থানের লোক। খাসি মেয়ে বিয়ে করেছে তো, খাসিদের গুণকীর্তন করছিল। আমিও ছাড়বার পাত্র নই।

—কী বলছিল?

—বলছিল, এখানে যে বিদেশি খেদাও আন্দোলন করছে কেএসইউ, মানে খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, তা নাকি ঠিক! আমি বললুম, বাজে বোকোনা। অরিজিন্যাল খাসিরা কোথায়? এই যে কেএসইউ-এর পান্ডা, তার বাবা তো আসামের বিখ্যাত দুলাল বড়ুয়া। আগে নাম ছিল বাবুল বড়ুয়া। পরে বাবার সঙ্গে মায়ের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর মায়ের লিংডো পদবি নিল। গোড়ার 'বা' কেটে দিয়ে বুল লিংডো হয়ে গেল।

—মোশাই, আপনার কোথা থেকে ইকটা বেপার বুঝা যাচ্ছে। ইকসময় প্লেনসের আদমিরা ইতো অতিয়াচার কোরিয়েছে ট্রাইবাল পিপলদের ওপর, তারই জন্যে অ্যান্টি-ন্যাশানাল ফোর্স পপুলার হইয়েছে। ছোড়েন উসব বাত—

একটু থেমে বললেন,—হামরা ইখন প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর সায়েবের ঘর যাচ্ছে। আপনি চলবেন? থোড়া সুবিস্তা হোবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন না! প্রাণকৃষ্ণ আমার বন্ধুর মতন। বেশিদিন না হলেও ইউনিভার্সিটিতে সাপ্লাইয়ের সুবাদে ওর সঙ্গে দোস্তি হয়ে গেছে। লোক ভালো।...ড্রাইভারজি, বাঁ-দিকে।...হ্যাঁ, এখানেই পার্ক করুন।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছি। গজবন্ধু বললেন,—তবে এখন কি ওকে পাবেন? এগারোটার মধ্যে ডিপার্টমেন্টে চলে যায়! দেখা যাক।

গজবন্ধু কলিংবেল টিপলেন। দরজার মধ্যের কাটা অংশ খুলে গেল। এক মহিলার মুখ,—কাকে চাই?

—ঠাকুরসাব আছেন?

—কোথা থেকে আসছেন?

—বলুন গৌহাটির গজবন্ধু।

মহিলা ভিতরে চলে গেলেন, দরজার কাটা অংশ দিয়ে স্পষ্ট কিছু কথা ভেসে এল,—আপনা উস্তাদি দিখানো বন্ধ করো! ফাঁস যাওগে তো...কওন? কিতনা আদমি?...ড্রোইংরুমে বসাও, হামি আসছে।

মহিলা দরজা খুলে দিল। পাঁচজন বসলাম। না-না, সবাই বসলাম বললে ভুল বলা হবে। সদাব্যস্ত মোহনলাল দেওয়ালজোড়া বইয়ের র‍্যাক ঘুরে-ঘুরে দেখছেন। শুধু দেখছেন না, এক-একটা বই টেনে বার করে পাতা উলটোচ্ছেন, আবার ঢুকিয়ে রাখছেন।

মিনিট তিনেক পর ঢুকলেন প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর। আমাদের সঙ্গে আলাপ ছিল। গজবন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন পট্টনায়েক আর মোহনলালের সঙ্গে।

ঠাকুর বললেন,—বোলেন, হাপনেরা কী জানতে চাহেন? হামার ওপি নিয়ন অরণবকে পহলেই বোলেছে।

ইসিলিয়ে আপকে পাস আয়া হুঁ।—মোহনলাল বললেন,—আপকা বিচার মুঝে সহি লগা। আপকে পাস ওকাল্ট-সায়েন্সকা কোই কিতাব হোগা?

—ইঁহা তো নেহি হ্যায়। লেকিন দে সাকতা হুঁ।

—একমিনিট, দ্বিবেদীজি। মিস্টার ঠাকুর, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?

—শিওর!

—ডক্টর শ্যামাদাস শর্মাকে কিডন্যাপিং-এর পিছনে আপনি যে মোটিভের কথা অর্ণবকে বলেছেন, সেটা হল ডক্টর শর্মার গবেষণা। আপনি ডক্টর শর্মার ক্লোজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ছিলেন। কী সাবজেক্টে উনি গবেষণা করেছিলেন, বলবেন?

সাবজেক্ট ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্সিয়াল।—প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর বললেন,—উনার সাবজেক্ট থা বায়ো-ইলেকট্রিসিটি। পেড়, দ্যাট মিন গাছসে ইলেকট্রিক কারেন্ট মিল সকতা হ্যায়। পরীকসা কোরে দেখা গেছে,

সোব গাছে থোড়া-থোড়া ইলেকট্রিক এনার্জি আছে। কিসি তারহাসে উস কারেন্টের ভোল্টেজ যদি বাড়িয়ে দিওয়া পসিবল হোয়, তব রিভলুশন হোয়ে যাবে। সোর্স অফ এনার্জি উইল বি আনলিমিটেড। অর এক বাত —

একটু থেমে বললেন,—শর্মা সাব ইয়ে শিলং পাহাড়ে ইক টিপিকাল পেড় আইডেন্টিফাই কোরেছিলেন যো জাদা কারেন্ট দিতে পারে।

—ইন্টারেস্টিং। লেকিন উনি জগুবাবুকে আসতে বললেন কেনো?

—আদমি চিনিতে পারেন নাই। বিসওয়াস কোরেছিলেন। বাড়ির কাজের মহিলা ট্রেতে করে কফি বিস্কুট নিয়ে ঢুকল। তার পিছনে একজন যুবক বেরিয়ে গেল।

কফিতে চুমুক দিচ্ছি। মোহনলাল ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—হামি থোড়া চোলছে। ইকটা জরুরি কাম ভুলে গেছে। ঠাকুর সাব, হাম আপসে ডিপার্টমেন্টমে ভেট করেঙ্গে।

বলতে-বলতে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। আচ্ছা ছিটেল লোক!

আমাদের কথাবার্তা বিশেষ এগোল না। একটা নতুন খবর পাওয়া গেল, জগুমামা এর আগেও নাকি বেশ কয়েকবার এসেছেন। নানারকম লোভ দেখিয়েছেন ডক্টর শর্মাকে। এই রিসার্চের রেজাল্ট বিদেশি কোনও এজেন্সিকে বেচে দিলে কোটি-কোটি ডলার পাওয়া যাবে। শর্মা রাজি হননি।

শুনতে-শুনতে লজ্জায় আমাদের মুখ নীচু হয়ে যাচ্ছিল।

৬

—ভাই টুকলু, পষ্ট বলে দিলুম, ওই লালমোহন লোক খুব গোলমেলে। সবসময় ধড়াস-ধড়াস করে লাফাচ্ছে, যেন কত্তো কাজ!

মোহনলালকে আমারও রহস্যময় মনে হয়েছে। বললাম,—সে না হয় হল, কিন্তু মামার ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না!

শুনেই অনন্তবাবুর চোখ গোল-গোল হয়ে গেল। ফিসফিসিয়ে বললেন,—একটা কথা বলব?

—বলুন।

—স্যার ব্যাপারটাতে ইনভলড!

—ইনভলভড? মানে জড়িত? আপনার মাথাটা কি গেছে নাকি? শুনুন, ওই মোহনলাল দ্বিবেদীই গোয়েন্দার ছদ্মবেশি কালপ্রিট। যেখানে যা পাচ্ছে, পকেটে পুরছে। প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে ওর লিঙ্ক আছে।

দেখলেন না, ঠাকুরের বাড়ি থেকে একটা ছোকরা যেই বেরিয়ে গেল, অমনি কফি-টফি ফেলে উঠে পড়ল।

দাঁড়িয়ে আছি ক্যামেল ব্যাক রোডে। ইয়ুথ হোস্টেলের সামনে। হাত দেখলাম, অটো থামল।

—ইউনিভার্সিটি।...আপ অ্যান্ড ডাউন।

কাল ফিরতে-ফিরতে বিকেল হয়ে গেছিল। পট্টনায়েক আঙ্কেল তখনই বলে গেছেন, আজ হয়ত যোগাযোগ নাও হতে পারে। ইনভেস্টিগেশনের কাজে বেরোবেন।

এক বুক দুশ্চিন্তা নিয়ে কি চুপচাপ বসে থাকা যায়? তাই রিসেপশনে একটা স্লিপ লিখে রেখে বেরিয়ে পড়েছি।

প্রথমে ডক্টর শর্মার ডিপার্টমেন্টে যাব। খোঁজখবর নেব। ঠাকুরের সঙ্গে আলাদা কথা বলব। তারপর পরিস্থিতি বুঝে ঠিক করব, এরপর কী করণীয়।

অনেকখানি সময় লেগে গেল, নর্থ-ইস্টার্ন হিলস ইউনিভার্সিটি, বা নেহুতে পৌঁছোতে।

ঝাঁ-চকচকে ক্যাম্পাস। মনে হয় যেন বিদেশ।

খুঁজে-খুঁজে শ্যামাদাস শর্মার ল্যাবে পৌঁছোলাম। খাঁ-খাঁ করছে। দু-তিনজন রিসার্চ স্কলার কাজ করছেন, চেম্বার বন্ধ। একজনকে বললাম,—প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর এসেছেন?

—রোজ আসেন না। স্যার থাকলে আসতেন। ভলান্টারি কাজ করেন। আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

—কলকাতা থেকে। শর্মাজির ব্যাপারে খোঁজ নিতে।

ছেলেটি অবাক হয়ে গেল। বলল,—কিছুক্ষণ আগে দুজন এসেছিলেন। একই কথা বললেন।

আমরা একই টিমের। আপনি কি জানেন, শর্মাজি রিসার্চের রিসেন্ট সাবজেক্ট কী ছিল?

—না, ঠিক বলতে পারব না।...

সময় নষ্ট করার মানে হয় না। এবার প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুরের ফ্ল্যাট। বাড়িতে নিশ্চয়ই আছেন।...

—হাঁটছি পুলিশবাজারের দিকে। অনন্তবাবু একঘন্টা স্পিকটি নট।

কলিংবেল টিপলাম। কেউ উঁকি মারল না।

আবার সুইচে হাত টিপে রাখলাম। বাজুক,ভালো করে বাজুক। নাহ আরও মিনিট খানেক কেটে গেল। কেউ আসছে না!

কী ব্যাপার? বেল বাজছে, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

অনন্তবাবু বললেন,—নেই। ঠাকুর, বাড়িতে নেই।

—উনি নেই তো কী হয়েছে? কাজের মেয়েটা থাকবে। সে—

বলতে-বলতে থেমে গেছি। দরজার মাঝের কাটা অংশটা চোখে পড়ে গেছে। ছোট পাল্লাটা আলগা।

ধাক্কা দিতে 'বোঁ' করে পাল্লা ঘুরে গেল। সামনে ড্রইংরুম খোলা।

পরক্ষণেই চমকে উঠেছি।

চাপা শাসানি ভেতরের ঘর থেকে ভেসে আসছে। গলার স্বর খুব চেনা!

—বা: খোকা, বা:। বেড়ে অ্যাক্টিং শিখেছ। ডাবল এক্সিসটেন্স! দ্বৈত সত্তা! দারুন গপ্পো। সবাই খেয়েও গেল। এসে পৌঁছোতেই সোজা জেলে। চিনতে পারছ আমায়? হ্যাঁ, তোমাদের গপ্পো সত্যি হয়েছে। আমার ডাবল এক্সিসটেন্সই এসে দাঁড়িয়েছে তোমার সামনে। বল, এখনও যদি বাঁচতে চাস, চটপট বলে ফ্যাল, তোর বস কোথায়?

দ্বিতীয়জন বলছে,—বি-বি শ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না! আমায় ছেড়ে দিন!

—ছেড়ে দেব? কচি খোকা আমার! হ্যাঁ, তোকে পুরোপুরি ছেড়ে দেব। সোজা উপরে চলে যাবি! এই যে আমার হাতে এটা দেখছিস, এর ট্রিগার টিপলেই—না: তোর জন্যে গুলি খরচ করার মানে হয় না। আমার দশটা আঙুলই যথেষ্ট। ভেবে দ্যাখ, কী মজা! কোনও কেস হবে না, কেউ ধরা পড়বে না। আসল আমি জেলের মধ্যে বসে আছে।

—ও-ও রে বাবা! আ-আ-আমি—

—চোপ! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, মনে হচ্ছে! ঠিক আছে, দুহাত দিয়ে তোর গলা টিপে—এক থেকে দশ গুনছি, শিগগির বলে ফ্যাল! এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ...ছয়...

—ব—বলছি...আ-মায় মা-মারবেন না!

—ভেরি গুড। লক্ষ্মী ছেলে! বল, কোথায় তোর বস?

—চ—চে—রা প-পুঞ্জি।

—চিনিস?

—ম-মানে হ্যাঁ।

—ফাইন। তুই আমার গাইড। নে, এগুলো এবার পরে ফ্যাল।

—ক—ক—কেন?

—আবার কথা! একটাও কথা বলেছিস কী, আমি—

—প—পরছি। পরছি।

কাঁধের ওপর অনন্ত সরখেলের হাত ভর করে ছিল। 'খ্যাঁচ' করে কাঁধ খিমচে ধরল।

অনন্তবাবুর চোখ পাঁচ টাকার রাজভোগ। মুখ দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে,—ভ-ভ-ভূ-ত! স—স—স্যার-র!

ওফ, অসহ্য! কিছুই ভাবতে পারছি না। বিশ্বাস-অবিশ্বাস যুক্তি-বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

—অনন্তবাবু, ঠিক হোন বলছি! বি স্টেডি!

—টুকলু! ছেড়ে দে ভাই, আমি পালাই! আর সইতে পারছি না রে।

—তাই যান!

দুদ্দাড় করে অনন্তবাবু নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

কয়েক সেকেন্ডর মধ্যেই দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, দুজন এদিকে আসছে।

জগুমামা ও মোহনলাল দ্বিবেদী! জগুমামার ডানহাতের রিভলভার মোহনলালের কানে ঠেকানো।

আমায় দেখেই মামার চোখে আলো জ্বলে উঠল।

—টুকলু! তুই!

কথা বলার শক্তি নেই। মুখে হাসি ফুটছে না।

মামা বাঁ-হাত দিয়ে পিঠ চাপড়ে বললেন,—কী হল তোর?...বুঝেছি। আমাদের কথাবার্তা শুনেছিস? নিশ্চিন্ত থাক আমি তোর সত্যি জগুমামা! চল। তদন্তের লাস্ট চ্যাপটার চেরাপুঞ্জি।

রাস্তায় সাদা অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে। পিছনের সিটে মোহনলালকে মধ্যে বসিয়ে দুজনে দু-দিকে উঠে বসলাম। মামা ওঠার ঠিক আগে পকেট থেকে ওয়াকিটকি বার করে কী সব বললেন, সাংকেতিক ভাষা। বুঝলাম না।

৭

পৃথিবীতে কোথায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়?

চেরাপুঞ্জি!

ছোটবেলায় ভূগোলে এটাই পড়েছি। কল্পনায় দেখেছি, দিনরাত বৃষ্টি পড়ে জল থইথই।

ভাবতে পারিনি, যাওয়ার পথে প্রকৃতি এমন শোভা সাজিয়ে রেখেছে।

তবে এখন যা মনের অবস্থা, তাতে প্রকৃতি আমায় একটুও উচ্ছ্বসিত করছে না।

অ্যাম্বাসাডার ছুটে চলেছে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে। মোহনলাল দ্বিবেদীর মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। জগুমামার ডানহাতের রিভলভার তার কোমর ছুঁয়ে আছে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতি কমে গেল।

—ভাগ্নে।

—বলো।

—তোর সবটা জানতে কৌতূহল হচ্ছে?

—হলেই বা কে বলছে?

—রাগ করছিস? আমার অবস্থা একবার ভাব! কী অপমান আর লজ্জা। শেষ পর্যন্ত জেলে রাত কাটাতে হল আমায়, যে কখনও জেনে অন্যায় করেনি। এই আমাদের দেশ, আমাদের আইন।

সঙ্গে-সঙ্গে জগুমামার চোখের দিকে তাকালাম।

—মামা!

মামা অদ্ভুত হাসলেন। বললেন,—তোর মনে আছে বেতলা ফরেস্টে যাওয়ার কথা?

—হ্যাঁ, বিজ্ঞানীরাই ক্রিমিন্যাল। *জন্তুজানোয়াররা সব খেপে উঠেছিল...দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে সে কী খুনোখুনি! কোনও থই পাওয়া যাচ্ছিল না, তারপর—

—রাইট। এটুকু জেনে রাখ, এবারের নাটের গুরু ওদেরই একজন। তার আসল নাম তুই জানিস। এই নচ্ছারটার বস। জেলের মেয়াদ কাটিয়ে শয়তানটা এই পাহাড়ি শহরে ঘাঁটি গেড়েছিল। আলাপ করেছিল বিজ্ঞানী শর্মার সঙ্গে। জানত পারল, শর্মার গবেষণার বিষয়। শর্মা তখন সাফল্যের শেষ বিন্দুতে। বিশেষ প্রজাতির গাছের খোঁজ পেয়ে গেছে। সে টোপ দিল শর্মাকে। এই রিসার্চ যদি বিদেশি কোনও এজেন্সিকে বেচে দেওয়া যায়, কোটি-কোটি টাকা এসে যাবে। ডক্টর শর্মা রাজি হলেন না। সে তখন মতলব আঁটল শর্মাকে কিডন্যাপ করার। আটকে রেখে, ভয় দেখিয়ে রিসার্চ পেপার হাতিয়ে নেবে। একই সময়ে আমি ফোনে জানালাম, আমরা বেড়াতে আসছি। সে সেটাও জেনে ফেলল, সরল বিজ্ঞানী শর্মার কাছ থেকে। ব্যস, সে প্ল্যান করে ফেলল—

ক্যাচ-চ। সাজোরে ব্রেক কষল অ্যাম্বাসাডার।

—কী হল?

ড্রাইভার বলল,—সাব, বেড়াল রাস্তা কেটে দিয়ে গেছে। একটু দাঁড়াতে হবে।

চালকদের এ এক কুসংস্কার! কোথাকার কোন বনবেড়াল রাস্তা ক্রশ করেছে, আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অন্য গাড়ির অপেক্ষায়।

—তারপর?

—হ্যাঁ। ওই ক্রিমিন্যালটা তৈরি করল সাংঘাতিক ছক। আমার উপর প্রতিশোধের আগুন ওর বুকের মধ্যে জ্বলছিল। সুযোগ এসে গেল! শর্মাকে কিডন্যাপ করে ও নিয়ে যাবে, অথচ প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই বলবে,

আমি নিয়ে গেছি! এক ঢিলে দুই পাখি মরবে। যদি জগবন্ধু মুখার্জি না হয়ে অন্য কোনও ভালোমানুষ বিজ্ঞানী হত, জেলের মধ্যেই সে সুইসাইড—

—গ-দ-দাম!!

মামার কথা অসমাপ্ত রয়ে গেল। ঘটে গেছে দুর্ঘটনা।

ঝিমুতে থাকা মোহনলালের দু-হাত জড়ো হয়ে আচমকা প্রচণ্ড আঘাত করেছে সামান্য অসতর্ক জগুমামার চোয়ালে। মামা ছিটকে গেছেন। চশমা, রিভলভার পড়ে গেছে। সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলে মোহনলাল লাফিয়ে পড়েছে গাড়ি থেকে। তারপর বাঁই-বাঁই করে দৌড় দিল।

বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে আমিও ছুটছি ওর পিছনে। সামনে মোহনলাল দ্বিবেদী, পিছনে আমি। দৌড়ের কম্পিটিশন হচ্ছে।

বাঁ-দিকে ঢালু জমি। শুঁড়িপথ। মোহনলাল নামতে শুরু করল সেই পথ বেয়ে।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ নেমে গেছে। ব্যালান্স সামলাতে-সামলাতে ওর পিছনে আমি।

দূরত্ব কমছে...ইচ্ছাশক্তিকে বলছি, ওকে ধরতেই হবে।...মোহনলাল পিছনে তাকাল। তারপর নামার গতি বাড়িয়ে দিল।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার আবছা সীমান্ত। ও কি ওপারে পালাতে চাইছে?

সামনের পথ আরও সঙ্কীর্ণ, ঝোপজঙ্গলে ঘেরা...

হঠাৎ মোহনলাল সামনের কাঁটাঝোপে হোঁচট কেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে...সঙ্গে-সঙ্গে লাফ দিয়েছি ওকে তাক করে!...পেয়েছি! পেয়েছি! কিন্তু টাল সামলাতে পারলাম না।

দুজনে জড়মড়ি করে গড়িয়ে পড়ছি ঢাল বেয়ে...আটকে গেছি একটা গাছে...কিন্তু মোহনলাল চড়ে বসেছে আমার ওপর...হাত ছাড়িয়ে দুমদাম ঘুঁষি চালাচ্ছে...আমিও ছাড়ছি না! অন্ধের মতো মাথা দিয়ে ঠুসে যাচ্ছি।

অসহ্য পরিস্থিতিটা কতক্ষণ চলত জানি না, জোরালো শব্দ হল। মোহনলাল নেতিয়ে পড়ল।

জগুমামা সামনে দাঁড়িয়ে। স্নেহমাখা গলায় বললেন,—খুব লেগেছে? আয়, আস্তে-আস্তে উঠে আয়। এই হতভাগাটাকে টেনে তুলতে হবে।

সামনে মুখ গুঁজে পড়ে আছে মোহনলাল। না, না জগুমামা!

দু-নম্বর জগুমামা! মোহনলালের নকল দাড়ি-গোঁফ-চুল চশমা সব খসে পড়েছে। কিন্তু এটাও কি আসল চেহারা?

—জ্ঞান ফিরে আসবে না তো?

—মনে হয় না। আমার বাঁ-হাতের রদ্দা ঘাড়ের মোক্ষম জায়গায় খেয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙবে না। তবু সাবধানের মার নেই। এক কাজ কর। দাড়ি-গোঁফ কুড়িয়ে নে। রিভলভার ঠেকিয়ে রাখ। আমি ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি।...

অনেকখানি উপরে উঠতে হচ্ছে। সঙ্গে একটা মানুষের শরীর। গাড়ির কাছে পৌঁছোতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। জগুমামা এই ঠান্ডাতেও ঘামাছেন। লোকটাকে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল গাড়িতে। পিছমোড়া করে বাঁধা হল ওর হাত। দাড়ি-গোঁফ-চশমা আবার জগুমামা সেঁটে দিয়েছেন লোকটার মুখে।

গাড়ি আবার ছুটছে চেরাপুঞ্জির দিকে।...

ঝোড়ো বৃষ্টি শুরু হল। পাহাড়ে ছোট-ছোট বাড়ি ঘর। বৃষ্টির শহর আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

হঠাৎ অচেনা বদমাশটা একটু নড়ে উঠল। মামা ওর মাথায় রিভলভার ঠেকালেন। বললেন,—একটু এদিক-সেদিক করলেই উড়িয়ে দেব।

গাড়ি চেরাপুঞ্জিতে ঢুকে পড়েছে।

—অ্যাই হতভাগা, এবার কোনদিকে?

লোকটা চোখ খুলল। ঢুলু-ঢুলু চোখে বলল,—সামনের মোড়ে বাঁ-দিকের রাস্তা।

একটাই পথ, ঘুরে-ঘুরে গেছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সবুজ মখমলের গালিচা পাতা।

মামা ফের বললেন,—কী রে, ঠিকঠাক যাচ্ছি তো?

লোকটা অস্ফুটে বলল,—রাস্তাটা যেখানে ডানদিকে ঘুরবে সেখানেই।...হ্যাঁ...ওই যে সাদা বাংলো।

গাড়ি থেমে গেছে। জগুমামা সিটের পিছন থেকে একখন্ড বড় কাপড় বের করে লোকটার মুখে গুঁজে দিলেন। বললেন,—টুকলু ওটাকে টেনে নামা। আমাদের লাস্ট অপারেশন।

তারপর ওয়াকিটকি বের করে কাউকে কিছু জানালেন।

সামনে লোকটা। ঠিক পিছনে রিভলভার ঠেকিয়ে জগুমামা। মামা বললেন,—টুকলু, অনেকরকম কথাবার্তা শুনবি। ঘাবড়ে যাস না!

৮

সাদা বাংলো, গাছপালায় ঘেরা। একেবারে নিঝুম। বৃষ্টি ধরে গেছে। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। আকাশ অনেকটা ফরসা।

তিনজন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। মামা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন। টোকা মারলেন দরজায়।

কোনও উত্তর নেই। সুতরাং—ঠক ঠক ঠক!

এবার বাজখাঁই গলা ভেসে এল,—হুজ দ্যাট? নোবডি ইজ অ্যাভেলেবল!

স্যার, স্যার,—মামা অন্যরকম গলায় বললেন,—স্যার, আমি।

—হামি! কওন হামি?

—স্যার, আমি রাখাল। স্যার, ধরে এনেছি!

দু-সেকেন্ডের নৈ:শব্দ্য। তারপর দরজা খুলে গেল।

প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর। আরে! এ তো সেই পি কে থ্যাকারে। জগুমামা একটু আগে যা বলছিলেন। বয়স বেড়েছে। গোঁফ কামিয়ে চুলের কায়দা পালটে ফেলেছে। চেনা মুশকিল।

বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো যখন এসব ভেবে যাচ্ছি, ঠিক তখনই থ্যাকারের প্রবল অট্টহাসি,—হা:! হা:! বহোত বড়িয়া কাম কোরেছে রাখাল। খুঁচড়টাকে ভি পাকড়ে এনেছে। আইসো, অন্দর আইসো!

—স্যার, এটা পুলিশের খোঁচড় নয়। ছদ্মবেশ!

—ছদ্মবেশ? দ্যাট মিনস মেকআপ?

—আজ্ঞে স্যার। সেই জগবন্ধু মুখার্জি। আপনার মেন এনিমি। স্যার, সিবিআই-এর পট্টনায়েক পার্সোনাল বন্ড দিয়ে জেল থেকে ওকে বাইরে রেখেছে। তারপর ও বুড়ো টিকটিকির ভেক ধরেছে। আমি স্যার, সব জেনে নিয়েছি।

—আঁ? কী বোলছে তুমি রাখল? ভায়ানক বেপার! হামাকে ভি ধোঁকা দিয়ে দিল।

দেখুন না স্যার!—মোহনলালের দাড়ি গোঁফ একটানে খুলে দিলেন।

আহা-হা, তু...তু...কেয়া মজা কি বাত! প্রাণকৃষ্ণ দু-নম্বর জগুমামার থুতনি টিপে বলল,—জগবন্ধু, অব তেরেকো কেয়া হোগা? তু মুঝে জেল ভেজওয়ায়া থা। হাম তুকে সিধা উপপর—! উ যো ঘর দিখছে, উসমে তেরা দোস্ত শ্যামাদাস ভি হ্যায়! আভিতক উ নারাজ আছে। রিসার্চ পেপার হামি পেয়ে গেছে। লেকিন পেড়কা নাম বোলছে না! অব দোনোকো খ-ল-লাস!

—রাখাল, ই ছুকরাটাকে লিয়ে এলি কেনোরে?

—স্যার, এটা ওর ভাগ্নে। আমায় মামা ভেবে বিশ্বাস করে চলে এসেছে। ছেলেমানুষ! জানে না, এখানে ঢুকলে আর বেরোনো যায় না।

কী? আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। পিছনের দরজা বন্ধ। আমি কি পাগল হয়ে যাব?

প্রাণকৃষ্ণ হাসতে-হাসতে বলল,—তব তো ঠিক হ্যায়। ভানজা-মামা ইকসাথে মরবে। রাখাল, ই দরওয়াজা হামি খুলে দিচ্ছে। ফির দুটাকে ঘুসিয়ে দে। দুই প্যারে দোস্ত থোড়া গপসপ করুক, ফির ইকসাথে

উপর চলা যাক।

প্রাণকৃষ্ণ সামনের বন্ধ দরজা খুলে দিল।

চেয়ারে বসে আছেন এক প্রৌঢ় মানুষ। যন্ত্রণা কাতর মুখ। চেয়ারের সঙ্গে তাঁর শরীর তার দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বিজ্ঞানী শ্যামা দাস শর্মা।

—জগবন্ধু, দিখছে তেরা দোস্তের হাল? বুড্ডার বানানো ইলেকট্রিসিটি দিয়েই আমি দো-তিনদিন শক দিচ্ছে। ইতনা টেঁটিয়া, কুছু বোলছে না। আরে জগু তু ভি কুছু বোল! ও হো হো, তেরা মুহ বন্ধ হ্যায়।

ঠিক তখনই বাইরের দরজায় ভারী বুটের ধাক্কা।

—দরজা খুলুন।

পলকে পালটে গেছে প্রাণকৃষ্ণের মুখের রং। সাপের চোখে সে তাকাল জগুমামার দিকে। বলল,—রাখাল! তু-তু—বেইমান!

—নো মিস্টার প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর অ্যালিয়াস পি. কে. থ্যাকারে। দিস ইজ নট রাখাল, দিস ইজ ইয়োর ওল্ড ফ্রেন্ড জগবন্ধু মুখার্জি।

জগুমামার রিভলভার প্রাণকৃষ্ণের কপালে।

কিন্তু সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে ঘটে গেল রক্ত হিম করা ঘটনা!

প্রাণকৃষ্ণের ডানহাতে একটা ছোট্ট সুইচ ধরা ছিল। ইলেকট্রিক তার লুটোচ্ছিল মাটিতে। ওই সুইচটাই টিপে ধরেছে সে। সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ারে বাঁধা শ্যামাদাস শর্মা বারদুয়েক ছটফট করে স্থির হয়ে গেলেন।

আমরা নির্বাক!

পৈশাচিক হাসিতে মুখ ভরিয়ে প্রাণকৃষ্ণ তাকাল জগুমামার দিকে। বলল,—ক্যায়া, ইটা ঠিক হোলো না? হামাকে বিকাতে দিলো না, তো হামি ভি উটা কিসিকো লিতে দিল না! ব্যস! বরাবর।

মামা পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন,—তোমায়...তোমায়...ফাঁসিতে চড়তে হবে!

পট্টনায়েক পুলিশ নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছেন।

থ্যাকারে নির্বিকার। বলল,—বুরবক জগবন্ধু! শুন হামি লাইফে দোবার জেলে যাবে না, বুঝেছিস! ই দেখ—

জিভ বার করে সে দেখাল জগুমামাকে,—দিখছিস ইয়ে ক্যাপসুল হামার মুখের অন্দরে থাকে।

'কচ' করে দাঁতে কাটার শব্দ! দড়াম করে পড়ে গেল বিজ্ঞানজগতের এক হিংস্র সরীসৃপ।

এবারে ফেরার পথে। সামনে পট্টনায়েক পিছনে জগুমামা ও আমি।

জগুমামা কপালে হাত দিয়ে এলিয়ে রয়েছেন সিটে। চোখের সামনে বিজ্ঞানীবন্ধুকে মেরে ফেলা সহ্য করতে পারছেন না। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। যা ঘটে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। অসহ্য!

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। আস্তে-আস্তে বললাম, একটা কথা বলব?

—বল।

—মোহনলাল দ্বিবেদী তুমিই। পট্টনায়েক আঙ্কল এসে তোমায় বন্ড দিয়ে ছাড়ালেন। তুমি ছদ্মবেশে তদন্ত শুরু করলে। কিন্তু রাখাল নামের লোকটা যে তোমার ডুপ্লিকেট অভিনয় করছে, জানলে কী করে?

—তোদের হোস্টেলের ঘর থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেলাম। ঘটনাটা শুনে আমার মনে হল, হঠাৎ একজনের পকেট থেকে লাইসেন্স পড়তে পারে, কখন? তাড়াহুড়ো থাকলে। তোরা যখন ওর পিছনে ছুটেছিলি, তার আগেই ও বেশ খানিকটা ছুটে দূরত্ব বাড়িয়ে তারপর হাঁটতে শুরু করেছিল। সেই সময় লাইসেন্স পড়ে যায়। লাইসেন্সটা কলকাতার। ফোন করে সেই ঠিকানায় পুলিশ পাঠালাম। জানলাম, রাখাল একজন অভিনেতা। যাত্রায়-নাটকে অভিনয় করে। থ্যাকারে ওকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে রাতারাতি আনিয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা, ওর মুখে গোঁফ দিয়ে চুলের স্টাইল পালটে চশমা পরালে প্রায় মিলে যায় আমার সঙ্গে।

—এর পিছনে যে থ্যাকারে এটা কখন বুঝলে?

শর্মার বাড়িতে গিয়ে। একটা বইয়ে ওর সই দেখে খটকা লাগল, এটা ঠাকুরের বানান নয়। ওখান থেকে পেলাম একটা কাগজের টুকরো। আমার ফোন পেয়ে শর্মা লিখে রেখেছেন, 'জেবিএম আসছে। কথা বলতে হবে প্রাকৃতের সঙ্গে।' প্রা.কৃ.ত। নামের প্রথম অক্ষর ধরলে প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুরই বোঝায়। শর্মার সঙ্গে থ্যাকারের বন্ধুত্ব এত গাঢ় হয়ে উঠেছিল, উনি সংক্ষেপে 'প্রাকৃত' বলে ডাকতেন। বলতেন প্রাণের কথা। সেটাই কাল হল।

জগুমামা অনেকক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন,—দ্বিতীয় প্রমাণ পেলাম, থ্যাকারে বা ঠাকুরের বাড়ি গিয়ে। সেলফের একটা বইতে দেখলাম, রাবার স্ট্যাম্প মারা। পি. কে. থ্যাকারে। অর্থাৎ ওর আগের কালেকশন। তারপর লাইসেন্সে যার ছবি ছিল, সেই যুবককে ওখানে দেখে মিলিয়ে নিতে শুরু করি। তা ছাড়া ভূতপ্রেত, ওকাল্ট -সায়েন্স এসবের গপ্পো প্রাণকৃষ্ণ রটাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে।

পট্টনায়েক বললেন,—সাংঘাতিক প্ল্যান।

—সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক? এমনভাবে জাল পেতেছিল, বেরোবার পথ পাই না। আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে ডেকে নিয়ে এল রাখাল আর বিদেশি এজেন্ট সায়েব-মেমকে। অনন্তবাবুর ট্রেনের বন্ধু। কী হল জানেন? তাদের আমার ভিজিটিং কার্ড দিলাম। সে কার্ড পৌঁছে গেল রাখালের কাছে। আমার ডুপ্লিকেট

গৌহাটি থেকে ওই রাতে সোজা চলে এল ডক্টর শর্মার কাছে। প্রমাণ রাখতে কার্ড দিল। তারপর রাত বাড়তে কাজের লোকটা চলে যেতে থ্যাকারে ফের এল। ব্যস, কিডন্যাপ!

হঠাৎ থেকে জগুমামা বললেন,—মিস্টার পট্টনায়েক, বিদেশি দুটো আসেনি?

—এসেছিল দেখেছি। পুলিশ দেখে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেছে। অবশ্য অ্যারেস্ট করা যেত না। কোনও এভিডেন্স নেই।

—মামা গজবন্ধু বাবুর ব্যাপারটা? উনি কি এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন?

—না। ব্যাবসাদার লোক। থ্যাকারের সঙ্গে ডক্টর শর্মার খুব হৃদ্যতা। থ্যাকারেকে ভজিয়ে ল্যাবে সাপ্লাই করত। সেই থেকেই ঘনিষ্ঠতা।

কখন যে ইয়ুথ-হোস্টেল এসে গেছে, খেয়াল করিনি।

দরজায় টোকা দিলাম,—অনন্তবাবু! এসে গেছি।

দরজা খুলে গেল। মামাকে দেখে অনন্তবাবু চমকে উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন। আমরা দুজন যে পাশে আছি।

জগুমামা বললেন,—কী কর্তা, আমায় ভূত বলে ভাবছেন না কি?

কী যে বলেন স্যার!—অনন্তবাবু একগাল হেসে বললেন,—আমি টুকলুর সঙ্গে একটু মজা করছিলুম। তাও বোঝে না। এখনও বুদ্ধিটা পাকল না।

শারদীয়া ১৯৯৫

---

* RAW : ভারত সরকারের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং

* উপন্যাস 'মুখোশের আড়ালে'